একনাথী ভাগবত

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীভূমি। কলিকাতা-৪৮

প্রকাশক
শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী ব্যাকরণ সাহিত্যতীর্থ
শ্রীনটরাজ কিশোর গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীভূমি
১১২/১ ক্যানেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪৮

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশচন্দ্র বসু
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীনিখিল বসু

মুদ্রণ
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ

পরম পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য গৌরকিশোর গোস্বামী

ও

পরমারাধ্যা মাতা সুশীলা দেবীর

পুণ্য স্মরণে

(সন ১৩৬৭)

EKANĀTHI BHĀGAVAT

(The famous Marathi Saint Ekanatha's explanation of Bhagavat Book XI. Chapter 1-5. First Translated in Bengali by Prabhupad Prankisor Goswami M.A.)

Sri Gouranga Mandir, Sri Bhumi,
112/1, Canal St, Calcutta-48

পরিচয়

মুখবন্ধ—

একনাথী ভাগবত শাশ্বত ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জনার্দ্দনের পরম ভক্ত একনাথ একাদশ স্কন্ধ ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন। মহারাষ্ট্র সাহিত্যে একনাথী ভাগবত মৌলিকতার আসন অধিকার করেছে। জ্ঞানেশ্বরী রচনায় সন্ত জ্ঞানেশ্বর যে ভাবে অদ্বৈত ভাবনার সঙ্গে ভক্তিবাদের অভিনব গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছেন, সন্ত একনাথ পরমোচ্ছ্বাসে সেই ভক্তি রসের পরম উৎকর্ষ প্রকাশ করেছেন ভাগবত-ধর্ম্ম বর্ণনায়। জ্ঞানেশ্বর ও একনাথের ঐতিহাসিক ব্যবধান তিনশত বৎসরের অধিক। পাঠকের সমীপে এই ব্যবধান যেন দূর হয়েই গেছে তাঁদের ভাষার ছন্দে, দৃষ্টান্ত বিন্যাস ও প্রকাশ ভঙ্গীর রীতি সাম্যে। একনাথ জ্ঞানেশ্বরেরই পদাঙ্কানুসরণ করে তাঁর কাব্য প্রতিভাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলের মানস পরিমণ্ডলে।

জন্ম—

দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে পবিত্র পৈঠানে একনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সূর্য্যনারায়ণ, মাতা রুক্মিণী বাঈ। ইহাঁদের নাম নিজেই উল্লেখ করেছেন। পিতা মাতা শিশুটিকে অসহায় অবস্থায় রেখে লোকান্তরিত হন। তাঁর জন্মদিন সম্বন্ধে নানা প্রকার বিতর্ক আছে। চৈত্রমাস কৃষ্ণপক্ষের ষষ্ঠী, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ স্কন্দ ষষ্ঠী একনাথের স্মৃতি বহন করে মহারাষ্ট্রে। ১৪১৫ শকাব্দা হতে ১৫২১ শকাব্দার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব। পণ্ডিত সহস্রবুদ্ধি ও ভাবে একনাথের জীবনীতে ১৪৫৫ শকে জন্ম বলেই স্বীকার করেন। তাঁর তিরোভাব সম্বন্ধেও মত বিরোধ আছে। পণ্ডিত সহস্র বুদ্ধির মতে ১৫৩১ শকাব্দা বলেই নিরূপিত হয়েছিল কিন্তু ঐতিহাসিক প্রবর পানৃগারকার মহোদয়ের নির্ণয় অনুসারে উহা ১৫২১ শক। আমরা ধরে নিতে পারি একনাথ প্রায় ৬৬ বৎসর জীবিত ছিলেন (মৎকৃত 'সন্ধানীর সাধুসঙ্গ') দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থ গৌরব—

ভাগবত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একনাথ বলেছেন গোদাবরী তটে পবিত্র পৈঠানে ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ভাগবতধর্ম্ম বর্ণনাত্মক পাঁচটি অধ্যায় বিরচিত হয়। এই প্রসিদ্ধ পাঁচটি অধ্যায়কে তিনি শংকরের পঞ্চবক্ত্র বলে গৌরব দিয়েছেন। কোন্ শাস্ত্রের কত মহিমা বিচার করতে গেলে প্রথমেই বেদ-সংহিতার কথা বলতে হয়। বেদ স্বতঃ প্রমাণ। পরমেশ্বরের বাণী। পরম পুরুষের নিঃশ্বসিত সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব প্রভৃতির তুলনা আর কোন্ শাস্ত্রের সঙ্গে দেওয়া যায়? ঈশ্বরের ধ্বনি অপৌরুষেয় বেদ ভ্রম প্রমাদ শূন্য। অনাদি সিদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদ, সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ব্বোধ্যতা হেতু বেদবাক্যে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করে পণ্ডিতগণ তাৎপর্য্য বর্ণনায় বেদের ঔদার্য্য খর্ব্ব করেন বললে অযৌক্তিক হয় না। বেদ বেদান্তে যেন জনগণের সকলের অধিকার স্বীকৃত নয়, এরূপ প্রচারেও অনেকে দ্বিধা বোধ করেন নি।

জ্ঞানেশ্বরী—

মহারাষ্ট্রের সন্ত শিরোমণি জ্ঞানেশ্বর বলেন—বেদ শ্রীভগবানের যোগ-নিদ্রার অবসরে প্রকাশিত হয়েছেন। গীতা জাগ্রত ভগবানের বাণী। যুদ্ধক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনকে জাগ্রত করবার মন্ত্র গীতা—

"গীতা জানা হে বাঙ্‌ময়ী শ্রীমূর্ত্তি প্রভুচী"

(জ্ঞানেশ্বরী ১৮ অধ্যায়)

বেদ হতেও সহজ সরল সমাধান সমন্বয় এবং ঔদার্য্য গীতায় প্রকাশিত। বেদের তাৎপর্যই শ্রীগীতায় সর্ব্বজন গ্রহণীয়রূপে পাওয়া গেল। এই গীতাকে অবলম্বন করে জ্ঞানেশ্বরী বিরচিত। মহারাষ্ট্রের বারকরী গোষ্ঠীর বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণই সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের জন্য জ্ঞানদেবরূপে অবতীর্ণ হয়ে গীতার জ্ঞানেশ্বরী স্বরূপ প্রকাশ করলেন। গীতা ছিল সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ী, তাকে দেশীভাষায় মারাঠীতে প্রকাশের জন্যই এই অবতার। ভাগবত ধর্ম্মের মুখ্যতম রহস্য বিদ্যা জ্ঞানেশ্বরী। ভাগবত জীবন যাপনের অনবদ্য আদর্শ রূপায়িত করেছেন প্রতিটি অধ্যায়ে জ্ঞানেশ্বর মহারাজ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিশেষ করে "আচার্য্য উপাসনা" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি শ্রীগুরুভক্তি

সম্বন্ধে যে ভাবের আকুতির পরিচয় দিয়েছেন সেরূপ অন্যত্র কোনো ভাষায় বা ছন্দে প্রকাশিত আছে বলে জানা যায় না। অতি অল্পায়ু জ্ঞানদেব তাঁর আকুতি অনুসারে গুরুদেবের সেবা যত্ন করতে পারেন নি। একনাথ গোষ্ঠীর বিশ্বাস এই গুরুসেবা—"আচার্য্য উপাসনা"র প্রয়োজনটি সংসিদ্ধ করবার জন্যই জ্ঞানদেব মহারাজ তিনশত বৎসর পরে আবার একনাথ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। গুরুসেবার আগ্রহ দর্শন করে ভক্তিবশ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আবার জনার্দ্দন গুরুর সেবক একনাথের সেবার নিমিত্ত শ্রীখণ্ডা নামে অবতীর্ণ হন।

গুরুসেবা—

ভক্তের ভার ভগবান্ বহন করেন মারাঠী কবি মৌরপন্ত বলেছেন—

শ্রী একনাথ সদনীং মাধবজী সর্ব্বকামহেং করিতো।
স্বকরে চন্দন ঘাসী গঙ্গেচেং পাণি কাবড়ীং ভরিতো॥

শ্রীমাধব স্বয়ং শ্রীএকনাথের গৃহের সকল সেবার কাজ করেন। নিজে চন্দন ঘর্ষণ ও গোদাবরীর জলও বহন করেন। সেকালে গ্রামের গৃহগুলিতে প্রায় জলের ব্যবস্থা ছিল না। একনাথের গৃহে প্রতিদিন সাধু সজ্জন অতিথি অভ্যাগতের আগমন হত, আর তাঁদের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। দূরে গোদাবরী অথচ জল চাই—ই। জল আনার এই শক্ত কাজটি করেন প্রতিদিন বালক শ্রীখণ্ডা, একনাথের সেবক—ইনিই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্ত ভক্তিমান—

মৌরপন্তের ভাষায়—

আবড়িনেং আবড়িনেং প্রভুনেং সদনান্ত বহিলেং পানীং।
একচি কায় বদাবেং পড়ল্যা কার্য্যার্থ বাহিলে পানী॥
জপি-তপি সন্ন্যাসাহুনি, শ্রীহরিলা ভক্ত ফার আবড়তো।
স্পষ্ট পহা নাথ গৃহিং ঘেউনি বাহে জলচি কাবড়তো॥

শ্রীহরির সমীপে ভক্ত অত্যন্ত প্রিয়। জপনিষ্ঠ তপস্বী অথবা সন্ন্যাসীর

চাইতেও প্রিয়। একনাথের গৃহে জলের ভার বহন করতে দেখে এই কথাটাই স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল।

মারাঠী ব্রাহ্মণ মদন রায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থী। দ্বারকাধামে এক বৎসর অবস্থান করে তীব্র সাধনা করেছেন। দেবী রুক্মিণী স্বপ্নে আদেশ করেন—প্রভুকে এখানে নয়। দেখা পাবে পৈঠানে ভক্ত গৃহে। সেখানে একনাথ বাস করেন, তাঁরই সমীপে প্রভু ব্রাহ্মণ বালক বেশে শ্রীখণ্ডা নামে পরিচিত। মদন রায় দেবীর নির্দ্দেশে পৈঠানে একনাথ গৃহে এলেন। সেদিন বহু সাধুর সমাগম উৎসবের আনন্দ। অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করে একনাথ তাঁকে ভোজনের জন্য আহ্বান করেন। বহু ভক্ত ভোজনের নিমিত্ত আসনে উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণের পাদ ধৌত করে একনাথ বিনীত ভাবে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—আপনার গৃহে শ্রীখণ্ডা আছে। তাকে একবার আমার প্রয়োজন। একনাথ ডাকেন—আরে কোথায় গেল শ্রীখণ্ডা, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। আপনি ভোজনে বসুন, সে হয়তো কোথাও কোনো কাজে গেছে। এক্ষুণি এসে পড়বে। ব্রাহ্মণ কিন্তু শ্রীখণ্ডাকে না দেখে অন্নগ্রহণ করতে নারাজ। অনেক খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, একনাথ ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করেন—সে কি আপনার কেউ হয়? আপনাকে দেখে সে হয়তো পালিয়েছে। ব্রাহ্মণ বলেন—আরে আমার কে হবে? তিনি যে ভক্তের ভগবান্। আমি তো তাঁকেই দেখবো বলে দ্বারকা থেকে এসেছি তোমার ঘরে। মাতা রুক্মিণী আদেশ করেছেন, যাও পৈঠানে একনাথের ঘরে প্রভু বিরাজমান, তার নাম হয়েছে শ্রীখণ্ডা। একনাথ তখন ভক্তিরসে মগ্ন হয়ে থাকেন, বাহ্য জ্ঞান আর থাকে না। অহো, আশ্চর্য্য তোমার লীলা!

সন্ত তুকারাম একনাথী ভাগবতকে এরূপ মর্যাদা দিয়েছেন যে, প্রবাদ আছে, তিনি এই মহাগ্রন্থ এক সহস্রবার আবৃত্তি করেছেন। বারকরী ভক্তগণের সমীপে ইহার অসীম আদর।

বিনয়—

একা ছিলেন অত্যন্ত সরল উদার সহজ প্রকৃতি। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন—আমার কবিত্ব শক্তি নাম মাত্র নেই। গুরু জনার্দ্দন এই কবিতার

মধ্যে তাঁর অভিনব অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠের পর মনে হবে একনাথ খুব বড় জ্ঞানী ব্যক্তি। আর কেহ যদি সাক্ষাদ্ ভাবে আমাকে দেখে, আমাকে একটি প্রকাণ্ড মূর্খ ভিন্ন আর কিছু মনে করবে না।

গ্রন্থ দেখোনিয়া সজ্ঞান। মহ্ণতী জ্ঞাতা একা জনার্দন।
জরলী জাহলিয়া দর্শন। মূর্খ সংপূর্ণ মানিতী ॥১১।৩১।৫০৪

তিনি আরও বলেন—কেহ আমাকে খুব বড় ভক্ত বলে ভাবে, কেহ বলে ঘোর সংসারী। সত্যইতো আমি না জানি আসন, না জানি ধ্যান, মন্ত্র, মুদ্রা, মালা, জপ,—উপাসনার কোনটাই আমি তো জানি না। লোকে বলে—কি জানি একা কি প্রকার ধার্ম্মিক, তারতো কিছুই লক্ষণ দেখা যায় না। সে কি জানি গোপন কি মন্ত্র তার শিষ্যদের দেয়। মনে হয়, কতগুলি ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিকে ভুলিয়ে সে কিছু সুবিধা ভোগ করে। দেখিতো শুধু ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেই সে তার শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলে। জনার্দ্দন গুরু সাধারণ লোকের মনে এই সকল সন্দেহ জাগিয়ে দেন। আমার কথা হল এই যে, আমাকে কোনো কথা বলতে হয় না—আমার হয়ে গুরু জনার্দ্দনই সব কথা বলেন। আমার অহংমিকা একটুও থাকে না। জনার্দ্দন আমার অহংকার নিঃশেষ করেছেন। আমার অঙ্গুলি চলে না, এমন কি চোখের নিমেষ ফেলা বা শ্বাস গ্রহণ করা না করা, সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সত্যই জনার্দ্দনই পরিচালিত করেন। এটি আমার কবিতা কি করে বলি, তত্ত্বতঃ জনার্দ্দন গুরুই কবি। তিনি আমার অহংকার অঙ্গীকার করেছেন। একনাথ জনার্দ্দনের শরণাগত।

এবং মাঝেং মীপণ সমূলীং। শ্রীজনার্দ্দন স্বয়েং গিলী।
আতাং মাঝী হালে জে অঙ্গুলী। তে তে ক্রিয়া চালী শ্রীজনার্দ্দন ॥
নিমেষোন্মেষাংচে সঞ্চার। শ্বাসোচ্ছ্বাসাংচে পরিচার।
সকল ইন্দ্রিয়াংচা ব্যাপার। চালিতা সাচার শ্রীজনার্দ্দন ॥

১১।৩১।৫১১।

ভাগবত কৃষিক্ষেত্র—

শ্রীমদ্‌ভাগবতকে একনাথ বিরাট একটি কৃষিক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেন। ব্রহ্মা ক্ষেত্রের বীজ সংগ্রহ করেন। দেবর্ষি ক্ষেত্রের মালিক। তিনিই সুষ্ঠুরূপে বীজ বপন করেছেন। ব্যাস ক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত হয়ে পুরাণের দশ লক্ষণের দশটি বেষ্টনী—আল নির্ম্মাণ করেছেন। মনস্বী কোকিলেরা তাঁদের কাকলি দ্বারা ক্ষেত্র মুখরিত করেন। ফলে স্বানন্দবোধের ফসল পেকে যায়। শুকদেব এই ক্ষেত্রের রক্ষক। তিনি শুধু হরিকথা কীর্ত্তন করেই সকল পাপ-পক্ষীকে তাড়িয়ে দেন। উদ্ধব ক্ষেত্রের ফসল তুলে ঝেড়ে শস্য বার করে একাদশ স্কন্ধ রূপে জড়ো করে তা থেকে শ্রীকৃষ্ণ কথা সার সংগ্রহ করেন। নানা প্রকার যুক্তি প্রয়োগ এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি তাহা দ্বারা নিত্য নূতন মধুর মিষ্টান্ন তৈরী করেন। প্রতিপদে পরমোৎকৃষ্ট সেই একাদশ স্কন্ধের মিঠাই দান করে উদ্ধব জগতের পরমোপকার করেছেন।

রাজা পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশনে, জলপান পর্য্যন্ত ত্যাগ করে শুকদেবের সমীপে আত্মার তৃপ্তির জন্য উহা গ্রহণ করেন। শ্রীধর স্বামীর দান "ভাবার্থ দীপিকা" প্রদীপের সহায়তায় আমরা আত্মজ্ঞানের ভোজ্যপাত্র দর্শন করি। তাঁরই আশ্রয়ে জনার্দনের কৃপায় একনাথ মাতৃ ভাষায় পক্ষ বিস্তার করে নির্ব্বাধে সেই আস্বাদ্য কথা পাত্রের উপর পড়ে। একনাথ জনার্দনের বাড়ীর মার্জ্জার শিশু। ভাবার্থ দীপিকার রসের স্বাদ গ্রহণে গন্ধ লুব্ধ হয়ে আসে। তার "মিউ মিউ" কাতর ধ্বনি শুনে সজ্জনগণ প্রসন্ন হয়ে কৃপা পূর্ব্বক তাঁদের শেষ প্রসাদ দিয়ে তৃপ্ত করেন। সাধুগণের উচ্ছিষ্ট পাত্র লেহন করেই সে পূর্ণ তৃপ্ত। সন্ত সমর্থ সাধুদের পাত্রে ব্রহ্মানন্দ রস পূর্ণই আছে। অত্যন্ত প্রীতির সহিত উহা লেহন করে সে আত্মানন্দে পরম সন্তোষ লাভ করেছে।

কায়মনোবাক্যে নিরভিমান না হলে একাদশ স্কন্ধের জ্ঞান হয় না—জ্ঞানের অভিমানে যোগ্যতার সম্মানে রহস্য লাভ হয় না। যতদিন না সর্ব্বভূতে সম্পূর্ণরূপে সদ্ভাব ও ভগবদ্‌বুদ্ধির উদয় হয়, ততদিন একাদশ স্কন্ধের জ্ঞান লাভ সুদূর পরাহত।

একাদশ ক্ষেত্র ন হেব জান। হা চিৎসমুদ্র পরিপূর্ণ।
যে থেং জো জৈসা হোয় নিমগ্ন। তো তৈসাচি আপণ রত্নে লাভে॥
১১।৩১।৪৫৯॥

এই একাদশ স্কন্ধ চিদানন্দ সমুদ্র। যে কোনো রূপে ইহাতে মগ্ন হলে পরম রত্ন লাভ হয়। যার যেমন ভাব সে তেমনই অনুভব করে।

একাকার টীকা :

ভাগবত—একাদশ স্কন্ধের একত্রিশটি অধ্যায়ের কাব্যরূপায়ণ। একনাথ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রধানতম রচনা ভাগবতের সমাপ্তি কালে বলেন—

"শ্রোতৃবৃন্দ আমার প্রার্থনা শুনে বলেন—এই ভাগবত কথা আমাদের প্রাণজীবন। যে ভাবে ব্যাখ্যান হল সেটি আমাদের অত্যন্ত মনোরম। এতো আমাদের কথাই বলা হয়েছে। এই প্রকারে শ্রোতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হলে বরদাতা শ্রীজনার্দ্দন প্রসন্ন হলেন।"

একনাথ জনার্দ্দনের শরণাগত হয়ে ভাবমগ্ন অবস্থায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করলেন।

"কাশীধাম মহামুক্তি ক্ষেত্রে বিক্রম শক বৃষ সম্বৎসরে ১৬৩০ শকে জনার্দ্দনের কৃপায় 'একাকার' টীকা বিরচিত হল। মহামঙ্গল কার্ত্তিক মাস, শুক্ল পক্ষ পৌর্ণমাসী তিথি, সোমবার, শিবযোগে, একাদশ স্কন্ধের টীকা সমাপ্ত হল। নিজ দেশীয় শক সম্বৎসর অনুসারে লিখছি। দণ্ডকারণ্য শ্রীরাম ক্ষেত্র গোদাবরীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠান নগরে পৈঠান গ্রামে আমার জন্ম। বৈভবী শালিবাহন শক ১৪৯৫ শ্রীমুখ নামক সম্বৎসরে একাদশ স্কন্ধের অপূর্ব টীকা জনার্দ্দনের কৃপায় রচনা করি।"

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম ভারত-ধর্ম-জগতে বিপুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। দিকে দিকে প্রেমের মহিমায় জ্ঞানের গৌরব ভক্তির অনুশীলনের পথে অদ্বৈতবাদের সমন্বয় খুঁজেছিল। শ্রীধরস্বামী অদ্বৈত সাধনায় ভক্তি সংযোজনে যে একটি বিশেষ ক্রম প্রদর্শন করেছেন, শ্রীমধুসূদন যে ভাবে ভক্তিরসায়নে তার পুষ্টি বিধান করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেবে তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি হয়েছে। "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" এই সমন্বয় যুগের বাণী।

প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে একনাথের আবির্ভাব। তিনি পূর্ববর্তী

জ্ঞান দেবের অনুসরণ করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদও তাঁর ভাগবত ব্যাখ্যায় প্রভাব বিস্তার করেনি একথা বলা যায় না। ভক্তিমণ্ডল শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ও পণ্ডরপুর পাণ্ডুরঙ্গের ভক্তগণের সঙ্গে মহাপ্রভুর যোগাযোগ হয়েছিল।

সেখানকার বারকরী সম্প্রদায়ের হরিকীর্ত্তনের সঙ্গে মহাপ্রভুর হরিকীর্ত্তনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। তাদের প্রেমবিহ্বলতা ও উচ্চ কীর্ত্তন অভঙ্গপদ বৈষ্ণব পদাবলী, প্রার্থনা ও দৈন্যাত্মিকার প্রতিচ্ছায়া।

একনাথের পরবর্ত্তী তুকারাম ও তাঁর অনুযায়ী ভক্তদের রচনা বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে তুলনীয়।

জন জনার্দ্দন—

রামচন্দ্র কৃষ্ণ কামত চন্দ্রগড়কর সম্পাদিত সার্থ শ্রীএকনাথী ভাগবতের ১৮৮০ শকাব্দায় প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে সমাপ্তিকালে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাওয়া যায়—

> "জনে জনার্দ্দিন এক জানে তো সুটলা নিঃশেষ
> হেংচি নেনোলিয়াং গুংতলে অনেক নিজাত্মভ্রমেং।"

জনগণ এবং জনার্দ্দনকে যে অভিন্ন বলে জানে তার সকল বন্ধন নিঃশেষ হয়, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রম দূর হয়ে যায়।

এই পদ্যটি অল্প পাঠ ব্যতিক্রমে বংশীলাল রামশুক করবা সম্পাদিত (১৮৮১ শকাব্দায়) শ্রীএকনাথী ভাগবত দুবার উল্লেখ করেছেন, যথা— পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে ৫৫০ সংখ্যক পদে, পুনরায় ৫৬২ সংখ্যক শেষ পদে। এখানে তিনি 'নিজাত্মভ্রমেং'র স্থলে 'ভবচক্র' দিয়ে কবিতার শেষ করেছেন। জন এবং জনার্দ্দনকে যে অভিন্নরূপে দেখতে হবে এটি একনাথী ভাগবতের পরম উপাদেয় শিক্ষা।

মারাঠী সাহিত্যে একনাথী ভাগবতের সমাদর অসামান্য। এই মহামূল্যবান গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণই এ বিষয়ে প্রমাণ। নির্ণয় সাগর প্রেস হতে ১৯১৫ সালে পানগারকার একনাথী প্রকাশ করেন। বোম্বে হতে ১৯২৬ সালে প্রচলিত মারাঠী ব্যাখ্যাসহ পণ্ডিত এথ্‌লির একনাথী প্রকাশিত হয়। মাধব রাও কর্ত্তৃক প্রকাশিত একনাথীও বহুসমাদৃত।

ইহা ভিন্ন আউটির একনাথী ভাগবত ও সমসাময়িক মারাঠী ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত আছে। পূর্ব্বেও দুখানা সংস্করণের উল্লেখ করেছি।

একনাথের অন্যান্য গ্রন্থ

(১) চতুঃশ্লোকী ভাগবত, (২) অভঙ্গাবলী, (৩) হস্তামলক, (৪) শুকাষ্টক, (৫) স্বাত্মসুখ, (৬) আনন্দ লহরী (৭) অনুভবানন্দ বা আনন্দানুভব (৮) রুক্মিণী স্বয়ংবর, (৯) ভাবার্থ রামায়ণ।

অভঙ্গাবলীর শ্রেণীবিভাগ—(১) একাদশী মাহাত্ম্য, (২) কৃষ্ণদান ব্রত, (৩) গীতা মাহাত্ম্য, (৪) গোবর্দ্ধনোদ্ধারণ, (৫) চিরঞ্জীবপদ, (৬) প্রহ্লাদ চরিত্র, (৭) ভারুদ, (৮) সীতামন্দোদরী, (৯) স্বাত্মবোধ ও (১০) পদ।

একনাথের কবিতা—(১) অষ্টাবক্র, (২) কালীয় মর্দ্দন, (৩) কৌশল্যা স্বয়ংবর, (৪) গজেন্দ্র মোক্ষ, (৫) গণেশ বিলাস (৬) গীতার্থসার, (৭) গুরুপঞ্চক (৮) নাম সার (৯) মুদ্রাবিলাস ও (১০) বেদান্ত নিরূপণ।

চতুঃশ্লোকী—ভাগবত (ভাগবত ২।৯।) ব্যাখ্যায় একনাথ বলেন—গোদাবরীর উত্তর তীরে চতুর্যোজন দূরে চন্দ্রগিরি পাহাড়। তার পাদদেশে চন্দ্রাবতী নগর। সেখানে চন্দ্রভট নামে ব্রাহ্মণ। তিনি প্রতিদিন চতুঃশ্লোকী পাঠ করেন। তীর্থ পর্যটনে গুরু জনার্দনের সঙ্গে একনাথ এই ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণের মুখে চতুঃশ্লোকীর উচ্চ প্রশংসা শুনে জনার্দ্দন স্বামী একনাথকে জন সাধারণের বোধগম্য করবার জন্য ব্যাখ্যা লিখতে বলেন। একনাথ বলেন আমি সংস্কৃত জানিনা বুঝিনা তথাপি গুরুর আজ্ঞায় চতুঃশ্লোকী প্রাকৃত ভাষায় মারাঠীতে প্রকাশিত হয়েছে, এর কৃতিত্ব গুরুদেবের।

অভঙ্গাবলী—১৯০৩ খৃঃ তুকারাম তাতার সম্পাদনায় ২৭৫৪টি অভঙ্গ প্রকাশিত হয়, উহাতে ৪৭টি পদ ভানুদাসের রচিত। ১৯২৪ খৃঃ ত্র্যম্বক হরি আবটে কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে ৪০০১টি অভঙ্গ সংগৃহীত আছে। পদগুলিতে ভক্তের প্রাণের উদার বাণীতে প্রার্থনা, আর্ত্তি, আকুতি, নিবেদন, করুণা, সর্ব্বজীবে প্রেম, সর্ব্বশ্রেণীর ভগবৎ কৃপালাভের কথা ধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত ও ভগবানের যে আশ্রয় আশ্রিত ভাব, পাল্য পালক সম্বন্ধ, প্রেমার্ত্তি ও হৃদয়ের শুদ্ধাভক্তি তারই অভিব্যক্তি এই অমর অভঙ্গের মূর্চ্ছনায়। এই

অভঙ্গসমূহ সাধক জীবনের স্বচ্ছতা ও ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ চির আদরণীয়।

হস্তামলক—আচার্য শংকর বিরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মারাঠী অনুবাদে একনাথের দর্শন বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে চিরস্মরণীয় হয়ে। মাত্র চৌদ্দটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন একনাথ ছয় শত চুয়াত্তর পদে।

শুকাষ্টক—(মূল-লঘুকাব্যমালা ৪র্থ ভাগ ৯০ পৃঃ) শুকদেবের মুখ-নিঃসৃত বলে প্রসিদ্ধ আটটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় একনাথ চারিশত সাতচল্লিশ পদ রচনা করেছেন। বিধি নিষেধের গণ্ডীর বাহিরে আত্মিক জগতে ভেদ রেখা নির্মুক্ত অভেদ দর্শনের উপদেশ এই শুকাষ্টকের প্রতিপাদ্য।

স্বাত্মসুখ—গ্রন্থে একনাথ জ্ঞানলাভের উপায় গুরুপাদাশ্রয় বিষয়ে বিচার উপস্থাপিত করেছেন। সদ্‌গুরুর কৃপাভিন্ন অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ সু-দূর পরাহত। অতএব জ্ঞানানন্দ লাভেচ্ছু সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

আনন্দলহরীতে—তিনি ভক্তিলাভের উপায় বলেছেন। সদ্‌গুরুর অনুগ্রহে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত দশায় কেবল আনন্দ তরঙ্গই বৃদ্ধি হয়। তিনি বলেন—রাজা ভর্তৃহরি এবং নামদেব ইঁহারা ভক্তিপথের যাত্রী। এরা ভক্তিলাভের নিমিত্ত লৌকিক জগতের সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। নির্গুণ, জগদাত্মা, আদিকারণ, বিভু, ভূতভাবন, অদৃশ্য পরব্রহ্ম, আনন্দ নিলয়, সর্ব্বাধ্যক্ষ, জ্ঞানোদধি, মোক্ষাশ্রয়, বিশ্বপালক পরম পুরুষের দর্শনে লোকাতীত আনন্দ লাভ হয়।

অনুভবানন্দ—গুরু-শিষ্য সংবাদে এই গ্রন্থ রচনা, ইহাকে আনন্দানুভব ও বলা হয়। গুরুর উপদেশে শিষ্যের অদ্বৈত ভাবনা সিদ্ধিতেই অনুভবা-নন্দের পরিচয়

রুক্মিণী স্বয়ম্বর—ভাগবত দশম স্কন্ধের ৫২ অধ্যায় অবলম্বনে বিরচিত। মারাঠী কবিদের অনেকে এ প্রসঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ কাব্য রচনা করেছেন। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য এই গ্রন্থের শেষাংশে পাওয়া যায়। এই কাব্য কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে ১৫৭১ খৃঃ লেখা শেষ হয়। প্রজাপতি সংবৎসরে চৈত্রমাস শ্রীরাম নবমী তিথি ১৪৯৩ শকাব্দায় গ্রন্থের সমাপ্তি বলেই কবি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন।

ভাবার্থ রামায়ণ—একনাথের কাব্য রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে বাল্মিকীর মূল রামায়ণ, অবলম্বনে বিরচিত হলেও ইহা প্রচলিত বঙ্গীয়, বোম্বে বা পাশ্চাত্য ধারা কোনোটির সঙ্গেই মিলে না। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের বিষয়গুলি কবিস্বাতন্ত্র্যে এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে এই ভাবার্থ রামায়ণ কাব্যে। একনাথের চরিতকার কেশব স্বামী এবং মহীপতি উভয়েই বলেন—রামায়ণের শেষ অংশ একনাথ তাঁর শিষ্যকে দিয়ে রচনা করেছেন।

ভক্তলীলামৃতে মহীপতি বলেন—একনাথ কোনো একটি জড়বুদ্ধি বালককে অনুগ্রহ করেছিলেন। এই বালকটির নাম ছিল গাভাবা। একনাথের করুণায় যত্নে গাভাবা ক্রমে বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, ভক্তিমান, কবিরূপে পরিচিত হন। একনাথ রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ৪৪ অধ্যায় পর্যন্ত রচনার পর যুদ্ধ কাণ্ডের শেষাংশ ও উত্তর কাণ্ড গাভাবাকে দিয়ে রচনা করান। একনাথের কাব্য রচনার মধ্যে এই ভাবার্থ রামায়ণ ও ভাগবতই সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রশংসিত ও বৃহৎ।

একনাথ সম্বন্ধে কেশব স্বামীর বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে লেখা এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যপূর্ণ। প্রসিদ্ধ ভক্তবিজয় গ্রন্থের ৪৫ ও ৪৬ অধ্যায়ে একনাথের চরিত্র বর্ণনা করেছেন ভক্ত জীবনী লেখক মহীপতি। দ্বাদশ বর্ষ পর একই লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ ভক্ত লীলামৃতে (১৭৭৪ খৃঃ) বিস্তৃত ভাবে একনাথ চরিত্র দেখা যায়। এই গ্রন্থ দুখানির বিবরণ স্বতন্ত্র। ভক্তলীলামৃত ১৩শ অধ্যায় থেকে ২৪শ অধ্যায় একনাথ লীলা! এ ছাড়া স্বয়ং একনাথ তাঁর বংশ মহিমা, পিতৃপুরুষগণের বিবরণ ও স্বগোষ্ঠীর ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে বহু বিষয় উল্লেখ করেছেন। এই মহাত্মার পৌত্র মুক্তেশ্বর শ্রীখণ্ডাখ্যান নামে এক নতুন সংযোজনা করেছেন। জ্ঞানেশ্বর বা তুকারামের মত জন সাধারণের সমীপে একনাথ প্রখ্যাত না হলেও তাঁর জীবনাদর্শ, জ্ঞান গাম্ভীর্য্য ও চারিত্রিক মাধুর্য্যে মারাঠী ভক্ত কবিগণের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি একক। অলৌকিক প্রসঙ্গ মহতের অনুসরণ করে। তাতে করে ইতিহাস ও প্রবাদ মিলিত হয়ে যায়। একনাথের জীবনেও তা হয়নি একথা বলা যায় না। তবু তাঁর স্বচ্ছ সরল জীবন কাব্য যে প্রেম মৈত্রীর স্বভাব সুন্দর পতাকা বহন করেছে তা জাতীয় গৌরব ঘোষণা করে চিরদিন।

একনাথের ভাষা চারশত বৎসরের পুরাতন। সেকালের ভাব ও ভাষার পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেকখানি। বর্ত্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্ত্তন জীবনে আমূল নতুন রূপায়ণের চিত্রাঙ্কণ করছে। প্রাচীন কথা ভুলতে বসেছি। শব্দ অপ্রচলিত হচ্ছে। সেকালের জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, বহিনী-বাঈ, নামদেব প্রভৃতির কবিতায় একনাথের ভাবসাম্য, ভাষার ভঙ্গী তুলনা করে অর্থ নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করেছি। কতগুলি রীতি নীতি অচল হলেও মূলের অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছি। প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাষার প্রতিশব্দ খুঁজতে খুব বেগ পেতে হয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে মর্ম্ম প্রকাশের মাত্র চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের দায়িত্ব, গুরুত্ব ও কাঠিন্য, ঐতিহাসিক দূরত্ব, সামাজিক ব্যবহার বৈষম্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য, আমাকে সচেতন রেখেছে। প্রাদেশিকতার বহু উর্দ্ধে ভাষার দিগ্‌বলয় অতিক্রম করে সাধুগণ আত্মদর্শনের প্রভাবে কি ভাবে সাম্য মৈত্রীর পথ পরিক্রমা করেন, কি ভাবে তাঁরা জাতিকে জনগণকে অগ্রগতি দান করেন, তার প্রেম প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর প্রকাশিত এই পাঁচটি অধ্যায়ে দেখা যায়। সে কালের মারাঠী বাংলায় প্রকাশে আমার অপটুতা অস্বীকার কোরবো না। সহৃদয় পাঠক ক্ষমার চোখে দেখবেন।

গ্রন্থ অনুবাদে উজ্জীবিত করেছেন ডক্‌টর বিমানবিহারী মজুমদার এম,এ, পি, এইচ্‌, ডি, মহোদয়। হাওড়া হৃদয়কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জী লেনস্থ ৺কালীকুমার নন্দী মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী পরলোকগতা ভক্তিমতী ৺সরোজিনী নন্দী মাতার আগ্রহে এই ভাগবত প্রকাশন তাহার আত্মার তৃপ্তিবিধান করুক।

মুদ্রণের জন্য অনুলেখ লিখেছেন পরমকল্যাণাস্পদ শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ, শতকোটি নাম সাধক।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ প্রকাশের ইচ্ছা আছে।

নমস্কার।

বিনীত

প্রাণকিশোর গোস্বামী

শ্রীএকনাথী ভাগবত

(একাদশঃ স্কন্ধঃ)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ॥ শ্রীগুরুভ্যো নমঃ॥ শ্রীদত্তাত্রেয়ায় নমঃ॥ শ্রীরুক্মিণীপতি পাণ্ডুরঙ্গায় নমঃ॥

সন্তোষঞ্চ গুরুং বন্দে পরং সংবিত্তদায়কম্।
শান্তসিংহাসনারূঢ়মানন্দামৃত ভোগদম্॥১॥

ভক্ত্যাভাগবতং ভাবং অভাবং কাব্যপাঠতঃ।
পঠনাৎ পদব্যুৎপত্তির্জ্ঞানপ্রাপ্তিস্তু ভক্তিতঃ॥২॥*

ভবাপবর্গভাবনারহিত যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয়জনিত ভেদ ভাব বিলুপ্ত প্রণবময় সদ্গুরুরাজ শ্রীজনার্দন স্বামীর শ্রীচরণে নমস্কার।

শ্রীএকদন্তকে নমস্কার একদন্ত বলিয়াই তুমি অদ্বিতীয়। অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াও বিভু তোমার অদ্বৈতভাবের হানি হয়না। বিশ্ব-চরাচরনিবাস বলিয়াই তুমি লম্বোদর, সকল জীবাশ্রয়, সকলের সংগ্রাহক। তোমার দর্শনে দুঃখময় সংসার সুখময় হইয়া উঠে। এজন্য তোমার আদরণীয় নাম বিঘ্নহর। আনন্দ তোমার বদন। চারি পুরুষার্থ চারিটি ভুজ। সমুজ্জ্বল কান্তিময় সকল বস্তুর উজ্জ্বলতা সাধিত হয় তোমার দন্ত-প্রভায়। পূর্ব্ব ও উত্তর দুই মীমাংসা শাস্ত্র তোমার শ্রুতিযুগলে ভূষণরূপ। পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী, বাণী তোমার বদনে করজোড়ে প্রার্থনা করে। এক কালেই নিখিল সৃষ্টি শোভা বিস্তার পূর্ব্বক উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হে বিনায়ক, তুমি সন্তোষ লাভ কর। তুমি সুখময় তুন্দিল উদর ভার বহন

* শান্তভাবের সিংহাসনে অবস্থিত পরমানন্দামৃত ভোগদায়ক পরমানুভবদাতা সন্তোষমূর্তি গুরুকে বন্দনা করি।১।

ভক্তিতেই ভাগবতের ভাব। কাব্য পাঠে অভাব। অধ্যয়নে পদ পরিচয়। কিন্তু ভক্তিতেই জ্ঞান লাভ।২।

কর। তোমার গভীর নাভিকুণ্ডে আনন্দ আবর্ত্ত। জ্ঞানের কটিবন্ধ করধনী। শুদ্ধসত্ত্ব শুভ্রবসন, সুবর্ণ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। প্রকৃতি ও পুরুষ তোমার দুই চরণ। দুই চরণ মোড়াইয়া তোমার সহজভাবের আসন পূর্ণ শোভার মন্দির, তোমার অল্প দৃষ্টিপাতে অন্তর শুদ্ধ হয়, বিঘ্ন দূরে যায়, সংসার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তুমি কুঠার ধারণ কর। সংসার সংকটে পড়িয়া তোমার ভজন ভাব ভক্তিতে, অঙ্কুশধারী তোমার কৃপায় ভক্ত সুরক্ষিত হয়, তোমার পদতলে। সত্য সেবক নিরপেক্ষ নিঃশঙ্ক ভক্তের আনন্দ সমৃদ্ধির নিমিত্ত তুমি স্বহস্তে লড্ডুক বিতরণ কর। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মেও তোমার অধিষ্ঠান, এই জন্য মূষিক-বাহন নাম তোমার তাৎপর্য্যপূর্ণ। তুমি নর অথবা গজ মূর্ত্তি, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মিলনের পরবস্তু নির্বিকার, তোমাকে গ্রন্থারম্ভে আদরে বন্দনা করি। গ্রন্থকথা বিস্তারে অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তৃত্বের এই অভিমান লইয়া তোমাকে কি ভাবে নমস্কার করি?

অনন্তর সারাসার বিচারমূর্ত্তি চৈতন্যরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়ন্ত্রণকারিণী সরস্বতীকে নমস্কার। যিনি বাণীর বাচিকা, বুদ্ধির দ্যোতিকা, প্রকাশের প্রকাশিনী, স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃরূপ মঙ্গলময়ী শিবশক্তি, তিনি উদ্বুদ্ধা হউন। যাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টিশক্তি, রসের রসপুষ্টি, ফলের ফলত্ব, শর্করার মধুরতা, কুসুমের মকরন্দের মতই শিবশক্তির সম্বন্ধ অনাদিসিদ্ধ তর্কাতীত। সেই অনির্বাচ্য স্বমাধুর্য্য পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী, চারিপ্রকার বাণীর মধ্যে বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া সরস্বতী গ্রন্থার্থে উঁহার মধুস্বাদ দান করিবেন। সারাসার নিরূপণ নিপুণা বলিয়া সহজাসনা সরস্বতী অগম্যা জ্ঞানের অগোচরা হইয়াও হংসস্থিতা হংসবাহিনী। তিনি পরমহংসে আরূঢ়, বিবেকবান জীবহংস তাহাকে সুষ্ঠুরূপে জানিতে সমর্থ, মূঢ় অভাগা মন্দমতি কিরূপে তাহাকে জানিবে? তাহার রূপবর্ণনা, অরূপের স্বরূপ নির্দ্ধারণ, স্বয়ং উপমারহিত, কথাস্বরূপ বলা। বেশ বলা হইল এ যেন বাণীই বাণীর স্তব করিল, বাণীর স্তব গৌরব বর্ণনা করিল বাণী স্বয়ং। বাগ্‌বিলাসরূপা পরমেশ্বরী সর্বাঙ্গ সুন্দরী অন্তরে বাহিরে অবস্থান পূর্ব্বক ভাবনায় ও ভাষায় গ্রন্থের তাৎপর্য্য স্বয়ং প্রকাশ করুন।

সর্বদা সহজ সন্তোষ পরিপূর্ণ অনুপম বাণী মহোৎসব আরম্ভ হইল। তবে উঁহার বক্তৃত্বের বোঝা আমার মাথায় চাপাইবেন না। বাগ্‌দেবীর স্তব স্তুতি বাণীই করেন। উঁহাতে দ্বৈতভাব সম্পদ্ হৃদয়ে রোচেনা। তাই

কথা বলিতে হয়, মৌন ভঙ্গ হয়। তত্ত্ব নিরূপণ হইলে তো আর কথা চলে না। এজন্য সেবকরূপে দ্বিতীয় হইয়া প্রণাম করি। অহংভাবের পর আত্মতত্ত্ব, যাহাতে অহংভাব বিলুপ্ত। আমিত্ব লুপ্ত হইলে 'তুমি' তত্ত্ব আর কোথায় থাকিবে? এইভাবে অগম্য ভাবের নিরূপণ। যেমন এক মহাসাগরে অপর সাগরের মিলন, শুধু তরঙ্গাবলীর নৃত্যভঙ্গীই। সেই প্রকার শব্দতরঙ্গাবলীই স্বরূপের উপর শোভা করে। শর্করা কণিকার মধুরতা শর্করা হইতে ভিন্ন নয়। সেইরূপ এই ব্রহ্মরস নিরূপণাত্মক শব্দও রস পরিপূর্ণ। অতএব আমার এই বাণীর মধ্যেই রসবৃত্তি সরস্বতী অবস্থান পূর্ব্বক সেই অভিন্ন তৃপ্তিই দান করিবেন। তাহারই উদ্গার এই কথা।

অনন্তর আনন্দ চিদ্ঘন মুর্ত্তি সাধুগণকে বন্দনা করি। ইহারা স্বরূপানন্দ-জীবনধারা বর্ষণ করিয়া সন্তপ্ত জনগণের তাপ নিবারণ করেন। ইহারাই চৈতন্যের অলংকার, ব্রহ্মবিদ্যার শৃঙ্গার, পরমেশ্বরের মনোহারী নিজ নিবাস মন্দির। অধিবাসের অধিষ্ঠান, সুখের উল্লাস, বিশ্রান্তির বিশ্বাস, নিজস্থান, ভূত-দয়ার সমুদ্র, করুণার মাতৃগৃহ, নির্গুণের সগুণ অবয়ব, নিজ গৌরব আনন্দ-স্বরূপ। তোমাদের দৃষ্টিতে দর্শন, তাহাতেই পুষ্টি, সন্তোষের তুষ্টি তোমাদের চরণ পথে। যাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তাহাদের ভব-সংকট দূর হয়, পরব্রহ্মদর্শনে আত্মানন্দ প্রকাশিত হয়। তাহাদের সমীপে সাধন চতুষ্টয় অনায়াস লব্ধ। শাস্ত্রচাতুর্য-বিলাসদর্শন অনাবশ্যক। হৃদয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ধারণ করিয়া তাহারা স্বয়ং প্রকাশ। যাহারা বিকল্প বুদ্ধি লইয়া জগতে জগৎ দর্শন করেন তাহারা ঠকিয়া যান, যাহারা বলেন, কিছুই নাই, তাহারাও দাম্ভিক। মৃত্তিকার দ্রোণ মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে দেবভাব রাখিয়া সফল কাম হওয়া উহা বিশ্বাস ভিন্ন হয় কি? বিকল্প করিয়া জগৎ ঠকিয়া যায়। কেবল বিশ্বাসেই ফল ফলে। সাধুগণ কথা না বলিলেও তাহাদের চরণেই সব কিছু লাভ করা যায়। অতএব বিশ্বাস করিয়া তাহাদের চরণে মস্তক অবনত কর। তাহাদের নমস্কার করা আবশ্যক, প্রণতকে তাহারা নিজের মত করেন। তাহাদের ঐকান্তিক সেবকভাব দেখিয়া নিজেও সেইরূপ হইবে। সাধু সেবার আনন্দের সমীপে ব্রহ্মানন্দ সুখও স্বল্প যাহারা অনন্যভাবে সাধুসেবা করেন, তাহারা আত্মানন্দ স্বাদ জানেন। সাধুগণ প্রকৃতির পর প্রাকৃতরূপে থাকিয়াও অবিকৃত। তাহাদের আকার বিকার ব্যবহার স্বতন্ত্র।

সঞ্চয়বুদ্ধি তাহাদের নাই। ভোগ তাহাদিগকে আকর্ষণ করে না, ত্যাগের জন্য তাহাদের চিন্তা নাই। তাহারা স্বাভাবিক স্থিতিতে অবস্থান করেন। জ্ঞানীর মত বাহার করিয়া অথবা পাগলের মত তাহারা থাকেন না। স্বরূপ জ্ঞানের গর্ব কিংবা বিস্মৃতির দুঃখ সহ্য করিয়া দেহ ধারণ করেন, আত্মদর্শনের প্রেম অঙ্গেই থাকে, সেই বিস্ময় ভুলিয়া থাকেন, প্রপঞ্চ ও পরমার্থ এক বলিয়াই তাহারা দেখেন। স্মরণ বিস্মরণ, দেহ দেহী ভেদ, অন্তর বাহির জ্ঞান, কি গেল বা রহিল, কিছু তাহারা স্মরণ করেন না। স্বরূপ জাগৃতির ফল স্বপ্ন, জাগরণ লুপ্ত হইল, সাক্ষী সুষুপ্তি সহ ডুবিল, উন্মনা ভাব গেল, তুরীয় ভাব তটস্থ হইয়া রহিল, দৃশ্য দ্রষ্টা লোপ হইল,কেবল একত্ব অবশেষ থাকার ফলে দর্শনও রহিল না অস্তিত্ব অনস্তিত্বের কথাও রহিল না। জ্ঞান অজ্ঞানকে আত্মসাৎ করিল জ্ঞাতৃত্ব দূর হইয়া বিজ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এরূপ সাধুগণ—তাহাদের সমীপে অবহিত হওয়ার জন্য আমি বালকের মত আবেদন জানাই। সূর্য্য সকল সময়ই প্রকাশ ঘনমূর্ত্তি, অগ্নি সর্বদাই দেদীপ্যমান, সেই প্রকার সাধুগণ সর্বদা সাবধান হইয়াই আছেন। আমার এই বাল্যচাপল্যে আপনারা মনোযোগ করিবেন।

সাধু সজ্জনগণ তখন মিলিত কণ্ঠে করুণায় আমাকে গ্রন্থার্থ প্রকাশে আজ্ঞা করিলেন। অতএব প্রাকৃত মারাঠী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলাম। একান্তে লোকমঙ্গলে গ্রন্থ রচনায় সাধুগণ খুব আগ্রহের সহিত আমাকে আদেশ করিলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন্ গ্রন্থে প্রবৃত্ত হইব। তাহারা বলিলেন, পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তাহার মধ্যে উদ্ধব গীতা, তুমি উহা লইয়াই প্রবৃত্ত হও। বক্তা ভগবান্ তোমার সহায়। ভগবৎ কথায় আমাদের রুচি, তাহাতে তোমার মত রসাল বক্তা, অতএব স্তুতি বন্ধ করিয়া এখন মূল কথা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হও।

সাধুগণের এই কৃপা-বচন শুনিয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের বাক্য-প্রসাদ আমার আত্মানন্দঘনকে উল্লসিত করিল। যেমন মেঘের গর্জ্জনে ময়ূরের আনন্দ হয় অথবা নবমেঘের জলধারা বর্ষণে চাতকের উল্লাস হয়, অথবা চন্দ্রের কিরণ দর্শনে চকোরের নয়নানন্দ হয়, সেই প্রকার সন্তগণের বদনে প্রকাশিত উত্তরে আমার আনন্দ হইল।

হে সাধুগণ আপনারা আপনাদের পূর্ণানন্দেই আমাকেও প্রচুর আনন্দে

নিমগ্ন করিলেন। তবে আমার 'আমি' বলিয়া ব্যর্থ অভিমান আপনারা বলপূর্ব্বক দূর করিয়া দিন। সমর্থগণের আজ্ঞা দাস কখনও অবজ্ঞা করে না—তবে আপনারা আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, উহা আমি পালন করি। আপনাদের সমীপে প্রার্থনা আপনারা অখণ্ড মনোযোগ তাহাতে দান করিবেন, অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

তখন সাধুগণ বলিলেন, আরে আমরাতো তোমার মনের মধ্যে মনকে লাগাইয়া শব্দের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি শীঘ্রগতি তোমার বর্ণনার বিষয় আরম্ভ কর।

অনন্তর কুলদেবতাকে নমস্কার করি। তিনি একমাত্র একনাথের অন্তরে ঐক্যভাবে অবস্থান করেন, অপর কোনো কথা মনে জাগিতে দেন না। তিনি মনে একরূপ দিয়াছেন সেইজন্য জন্ম কর্ম সকলই একরূপেই অনুভব। শ্রবণে মনে বদনে এক ভিন্ন দুই নাই। তিনি "একবীরা" (শ্রীরেণুকা) দেবীর সহিত একভাবে অবস্থান করেন। তাহার শিব ও শক্তি এই দুই স্বরূপে থাকিয়াও একত্বের বাধা হয় না গুর্বিনী একবীরা রেণুকা এক ভাবনায় এক পরশুরাম বীরকে প্রসব করেন। যাহারা 'আমি আমার' এই অভিমানে নিজেকে বীর বলিয়া মনে করিত তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য জ্ঞানরূপ পরশু ধারণ করিয়া পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া মায়াকে হত্যা করেন। পিতার সুখের জন্য তাহারই আজ্ঞায় আর তাহাতেই ধরণী মণ্ডলে তিনি একবীর বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন। তিনিই বাসনার প্রতীক সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের অহংভাব ছেদন করিয়া তাহার রাজ্য নিজ জাতিকে অর্পণ করেন। তিনি মাতাকে হত্যা করিয়া পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন। সেই হেতু আমাদের কুলদেবতা হইয়াছেন। তিনি নিজের নামে আমাকে প্রসিদ্ধ করিলেন। কারণ একবীর ও একনাথ শব্দ দুইটি একার্থ বাচক। তিনি যাহাকে বধ করিরাছেন তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সেই মাতা জগদম্বা উগ্রতা ত্যাগ করিয়া শান্ত হইয়াছেন। ক্রোড়ে করিয়া দেবী আশ্বাস দিয়াছেন যে, কোনো সংকটে পতিত হইলে আমার নাম স্মরণ করিলে সমাধান হইয়া যাইবে। অতএব 'জয় জয় জগদম্বা, বলিয়া গ্রন্থের আরম্ভ করিলাম। আমারবুদ্ধি মধ্যে গ্রন্থ যোগরূপ গর্ভাধান পূর্ব্বক প্রকট হউন।

অনন্তর জনার্দনকে বন্দনা করি। তিনি সংসার রূপ গজের সমীপে পঞ্চানন স্বরূপ—তাহার জন্মমৃত্যু সমান, সর্বদা সমবুদ্ধিতে পূর্ণকাম। যাহার কৃপা প্রসাদে দেহীর দেহভাব দূর হইয়া যায়, সংসার আবেশ অনতিবিলম্বে স্বপ্নের মত ছুটিয়া যায়। যাহার কৃপা কটাক্ষে অলক্ষ্য চিন্ময়ত্ব অনায়াসে দৃষ্টি গোচর হয়, গুরু গৌরবে সাক্ষীর সাক্ষ্যও বিস্মরণ হইয়া যায়। তাহার জীবত্ব বিনাই জীবন, মৃত্যু বিনাই মৃত্যুকে পরাজয়, দৃষ্টি বিনাই অদৃশ্য দর্শন, সম্পূর্ণাঙ্গ দর্শন, দেহে অবস্থান হইলেও বিদেহভাব, পরিশেষে একান্ত বিদেহ প্রবেশ। তখন গ্রহণ বা ত্যাগ ভেদ দূর হইয়া যায়, অভাব ভাবে পরিণত, সংদেহ নিঃসংশয়ে রূপায়িত, বিস্ময় বিস্মিত হইয়া যায়, কেবল স্বাত্মানন্দই অবিশিষ্ট থাকে।

তখন দিব্যভাবে রুচি জন্মিলে ভক্ত হয়। দেবতার ভক্তভাব ভজনীয় ও ভজনকারীর ভাবও ক্রমে লয় পায়। এরূপ মনে হইতে থাকে, নমস্কার যেন নমস্কার করিয়া বিদায় লয়, কে নমস্কার করিতেছিল সে কোথায় গেল? তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহাকে নমস্কার করা হইতেছিল তিনি রহিলেন কি রহিলেন না, দৃশ্য ও দ্রষ্টা যেন এক সঙ্গেই অন্তর্হিত হইল —দর্শন তখন ক্ষীণ হইল, দর্শককে যেন তখন উদরস্থ করিয়া লইয়াছে মনে হইল। যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সকল দিকেই তখন দেবতার প্রকাশ, তখন ভক্ত তাহার ভক্তভাবকে ভুলিয়া গিয়াছে, দেবতা তাহার দেবভাব বিস্মৃত হইয়া দেবত্বকে পরিহার করিয়াছেন, সর্বত্র তখন দেবভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই ভক্তের আর ভক্তভাব থাকিবারও স্থানাভাব হইয়াছে। ভক্তভাব ও ভগবদ্‌ভাব দুই ভাবেরই এই ভাবে অন্তর্লীন হওয়ার ফলে অভেদভাব মধ্যে কেবল অনন্ত স্বরূপই সাক্ষী রূপে থাকে। ত্যাগের সহিত ভোগ লয়, ভোগের সহিত ত্যাগের লয়, যোগের সহিত বিয়োগ আর যোগ্যতার সহিত অহংভাব ধ্বংস হইয়া যায়। তবে শেষ পর্য্যন্ত এই বিশেষ অবশিষ্ট থাকে যে, সাযুজ্য ভাবের মধ্যেও সাধক দাস হইয়া অবস্থান করে। সেই অবস্থায় যে আনন্দ রসাস্বাদন উহা অবিনাশী, অন্যের অগোচর। 'শিব হইয়া শিবের পূজা করিবে' এই বাক্য প্রতিপাদিত অবস্থা তখন উপস্থিত হয়। উহা বলিবার নয় তথাপি না বলিলেও নয়। যোগে এই আত্মভজন পাওয়া যায় না। এই অভেদ ভাবনার সুখে ডুবিয়া থাকিয়াও দেবর্ষি নারদ আনন্দভরে নৃত্যগীত

করিয়া থাকেন। শুক সনকাদি যাঁহারা আত্মারাম ভক্ত তাহারা এই সুখানন্দ অনুভব করেন। সাগর তাহার নিজের জল দিয়া অপর সকল নদনদী পূর্ণ করিয়া দেয়, তেমনই পরম দেবতা তাহার দেবভাব প্রদান করিয়া সকল ভক্তকে দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাগর ও নদী নালার জীবন জল এক অভিন্ন, কিন্তু তাহাদের মিলনে ভজন শোভা অধিক, সেই প্রকার ঐক্যভাবে কেহ ভজন করিলেও তাহার সুখ অনুভব হয়। দক্ষিণ অঙ্গ ও বাম অঙ্গ দুইটি নাম ভিন্ন, কিন্তু অঙ্গ বিচারে তাহারা অভিন্নই। সেই প্রকার দেবভাব ও ভক্তভাব আপাততঃ ভিন্ন মনে হইলেও দেবতার অনুগ্রহে ঐক্যভাবও অনুভব হয়।

উপরোক্ত বিচার অনুসারে গুরুদেব জনার্দ্দন আমাকে কৃপা করিয়া অদ্বৈতভাবে ভক্ত করিয়াছেন তথাপি আমার শরীর, মন ও বাক্যে নিত্য প্রেরণা প্রদান করিয়া আমাকে বক্তা করিয়াছেন। গুরুদেব জনার্দ্দন আমারই মুখে কথা ফুটাইতেছেন, সর্ব্বদা আমার দৃষ্টির সম্মুখে রহিয়াছেন, তাহারই বিবেক বিচার দেখিয়া গ্রন্থের অর্থ লিখিতেছি।

তবে এই বিষয়ে বিশেষ কৌতুকের বিষয় যে লিখিত অভঙ্গে তিনি আমার নামই অঙ্কিত করাইয়াছেন অথচ আমার নামের অভিমান দূর করিয়া দিবার স্থান রাখেন নাই।

এই বাক্যে তাঁহার সন্তোষ হইয়াছে। তিনি বলেন, ভালরে ভাল, তুই নিজ ভক্তির পুতুল হইয়াছিস্ বেশ করিয়া গুহ্য অর্থ প্রকাশ করিয়াছিস্। ইহা কি স্তুতি অথবা বিষয় প্রতিপাদন? ইহা কি গ্রন্থের ভূমিকা অথবা ব্রহ্মজ্ঞান? ইহা কি সাহিত্য না সমাধান সিদ্ধান্ত? ইহার কি নাম করিব তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তোমার এক একটী বাক্য বিচারের মূল কথা প্রকাশ করে, সন্তোষের অপরিমিত সন্তোষ দান করে। তোমার মুখ নিঃসৃত বাক্য সাধু হৃদয়ের পরমানন্দদায়ক। মুমুক্ষু সারঙ্গপুঞ্জ উহা লইয়া নিরন্তর গুঞ্জন নিরত হইয়া থাকেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে দৃষ্টিপাত করিলে মুক্ত মুমুক্ষু ও অন্যান্য সকলেরই শ্রবণমাত্র আত্মসুখানন্দ অনুভব হইবে।

বচনামৃত তুষার এই গ্রন্থভূমিকে বিবেকের অঙ্কুরে ভরিয়া ফেলিয়াছে। ক্রমে সেই সকল বৃক্ষরূপে ত্রিশটি ফলে সুফলিত হইয়াছে। নির্জ্জীব জীবন পাইয়াছে, সিদ্ধপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, পতিব্রতা বৈভবসহ নিজ পতিকে

লাভ করিয়াছে। সেই প্রকার প্রচুর হর্ষানন্দে হে প্রভু, তোমার চরণ প্রসাদে এই গ্রন্থের সহজ রীতিতে অর্থ প্রকাশে আনন্দ লাভ করি।

শ্রীরামের প্রতাপদৃষ্টি ফলে সাগরজলে শিলা ভাসে, বশিষ্ঠের আজ্ঞায় সূর্য্যমণ্ডলের উজ্জ্বলতা, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মন্ত্রের শক্তিতে শুষ্ক কাষ্ঠেও পল্লবোদ্‌গম, অথবা কুকুরকে সঙ্গে লইয়াও ধর্ম্মরাজের স্বর্গবাস, এই অসম্ভবও সম্ভব হয় যেভাবে, সেই ভাবে অসম্ভব হইলেও আমার নামাঙ্কনে এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ইহাও শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞাপ্রতাপের এবং বৈভবের দ্যোতক।

একা ও একাদশ দুটি কথারই রাশিনক্ষত্র এক। অর্থাৎ একা ও একাদশ একের মধ্যেই আছে। তবে একা হইতে একাদশের মূল্য দশ বেশী। একেরপিঠে এক দিলে একাদশ হয়। ইহাতে একাই একাদশের ব্যাখ্যার প্রেরণা লাভ করিয়াছি। অতএব যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা দেখিবেন ইহার মধ্যে এক ভিন্ন দুই নাই। এক গুরু জনার্দ্দনই একনাথকে টীকাকার করিয়া রচনাকে সার্থক করিয়াছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অন্ত্যভাগ দর্শন করিয়া একাদশ স্কন্ধের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথ একাদশের গ্রন্থার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। একাদশের টীকা করিয়া একা একক আনন্দের অধিকারী হইয়াছে, অদ্বৈতানন্দের পাত্র হইয়াছে।

অনন্তর ব্যাস বাল্মীকি ভার্গব, যিনি উশনা নামে পুরাণে প্রসিদ্ধ, সেই কবিগণকে নমস্কার করি। তাহারা আপন আপন জ্ঞানের প্রেরণা দান পূর্ব্বক আমার বুদ্ধির সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করুন। গ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য এই প্রার্থনা করি।

ইহার পর গ্রন্থের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত মহাচতুর শ্রীশঙ্করাচার্যকে প্রণাম করি। কারণ তিনি কর্ম-উপাসনার বিচার শেষ করিয়া প্রবোধ দিনকর জ্ঞানসূর্য্যের প্রকাশ করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীধর স্বামীকে বন্দনা করি, যিনি ভাগবত ব্যাখ্যাতৃগণ মধ্যে অগ্রগণ্য, যাহার ব্যাখ্যায় অফুরন্ত তাৎপর্য্য নিহিত আছে।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য টীকাকার কাব্যকর্ত্তা ও বিচার নিপুণ সাধুগণের চরণে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ শ্রবণের নিমিত্ত মনোযোগী হইবার নিমিত্ত সাদরে প্রার্থনা করি।

অনন্তর নিবৃত্তিনাথ প্রমুখ জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, চাঙ্গদেব, বটেশ্বর, যাহারা গুরুকৃপার সুপ্রচুর ভাগ্যলাভ করিয়াছেন, এইপ্রকার শ্রেষ্ঠ কবি যাহাদের গ্রন্থদর্শনে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাদের চরণে একাত্মভাবে ও অনন্য ভক্তির সহিত মস্তক রাখিয়া প্রণাম করি।

সংস্কৃত গ্রন্থকর্তা মহাকবি আখ্যা লাভ করেন আর প্রাকৃত গ্রন্থকর্তা লঘুকবি বলিয়া গণ্য হইবেন কেন? সোণার ফুলের মধ্যে আবার কোন্‌টা নতুন কোন্‌টা পুরাতন বলিয়া মূল্যের ব্যতিক্রম হয় নাকি? কপিলা গাভীর দুধই দুধ, অন্য গাভীর দুধ কি জল হয় নাকি? বাস্তব বিচারে দেখা যাইবে উভয় প্রকার দুধই বর্ণে ও স্বাদে একপ্রকার মধুর। সেই ভাবে সংস্কৃতের যে তাৎপর্য্য উহা যদি প্রাকৃত মারাঠী ভাষাতেও লাভ করা যায় তবে মারাঠীর অনাদর হইবে কেন? রাজা যদি বনে যাইয়া বসবাস করেন সেই স্থানই সেবকগণের নিমিত্ত পবিত্র, সেখানে সেবকগণ যাইয়া রাজার সেবা না করিলে তাহারা দণ্ডনীয় হয়। দরিদ্রের কন্যা অথবা ধনীর কন্যা রাজা যাহারই পাণি-গ্রহণ করুন তাহারা সমতাই লাভ করিবেন। দেশ ভাষার প্রভাবে প্রপঞ্চ পদার্থের নামে ব্যতিক্রম হয়, তাহা বলিয়া ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ বা রামাদি নামের ব্যতিক্রম হয় না। ভাষার পার্থক্য হেতু সংস্কৃত ভাষা দেবতাগণ করিয়াছেন আর প্রাকৃত ভাষা কি চোরেরা করিয়াছে? এই ভেদ শুধু অভিমানের ভ্রমচক্রে পতিত হওয়ার ফল, বৃথা এই কথায় কি লাভ হইবে? অতএব ভাষা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত যাহাই হউক না কেন উহা যদি হরিকথাময় হয় তবেই উহাকে তত্ত্বতঃ পবিত্র ও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অনন্তর ভানুদাসকে বন্দনা-করি। ইনি আমার পিতামহের পিতা। ইহারই বংশে ভগবান্ পরম্পরাক্রমে প্রিয়রূপে বরণীয় হইয়াছেন। ভানুদাস বাল্যকালেই সূর্য্যের উপাসনা করিয়া স্বয়ং জ্ঞানময় ভাস্কর হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মান অভিমান জয় করিয়া ভগবৎ স্বরূপতার পবিত্রতা অর্জন করেন। রাত্রির অন্ধকারেও কর্ণের কুণ্ডলে সমুজ্জল বিগ্রহ শ্রীবিট্‌ঠল তাহার সমীপে আগমন করিয়াছেন তাহাকে দর্শন করিতে, এই দৃশ্য একদা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। ভানুদাসের পুত্র চক্রপাণি, তাঁহার সুলক্ষণ পুত্র সূর্য্য, পিতামহ ভানুদাস পৌত্রের নাম সূর্য্য রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। সূর্য্যের

প্রভাব কিরণাবলীর ন্যায় রুক্মিণী দেবী আমার জননী। সাক্ষাৎ রুক্মিণীই যেন আমার মাতা। এই গ্রন্থারম্ভে আমার পূর্বজগণকে বন্দনা করিয়া নিজের সৌভাগ্য অনুভব করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করি। কেননা আমার জন্ম হইয়াছে বৈষ্ণবকুলে।

বৈষ্ণবকুল নায়ক দেবর্ষি নারদ, প্রহ্লাদ, সনকাদি, উদ্ধব, অক্রুর, শ্রীশুক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ভগবদ্ ভক্ত। সেই বৈষ্ণবগণ গ্রন্থের তাৎপর্য্যে মনোযোগী, বৈষ্ণবকুলমালাকে গ্রন্থারম্ভে আমি বন্দনা করিলাম। যাঁহার গোত্রে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করি। তিনি ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রতিসৃষ্টির ব্রহ্মা, গায়ত্রীমন্ত্রের দ্রষ্টা প্রকাশক ঋষি। উপনিষদ্ বিচার পরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রণাম, তিনি কৃপামৃত বর্ষণ করিয়া কাব্যরচনাকে পোষণ করুন। অনন্তর অশেষ জীবমাত্রকে প্রণাম করি। ফলে বিশ্বম্ভরের সখ্য লাভ করিয়া গ্রন্থারম্ভে বিশ্বম্ভরের সম্মতি লাভ হইবে। অনন্তর পরমাচার্য্য দত্তাত্রেয়কে নমস্কার। তিনি আচার্য্যেরও আচার্য্য যিনি পরমগুরুরূপে অর্থবোধে নিজস্ব জ্ঞান প্রেরণা প্রদানে গ্রন্থকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তিনিই শব্দ দেখাইয়া অর্থে মন ভরিয়া দিয়া পুনরায় বক্তৃশক্তি প্রদান করিয়া আমাকে দিয়া বলাইতেছেন। আমার বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত ভগবানের হৃদয়ে অবস্থান করে, অতএব যাহার চিত্ত সর্বদা ভগবানের কাছে থাকে, সে-ই এই ভাগবত লাভ করিতে পারে।

পূর্ব্বকল্পের সঞ্চিতজ্ঞান কল্পের আদিতে ভগবান্ নিজাত্মবোধ সম্বলিত করিয়া চতুঃশ্লোকী স্বরূপে ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। তাহার নবসদ্ভাবে চতুঃশ্লোকীর প্রতিটি শব্দের তাৎপর্য্য অনুভব হইল। সদ্‌গুরু কৃপার কি আশ্চর্য্য মহিমা দেখ। গুরু পরম্পরায় সেই চতুঃশ্লোকী জ্ঞান দেবর্ষি নারদ লাভ করিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রবুদ্ধ নারদ উহার তাৎপর্য্য অনুভবে পূর্ণ পরমানন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্ম বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া ব্রহ্মপদের গান গাহিয়া ব্রহ্মানন্দে নাচিয়া নাচিয়া হেলিয়া দুলিয়া ধরণীতে বিচরণ করেন। তিনি আসিলেন সরস্বতী তীরে, সেখানে দেখিলেন ঋষীশ্বর ব্যাসকে, তিনি দুরূহ সংশয়াকুলচিত্ত হইয়া আছেন। বেদার্থ প্রকাশক পুরাণ সকল নির্মাণ করিয়াও তিনি নিজের মঙ্গলজনক সমাধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাই সংশয় সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু

খাইতেছিলেন, এই অবস্থায় ব্রহ্মপুত্র নারদকে পাইলেন। কৃপালু নারদ বলিলেন—ভয় করিওনা। একান্তে লইয়া গিয়া এক মন করিয়া তাহাকে ভবভয় মোচন নির্মল জ্ঞানপূর্ণ চতুঃশ্লোকী উপদেশ করিলেন। সূর্য্য দেখিলেন না, আকাশ জানিল না, কান শুনিল না, দেবর্ষি আত্মবোধ উপদেশ দান করিলেন। সেই নারদের বচন সংশয়কে দগ্ধ করিল। তখন ব্যাসের সমাধান হইল। তিনি আত্মানন্দে পূর্ণতা লাভ করিলেন। ইহার পর শ্রীব্যাস দশ-লক্ষণ সমন্বিত স্বপ্রকাশিত ভাগবত শুকদেবকে উপদেশ করিয়া আত্মজ্ঞানের পূর্ণ সার্থকতা করিলেন। শুকদেবের আনন্দ হইল, পরমানন্দে তিনি সমাধিতে মগ্ন হইয়া আত্মানন্দে নিশ্চল রহিলেন। সমাধি দশায় রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষ জানিতে পারিয়া তিনি অকস্মাৎ প্রয়োপবেশনে অবস্থিত তাহার সমীপে আগমন করিলেন। রাজা পরীক্ষিতের অধিকার তিনি দেখিলেন। রাজা অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ, তাহার ধার্ম্মিকতার বলে কলিকে তিনি বাড়িতে দেন নাই। ইহাতে তাহার ধর্ম্মাধিকারিতার প্রাচুর্য বুঝা গিয়াছে। কেননা শ্রীকৃষ্ণ এই ভূলোকে অবস্থান কাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজ্য অবস্থিত থাকে, তারপর শ্রীকৃষ্ণ নিজধামে গমনের পর কলির ভয় দূর হইয়া গেলেও কলিকে নিগ্রহ করিয়া পরীক্ষিৎ ধর্ম্মবলে ধৈর্য্যবান্ হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ধার্ম্মিকেরা অধিক ধৈর্য্যবান হন। অর্জুনের বীর্য্যপরম্পরায় পরীক্ষিতের আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু আর অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ। অধিকারীগণের মধ্যে পরীক্ষিৎ রত্ন বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষিৎ যখন মাতা উত্তরার গর্ভে তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রজ্বালা তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। সেই পরীক্ষিতের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে কে বলিতে সমর্থ? গর্ভমধ্যে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি প্রাণীমাত্রের অন্তরে আছেন। তিনি ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াই তাহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিয়াছেন। নামটির অগাধ তাৎপর্য্য। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ ক্ষিতিকে পবিত্র করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা হইতে ত্রিলোকে পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপে ভাগবতের খ্যাতি বিস্তার হইল। অঙ্গে বিবেক বৈরাগ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া ত্যক্তোদক পরীক্ষিৎকে দেখিয়া শুকদেবের অত্যন্ত আনন্দ হইল। ব্রাহ্মণের কোপও বিচিত্র যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়া

দেয়। তাহার চরণে কায়মনবাক্যে ভক্তিভরে প্রণাম করি। ব্রহ্ম হইতেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ইহা আর আমি বেশী বলি কি? সাক্ষাৎভাবে শ্রীধরভগবান নিজবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন অলঙ্কার ধারণ করেন। অতএব ব্রাহ্মণই ব্রহ্মের উপাস্য দেবতা এই সিদ্ধান্ত অকাট্য সত্য। এজন্যই বেদরূপ নারায়ণ ব্রাহ্মণের উদরে যাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণই ভূদেব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবয়ব। যে তাহাকে ভজন না করে সে নিতান্তই ভাগ্যহীন। ব্রাহ্মণের শক্তির বিলক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন বুঝি তাহার সমুচ্চারিত মন্ত্রমাত্রে আজ্ঞাবহনকারীর ন্যায় দেবতা প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবির্ভূত হন।

তখন সাধুগণ বলিয়া উঠিলেন, কি বলিব, তুমি নিজের আনন্দে যে প্রকার প্রশংসা স্তুতি আরম্ভ করিয়াছ তাহাতে সাহিত্য-কুশলতা ও নব নব সিদ্ধান্তের প্রকাশ হইতেছে। গণেশ ও সরস্বতী যে এক ব্রহ্মপংক্তিতে বসিয়াছেন। সেই ভাবেই সাধুসন্তের স্তবস্তুতি ঐক্য বৃত্তিতে বর্ণিত হইতেছে। কুল ও কুলদেবতার বর্ণনায় যে কথা বলিয়াছ উহাতেও শ্রবণ সুখে চিত্তের সকল চিন্তাকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছ। সন্তচরণে, ব্রাহ্মণের প্রতি, গুরুস্তবে তোমার যে সদ্ভাব উহাতে তোমার বাণী ধন্য হইয়াছে। মনে হয় তোমার মুখে তোমার গুরু জনার্দনই বলিতেছেন। তোমার বাণীতে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। সিদ্ধান্তে পূর্ণ কথা বলিবার নিমিত্ত হৃদয়ে বিচারকে ধারণ করিয়া মূল কথা বলিতে আরম্ভ কর।

হে সাধুগণ, আমি ভাবে আত্মহারা হইয়া সবই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আপনারা আমাকে সচেতন করিলেন, এই জন্য আপনাদের চরণই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমার যে বিষয়ে কিছু ন্যূনতা থাকিবে আপনারা উহা পূর্ণ করিয়া দিবেন। গ্রন্থার্থের সিদ্ধি দান করিয়া সজ্জনগণ আমাকে অঙ্গীকার করিবেন।

তাঁহারা বলিলেন, ভাল রে ভাল, ঠিক বলিয়াছ। তোমার গ্রন্থপীটিকা ভূমিকা অতি সুন্দর হইয়াছে। অনন্তর হে কবিপোষক সংস্কৃত টীকার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরাগ। তোমার বাক্য মধুর, এখন সেই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হও।

এই প্রকার ভাষণের পর আমি ভক্তিপূর্ব্বক পদপ্রান্তে প্রণাম করিয়া তাহাদের আজ্ঞানুসারে কথা আরম্ভ করিলাম।

নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে শৌনকাদি মুনির প্রতি সূত গত কথার অন্বয় করিয়া বলেন। দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ভাগবতের দশটি লক্ষণের নয়টি বিষয় কথা বিস্তার হইয়াছে। অনন্তর একাদশ স্কন্ধে মুক্তি নামক লক্ষণটি শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন।

যিনি চিদাকাশের পূর্ণচন্দ্র, যিনি যোগজ্ঞান-নরেন্দ্র সেই যোগীন্দ্র শুকদেব সপরিষদ রাজা পরীক্ষিৎকে বলেন। তখন পরীক্ষিৎ বলেন—যে জন্য আমি জলপান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি সে জন্যই আপনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন। আমার ভাগ্যকে প্রশংসা না করিয়া পারি না। যথার্থই মোক্ষের কথা অগাধ। মোক্ষের প্রতি যাহাদের বিশ্বাস তাহারা মনকে সংযত করিয়া সর্বথা সেই কথা শ্রবণে আদর পোষণ করেন। কানকে অন্তরে লইয়া কানে মন দিয়া সাবধানে মনোযোগ করিয়া কথানুসন্ধান করিবে। পরমদেবতা বহু অবতার স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নবরূপে বিশেষ কিছু চমৎকৃতি আছে। দেবতাগণও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের লীলার রহস্য অগম্য।

জননীর নিকট হইতে সরিয়া গিয়া নিজের লীলায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাল্যেই পূতনাদিকে মুক্তি দান করিলেন। নিজের অঙ্গ দান করিয়া মাতাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। গোপালগণকে বৈকুণ্ঠ প্রদীপ দেখাইলেন। তথাপি গোপবালক মূর্ত্তি ত্যাগ করিলেন না। বাল্যেই বলবান্ অসুর সংহার করিলেন। অতি অদ্ভুত কর্ম সকলকার সম্মুখেই সম্পন্ন করিলেন। তথাপি তিলমাত্রও তাহার বাল্যভাব ছুটিল না। ব্রহ্ম হইয়া চুরি করেন, দেবতা হইয়াও ব্যভিচারী, পুত্র কলত্র লইয়াও ব্রহ্মচারী—এই স্বরূপেই দেখাইলেন। সীমাহীন অকলঙ্কস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অধর্মের মধ্যেও ধর্ম্মবৃদ্ধি করিলেন, অকর্মেও কর্মফল দিলেন, অনিয়মকে নিয়ম করিলেন। সংগ করিয়াও সংগত্যাগ শিক্ষা দিলেন, ভোগ করিয়াও যোগবৃদ্ধি করিলেন। ত্যাগ না করিয়াও ত্যাগী হইলেন। তিনি অব্যঙ্গ ও নির্দোষ ত্যাগ করিলেন। কর্মীকেও পরম জ্ঞানী করিয়া কর্মজাড্য হেতু ভেদ বুদ্ধি দূর করিয়া ভোগের মধ্যেও বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া মোক্ষপদ দান করিলেন। ভক্তি ভুক্তি মুক্তি তিনকেই এক পংক্তিতে রাখিলেন, তাঁহার মহিমা কি ভাবে বর্ণনা করিব? যিনি মাটি খাইয়া বিশ্বরূপ দেখাইলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে উত্তম

ও পরম পবিত্র চরিত্র আর কাহার বলিব ? সত্য সত্যই তিনি আত্মজ্ঞানের পূর্ণ বিস্তার এই অবতারেই করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

একাদশ স্কন্ধের তাৎপর্য সংক্ষেপ বর্ণনা মুক্তি, পরমাত্মস্থিতি ও আত্মজ্ঞান আদ্যন্ত উহাই বলা হইয়াছে। উহার মধ্যে দেবর্ষি নারদ ও বসুদেবের সংবাদের অন্তর্গত নিমি জয়ন্তের প্রসঙ্গ কথাসংগতির নিমিত্ত বলা হইয়াছে— ইহারই নাম সংক্ষেপ বর্ণনা। তাহাতে উদ্ধবের পরম প্রীতি নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে বর্ণনা করিয়া সমাধান করিয়াছেন। সেই কথা নিশ্চিতই বিস্তৃত কথা।

দশম স্কন্ধে নিরোধ লক্ষণের অন্তর্গত অধার্মিক জনগণকে নানা উপায়ে সংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধরার ভার হরণ করেন এই কথা বলা হইয়াছে। যে অধর্ম ভারে প্রপীড়িত ধরণী সদা ক্রন্দন করে, তাহার সহায়তার জন্য পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। দুষ্ট দৈত্য দানব যাহারা ধরার ভার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, সেই পূর্ব্বকথার ভাব শুকদেব বলেন—

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিম্ ॥১॥

যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈ
দ্যূতহেলনকচ গ্রহণাদিভিস্তান্।
কৃত্বা নিমিত্তমিতরেতরতঃ সমেতান্
হত্বা নৃপান্ নিরহরৎ ক্ষিতিভারমীশঃ ॥২॥

পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলবান্ শ্রীবলদেব লোকরমণ রাম যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া দানব বধ করিয়াছেন। ইহারপর যাদবগণকে কিভাবে নিহত করিবেন তাহার বুদ্ধি উদ্ভাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বগোত্র আত্মীয়গণের মধ্যে ভয়ঙ্কর কলহ উৎপাদন করিলেন। শার্ঙ্গধর কলহ ছলনায় ধরাভার হরণ করিবেন। পাণ্ডবগণের ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া কৌরবভার হরণ করিলেন ॥১॥

দুষ্ট কর্মপরায়ণ ঘোর স্বভাব ইহাদিগের সৈন্যবল ধরার ভার। কলহের সূত্রে তাহাদিগকে একত্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিহত করিয়াছিলেন। ইহাতে কপটতার বন্ধন পড়িয়াছিল। দুর্নীতি পরায়ণের কপট দ্যূতক্রীড়ায় সরলহৃদয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে হারাইলেন। দুঃশাসন তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া সভা মধ্যে আনয়ন করিল। তাহার এই অন্যায় কর্ম সমর্থন করিতে নারাজ অনেকেই সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। দ্রৌপদীকে নগ্ন করিবার জন্য তাঁহার বস্ত্র হরণ কৌরবগণের প্রধানতম অন্যায়। অগ্নিদাহ, বিষদান ধন, স্ত্রী অপহরণ, অস্ত্রদ্বারা আহত করিবার চেষ্টা প্রভৃতি অন্যায় তো হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর অবজ্ঞা, অবহেলা, দুরুক্তি ও ধর্মস্খলন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের দ্বারা সম্পূর্ণ করাইয়াছেন। পতিব্রতার বস্ত্রহরণ মৃত্যুর কারণ কলহ ও কুলক্ষয়কে ডাকিয়া আনিয়াছে। এই প্রকার ধর্মের বিরোধিতা নিমিত্ত কৌরবগণ অবশ্য বধ্য। পাণ্ডবগণের শুদ্ধ বুদ্ধি উদয় করিয়া তাহাদিগের ক্রোধ সঞ্চার করাইয়াছিলেন। ভুভার হরণ চরিত্র সখা, স্বজন, সুহৃদ্, স্বগোত্র, শাস্ত্রবিবেকী অতি পবিত্র হৃদয় ব্যক্তিগণের মধ্যেও বিচিত্র কলহসৃষ্টি ধরাভার হরণ অভিলাষে গোবিন্দই করিয়াছেন ॥২॥

ভূভাররাজ পৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্নন্নু গতোঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্ যাদবং কুলমহো অবিষহ্যমাস্তে ॥৩॥

নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চি
ন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যম্।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তিমুপৈমি ধাম ॥৪॥

পক্ষপাত দোষদুষ্ট এরূপ অনেক রাজা তাহাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য অধর্মাচরণের ফলে মিথ্যা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। পৃথিবীর অধার্মিক সেনাদল ও রাজন্যবর্গকে শ্রীকৃষ্ণ এরূপ ভাবে নিহত করিলেন যাহাতে পৃথ্বীভার দূর হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে অসুর সংহারের নিমিত্ত বলশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা বলদর্পে গর্বিত হইয়া পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণকেই আর মানিতে চাহিতেছিল না। তখন তিনি যাদবগণকে বিনাশ না করিলে পৃথিবীর ভার সম্পূর্ণ দূর হইবে না বুঝিতে পারিয়া কি করিয়া যাদবকুল বিনষ্ট হইবে তাহার উপায় চিন্তা করিলেন। অগ্নি কর্পূর শেষ হইলে অগ্নিও উড়িয়া যায়। সেই রীতিতে যাদবগণকে নিঃশেষ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কলাগাছ ফলিয়া খুব বৃদ্ধি পায়। যখন পাকিয়া যায় তখন মালী ফল লইয়া ঝাড় তুলিয়া ফেলে। সেই প্রকার যাদবগণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল শুধু মৃত্যুর জন্যই। ফল পরিপক্ক হইলে উহা পাড়িবার জন্য গন্ধে আকৃষ্ট মালী অগ্রসর হয়। সেইভাবে বনমালী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার নিজের-কুলের-ফল সংগ্রহের জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতেই অগণিত বাহুবল প্রতাপে যাদবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বিনাশের ইচ্ছায় কালরূপে ক্ষুব্ধ হইলেন। অতুলনীয় বল যাদবগণ আর কাহাকেও শাসকরূপে মানিতে চাহেনা নিজেরাই অতিশয় প্রবল, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অসহ্য বোধ হইল ॥৩॥

আমি নিজ ধামে গমন করিলে অধর্ম প্রবল ভাবে প্রবর্তিত হইবে। সম্পৎ ও গর্ব কুকর্মে প্রবৃত্ত করে। ইহারা আমার বলে অতি প্রবল,

এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সঞ্জহ্রে স্বকুলং বিভুঃ ॥৫॥

স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষতাং ক্রিয়াঃ ॥৬॥

সকলেই অতিরথ। পৃথিবীতে ইহাদের প্রতিযোদ্ধা নাই। ইহাদের দমন করিতে একমাত্র আমিই আছি। ইন্দ্রাদি দেবগণ, দৈত্য রাক্ষস দানব কেহ ইহাদের সমযোদ্ধা নয়। শেষ পর্য্যন্ত এই যাদবগণের বিনাশের দায়ও আমার উপরই পড়িল। অতএব আমার চোখের সামনেই নিজের কুল বিনষ্ট করিতে হইবে। কপটতার ছলনায় ঋষিগণের অভিশাপরূপ নির্দ্দয়তা হইল। এই মূলে শ্রীকৃষ্ণের সংকল্প অনুসারে ব্রহ্মশাপ হইল। অনন্তর আত্মীয়গণের বিরোধ কাল অগ্নির প্রকোপ সকলের বিনাশের কারণ হইল। এই প্রকারে যাদবকুলের বিনাশ করিয়া আমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আমি নিজ ধামে যাইব—কৃষ্ণ এই ইচ্ছা করিলেন ॥৪॥

ইহার পর নিজেই নিজের কুল বিনাশের দৃঢ় সংকল্প করিলেন। কিন্তু এই কার্য্য কিরূপে সংঘটিত হয়? এই বিচার করিয়া জগদীশ্বর ব্রহ্ম-শাপের ছলনায় অনায়াসে স্বকুল ধ্বংস করিলেন। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে অবতার কার্য্যও শেষ হইল। যদুবর শ্রীকৃষ্ণ স্বলীলা গোপন করিয়া নিজধামে যাওয়ার বিচার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিগ্রহ অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে দেহ ধারণ করেন, অতি সুন্দর রূপ, তাঁহার গুণ কর্ম্ম ও ক্রিয়া অতি পবিত্র, জগদুদ্ধারক শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার পরিপূর্ণ ব্রহ্ম ॥৫॥

যিনি সকল মঙ্গলের পূর্ণমঙ্গল, যিনি গোকুলে কামিনীরমণ, মোক্ষের তরণী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সৌন্দর্য্য অলৌকিক। যিনি ভক্তকামকল্পতরু, মনোহর মেঘ-শ্যাম, যাহার নাম ত্রিলোক প্রসিদ্ধ, স্বয়ং পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর তাঁহার নাম। কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ লক্ষ্মী প্রমত্তা, মদন অনাথ, ইন্দ্র চন্দ্র আর কোথায় দাঁড়ায়? যাঁহার নাম ত্রিলোক পাবন, যে নামে অসুর সংহার,

আপ্তকাম ভক্তগণের সর্ব্বদা সুলভ সেই নাম। ত্রিলোকের সকল সুন্দরতা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপে মিলিত হইয়াছে অথবা শ্রীকৃষ্ণের রূপের সৌন্দর্য্যাংশ লাভ করিয়াই বিশ্বের সকল সামগ্রী সুন্দর হইয়াছে।

যিনি সকল সৌন্দর্য্যের শোভা, যিনি লাবণ্যের লালসাপুঞ্জ, যাঁহার অঙ্গসঙ্গপ্রভা জগতে শোভার প্রবর্ত্তন করিয়াছে; যিনি সকল হর্ষের চাকচিক্যময় হর্ষ, সুখেরও সুখকর পরম সুখ, যিনি সকল বিশ্রান্তির আশ্রয়, যিনি অমূর্ত্ত হইয়াও মূর্ত্ত, সকল লোক লাবণ্য, শোভার শোভাকারী, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ সৌভাগ্য মূর্ত্তিমান। ঘৃত তরল অথবা কঠিন যে ভাবেই থাকুক তাহার ঘৃত স্বরূপ যেমন অবিকৃতই থাকে সেরূপ অমূর্ত্ত বা মূর্ত্ত যাহাই হউক তিনি সচল পরব্রহ্ম। তাঁহাকে দেখিলে আর কিছু দেখা দেখি থাকে না। দেখার কাজ ফুরাইয়া যায়। দৃষ্টি একবার শ্রীকৃষ্ণরূপে পড়িলে ঐরূপেই আনন্দে সাঁতার দিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ রসাস্বাদ একবার আস্বাদন করিলে অন্য রসাস্বাদন রসনা ত্যাগ করিয়া দেয়, অন্য রস সে আর চাখে না। উহার মাধুর্য্য অভিনব, অমৃত তাহার মধুরতার সমীপে বিস্বাদ; এইজন্য আপন রসনা হরিরসে সম্পূর্ণরূপে রসাইবে। শ্রীকৃষ্ণ সুখে মন মগ্ন হইলে সংসারের সকল প্রকার সুখরুচি নীরস হইয়া যায়। একবার শ্রীকৃষ্ণ সুগন্ধ সুখ অনুভব হইলে নাসিকা অপর কোনো সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লইতে চাহে না। বাস, সুবাস ও কুসুম, ঘ্রেয়, ঘ্রাতা ও ঘ্রাণ কৃষ্ণমকরন্দে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে।

যাহার অঙ্গস্পর্শে দেহ বা দেহধারীর দেহভাব দূর হইয়া যায়, অঙ্গ অঙ্গত্ব ভুলিবার ফলে দেহবুদ্ধি আর থাকে না। কঠিনের কঠিনতা চলিয়া যায়, এই ভাবে কোমলের কোমলতা, স্পর্শের স্পর্শত্ব দূর হইয়া যায় শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে। তাহাকে বুঝাইতে বাচ্য ও বাচকের আশ্রয় যে বাণী সে-ও নেতি নেতি বলিয়া নিঃশব্দ হইয়া যায়। শব্দ উচ্চারণ করিতে উহা বন্ধ হইয়া যায়, বলিলেই বা কে অনুভব করে? কৃষ্ণশব্দ বাচ্য বাচক ভেদ আর রাখিল না। চিত্ত যদি চরণ চিন্তা করে তাহার চিত্তত্ব ভুলিয়া যায়, কিন্তু নিশ্চিতরূপে কৃষ্ণচরণই শান্তভাবে দর্শন করে। চিত্ত, চিন্তা, চিন্তন এই তিনের পার্থক্য থাকে না। চরণ চিন্তা করিলেই নিজচিত্ত ব্রহ্মপরিপূর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণময় হইয়া যায়।

আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসানুকৌ।
তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥৭॥

তাহার পদক্রম অভিনব, কর্ম্মাকর্ম্ম তাহার লোপ হইয়া যায়। কর্ম, কর্ত্তা ও ক্রিয়াক্রম তাহার পদরজে ভ্রমশূন্য হইয়া যায়। ভালভাবে দেখিলে বুঝা যায়, এরূপ ব্যক্তির কর্ম্মাকর্ম্মের বন্ধন ছুটিয়া যায়। কর্ম্মের মুখ্য অংশ মায়া, সেই মায়ার ক্ষুদ্রাংশও অবশিষ্ট থাকে না। গাভী প্রার্থনা করিয়া যদি গোপাল কৃষ্ণকে পাওয়া যায় তাহা হইলে মন্দ কি? কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্বের ভ্রম-নিশার অন্ত হইল কিন্তু অকর্ম্ম রহিল, এইভাবে কর্ম্মই নিষ্কর্ম্মরূপে পরিণত হইল। তাহার কীর্ত্তিশ্রবণে শ্রোতার শ্রোতৃ-অভিমান দূর হইয়া যায়, বক্তার বক্তৃত্ব পরুষ বলিয়া মনে হয়, শ্রবণে পরব্রহ্মকে লাভ হয়॥৬॥

ইহার পর উদার কীর্ত্তি শ্রীভগবান্ অবতাররূপে বহু লীলা করেন যাহাতে জড়বুদ্ধি জীবগণ সেই লীলাকথা শ্রবণ করিয়াও উদ্ধার লাভ করে, ত্রিলোক পবিত্র হয়। স্বধামে গমন করিলে শ্রীচক্রধারী সংসার নিস্তারের উপায় শ্রীকৃষ্ণলীলানৌকাকে রাখিয়া গেলেন শ্রীধর স্বয়ং। এই তরণীর অভিনবত্ব এই যে ইহাতে কখনও এমন কি কল্পান্তেও ডুবিয়া যাইবার ভয় নাই। যে লীলা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অগণিত জীব নিস্তার পাইয়াছে, কৃষ্ণলীলা পাঠশীল ব্যক্তিগণ সুকীর্ত্তি লাভ করিয়া পরম পবিত্রতার অধিকারী হন, তাহারা সুরগণবন্দনীয়। আদরপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা পাঠ করিলে চারি প্রকার মুক্তি পদতলে সন্নিহিত হয়, ত্রিলোক পাবন শ্রীহরিনামেই তাহার পরম আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণনামাক্ষর শ্রবণে প্রবেশ মাত্র অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার একেবারে বাহির হইয়া যায় এবং কৃষ্ণকথা রোলে সেই অজ্ঞান আর বাহিরেও কোথাও থাকিবার স্থান পায় না। ভয়ে ভয়ে সপরিবার সেই অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এই রীতিতে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তি-প্রতাপ প্রকাশে সংসার কৃষ্ণময় দর্শন হয়। কীর্ত্তিমান্ ভগবানের কৃপায় অনায়াসে সৎকীর্ত্তি লাভ হয়; যাহা দেখিবার মত তাহা দেখা হইয়া যায়। যাহা আস্বাদন করিবার তাহা আস্বাদন হইয়া যায়। এইরূপে সকল শ্রোতব্য বিষয় শ্রুত ও চিন্তনীয় বিষয় চিন্তিত হইয়া যায়। যাহার সহিত মিলন প্রয়োজন সেই মিলনে কোনো বাধা পড়ে না। কোনো কথার প্রয়োজন

শ্রীরাজোবাচ।

ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাম্।
বিপ্রশাপঃ কথমভূদ্‌বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাম্ ॥৮॥

যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ব্বং বদস্ব মে ॥৯॥

পড়িলে সেখানেই মধুর পরমার্থ সম্বন্ধে কথা চলে। যাহার নাম গ্রহণ করিলে সকল মহাভয় দূর হইয়া যায়, সেই সত্যসংকল্প স্বেচ্ছলীল সর্বেশ্বর পরমেশ্বর নিজধামে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন ॥৭॥

আদর পূর্ব্বক পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেন, হে যোগীন্দ্র শুকদেব, যাদবগণ অতি বিনীত স্বভাব, ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, তাহাদের আবার কি প্রকারে বিপ্রশাপগ্রস্ত হইতে হয়, উহা আমাকে বলুন। যাদবগণ দানে উদার, রাজ্যশাসনে পরম পবিত্র, ব্রাহ্মণসেবায় নিরন্তর তৎপর থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবাহক। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে অবস্থান হেতু যাদবগণ নিত্যই সাধুসঙ্গ লাভ করেন। দেবর্ষি নারদও তাহাদের সমীপেই অবস্থান করেন। এই অবস্থায় তাহাদের অভিশাপ কেমন করিয়া হইল? দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে অভিশপ্ত নারদ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আসিয়া অবস্থান করার ফলে সেই অভিশাপ প্রভাব মুক্ত। অর্থাৎ নারদ সর্ব্বদা দ্বারকায় অবস্থান করেন আর শ্রীকৃষ্ণও সেখানে আছেন, এই অবস্থায় কি করিয়া যাদবগণ অভিশপ্ত হন ॥৮॥

সন্তাপই অভিশাপ প্রদানের মূল কারণ। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ উদয় হইল কেমন করিয়া? কি ভাবে অভিশাপ প্রদান করা হইল ইহা সংক্ষেপে আমাকে বলুন। যাদবগণ শ্রীগোবিন্দের পাল্য এবং তাহারা সখা বন্ধু আত্মীয়, তাহাদের মধ্যে একাত্মতা সগোত্র সম্বন্ধ, ইহার মধ্যে যুদ্ধ ও বিবাদ কি করিয়া ঘটে? পুত্র পিতারই আত্মা, এই বেদবাণী সকলেই শুনিয়াছে। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের আত্মজ যাহারা তাহাদের অভিশাপ কি করিয়া হইতে পারে? বলিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণও এই অভিশাপের বাধ্য, অতএব অভিশাপ সত্য হয় কেমন করিয়া? কুল বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সংকল্প উহাই ব্রাহ্মণগণের অভিশাপের কারণ, তাহাই যাদবগণের বাধক হইয়াছিল। সৃষ্টি,

শ্রীশুক উবাচ।

বিভ্রদ্বপুঃ সকল সুন্দর সন্নিবেশং
কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥১০॥

জগৎপালন ও সংহার শ্রীকৃষ্ণ সংকল্পমাত্র করিয়া থাকেন। তিনিই যদুকুল নাশনও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। শুকদেব বলেন, অবতারের বহু লীলা ॥৯॥

রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব বলেন, এক শ্রীকৃষ্ণই কর্ত্তা ও কারক। তিনি নিজেই অভিশাপের নিমিত্ত নিজ জনগণের মধ্যে অবিবেক উৎপন্ন করাইলেন, কেননা, নিজ নিত্যধাম গমনের নিমিত্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়াছিল। এই জন্য মেঘশ্যামল শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রগতি অবশিষ্ট কর্ম্মগুলি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন। অনন্তর কি করিয়া স্বকুল ধ্বংস করা যায়, সেই কথা তাঁহার মনে জাগিতেছিল। দেবতার অনিষ্টের জন্য অভিশাপই প্রধান কারণ বলিয়া তিনি নির্দ্ধারণ করেন।

যিনি কুলক্ষয় বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মূর্ত্তির কথা শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেন, পরম আনন্দ উল্লাসে। সকল সৌন্দর্য্যের অধিবাস মনোহর নটবেশধারী নিজ অঙ্গে লাবণ্য কলার বিলাসকারী জগদীশ্বর। সকল সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠানরূপে সুন্দর মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এরূপ চমৎকার যে তাহার দর্শনে সাধুর নয়নের সকল চঞ্চলতা দূর হইয়া যায়। জলন্ত দীপশিখা দেখিয়া যেমন একটার পর একটা পতঙ্গ আসিয়া চারিদিক্ হইতে উহা ঘিরিয়া বসে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিয়া সকলের নেত্র পতঙ্গ আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রাত্রিদিন ঘিরিয়া রাখে, দৃষ্টি হইতে উহা আড়াল হইতে দেয় না। নয়নের লোভ চঞ্চলতা সৃষ্টি করে, দৃষ্টির রসনা গজায়—শ্রীকৃষ্ণ শোভা এইরূপ মূর্ত্তিময় স্বাত্মানন্দ। অতএব যে চক্ষু শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছে সে আর অন্যত্র ফিরিয়া দেখে না—প্রতিক্ষণে অধিকতর মধুরতা তাহার উপলব্ধি হয়, সকল সৃষ্ট জগৎ তাহার কৃষ্ণময় হইয়া যায়, দর্শনে নেত্রের এরূপ রুচি হয় যে, কুলকামিনী মোহগ্রস্ত হয়। যে জন্য

গোপীকার সমীপে গোবিন্দ সাতিশয় মধুর অনুভূত হইয়াছিল। কৃষ্ণ অতি সুন্দর মনোরম তাহার কিন্তু কোনোরূপ বিষয়াবেশ আছে তাহা মনে করিও না, কেননা তিনি পূর্ণকাম আত্মারাম। তাহার কোনো কামনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা নাই। তথাপি তাহার দ্বারকা গৃহাশ্রম, স্ত্রী পুত্র রাজ্য সংভ্রম বিষয়কাম কেমন করিয়া কে ভোগ করে, এই শংকা হইতে পারে। তদুত্তরে বলি—শ্রীকৃষ্ণ চারিটি আশ্রমেরই প্রকাশক। ত্রিলোক মধ্যে তাহার মত গৃহস্থ আর নাই, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা এরূপ পরিস্কার সন্ন্যাসী কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ কোনো কর্ম্মফলে দৈবের অধীন হইয়া দেহ ধারণ করেন নাই। তিনি লীলাবিগ্রহী চিদানন্দ প্রবাহস্বরূপ। তাহার প্রতিটি কর্ম্মই পাবন ধর্ম্মময়—শ্রবণ ও বর্ণনায় জীব উদ্ধার হেতু। যে জীব শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিবে তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে, তাহার কর্ম্ম এরূপ উদার। শ্রীকৃষ্ণ দীনের উদ্ধার কর্ত্তা, তাই এরূপ উদার কর্ম্ম আচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে যদি সকাম বলা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়, তিনি এরূপ কর্ম্ম করেন যাহার নাম মাত্র সকল কর্ম্মদোষ কামনা দূর হইয়া যায়, তবে আর তাহার সকামতা কি করিয়া হইবে? শ্রীকৃষ্ণের কাম স্মরণ করিলে স্বয়ং সন্ন্যাসী নিষ্কাম হইয়া যায়, সকাম ব্যক্তির কাম নির্ব্বাপিত হয়; তিনি এরূপ উদার কর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন। তিনি সকল কামনাপূর্ণ এরূপ অগাধ কর্ম্ম করেন যাহাতে মানুষ মনোধর্ম্ম কামনা হইতে নিস্তার পায়, মেঘশ্যামের কীর্ত্তি বিস্তার হয়। সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল নিদান যাহা কোনোমতে শ্রবণ বিবরে প্রবেশ মাত্র সকল কর্ম্মফল বিনষ্ট করিয়া শ্রবণ শুদ্ধ করে। উহাতে হরিকথা শ্রবণের আদর বুদ্ধি জাগ্রত করে। কথা শ্রবণে সদ্ভাবের উদয় হয়। সদ্ভাবে দেবতার আবির্ভাব। তাহাতে অহংভাব দূর হইয়া যায়। এইরূপ উদার শ্রীহরির কীর্ত্তি স্মরণ, শ্রবণ পঠনের কথা আর কি বলিব, অনাদিকাল বহু জীবকে উদ্ধার করিয়াছে আর ভবিষ্যৎকালেও উদ্ধার করিবে। অনির্ব্বচনীয় পুণ্যরাশি সঞ্চিত থাকিলেই হরিকথায় মনোযোগ হয়, অন্যথা কথা আরম্ভ হইতেই অতিনিদ্রা আসিয়া অভিভূত করে। যাহাদের হরিকথায় আদর বুদ্ধি তাহাদের পুণ্য গণনাতীত। শ্রীকৃষ্ণ দীনজনের উদ্ধারের নিমিত্ত খুব সুগম উপায় করিয়া দিয়াছেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন গোষ্ঠী উচ্চস্বরে গর্জ্জন করে পাপাপসরণ নিমিত্ত, আর তাহা শুনিয়া কোটী প্রায়শ্চিত্ত লজ্জিত হইয়া তীর্থবাস করিতে চলিয়া যায়।

কর্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি
গায়জ্জগৎ কলিমলাপহরাণি কৃত্বা।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে
পিণ্ডারকং সমগমন্মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ ॥১১॥

তীর্থেরও প্রয়োজন হয়না, কেননা, নামের সহিতই মোক্ষ সম্পৎলাভ। পূর্ণব্রহ্ম শার্ঙ্গধরের লীলাবিগ্রহ সর্বেশ্বরের যদুবংশে আবির্ভূত পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের নিজের উদার কীর্ত্তি।

ধরাভার অপনোদন হইয়া গেল একথা শ্রীকৃষ্ণ ততক্ষণ মনে করেন নাই যতক্ষণ না যাদবগণের বিলোপ সাধন করিলেন। কারণ, যাদবগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—আমার কৃত্য তখনই শেষ হইবে যখন নিজ বংশ যাদবকুলকে নিশ্চিহ্ন করিব। তাহার পর আমি স্বয়ং নিজ ধামে যাইব। অতএব যাদবগণের মধ্যমণি দেবাধিদেব কালাত্মা মাধব ভবিষ্যৎ সকল বিষয় ভাবিয়া সকলের বিস্ময়জনক কার্য্য করিয়াছিলেন ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণ একদা নারদাদি মুনিগণকে নিজের কাছে ডাকিয়া আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন—আপনারা এখন স্বচ্ছন্দে অন্যত্র গমন করিতে পারেন। যেখান হইতে সাধু সন্ত দূরে চলিয়া যান সেখানে অনর্থপাত হয়, যাদবকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াই সেই ব্যবস্থা করিলেন। যাহার সমীপে সাধু সন্ত অবস্থান করেন সেখানে অনর্থ লেশমাত্রও স্থান পায় না, এই কথা স্বয়ং হৃষীকেশ ভালভাবেই জানেন। যেখানে সাধুগণ অবস্থান করেন সেখানে জন্মমৃত্যু থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিয়াই ব্রহ্মশাপের উপায় করিলেন। সাধু সন্ত দূরে গেলেই মস্তকে অনর্থপাত হইতে পারিবে ইহা জানিয়া শ্রীহরি ঋষিগণকে দ্বারকার বাহিরে পাঠাইলেন। নিজের নিজের আশ্রমে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে হৃষীকেশ সেই ঋষিগণকে তীর্থদর্শনের ব্যপদেশে পিণ্ডারকে যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। পিণ্ডারকে যে সকল ঋষিগণকে শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইলেন তাহাদের স্মরণ করিলেও কলিকাল ভয়ে কম্পিত হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রির্বসিষ্ঠো নারদাদয়ঃ ॥১২॥

তাঁহারা সকলেই তপস্যার তেজে দীপ্তিমান, পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানঘনমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের বন্দনা করেন। তাঁহারা সকলেই ঋষীশ্বর। প্রথমেই বিশ্বামিত্র মুনি, যিনি গায়ত্রীমন্ত্র বলে নতুন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। শীত বা উষ্ণ সমভাবে সহিষ্ণু যিনি আশ্রমে অবস্থান মাত্র সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব দূরীভূত হইয়া থাকে, এই প্রকার গুণ সম্পন্ন অসিত মুনি। যিনি সূর্য্যের শরণাগত হইয়া সূর্য্যাশ্বের কর্ণে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ পাঠ করেন সেই কণ্ব ঋষি। যিনি অতি আহারী বলিয়া প্রসিদ্ধ অথচ যিনি নিরাহারী সেই প্রসিদ্ধ দুর্ব্বাসা ঋষি। যে ভৃগুমুনি পদাঘাত করিলেও নারায়ণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীবৎস চিহ্ন বলিয়াই আদর করিলেন সেই ভৃগুমণি। সৃষ্টির মধ্যে সদ্বুদ্ধিমান অঙ্গিরা ঋষি যাহার উদরে বৃহস্পতির জন্ম তিনি, এবং বৃহস্পতি যিনি দেবতাগণের পরম গুরু তিনি—সকলেই পিণ্ডারক যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। কশ্যপ মুনি, যাহার উদরে দেবতা মানুষ কিন্নর সকলেই জন্মগ্রহণ করেন, যাহার নামে সৃষ্টিকে কাশ্যপী সৃষ্টি বলা হয় সেই কশ্যপমুনিও যাইবার জন্য প্রস্তুত। মুক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠভাবযুক্ত বামদেব, বেদ ব্যাখ্যানে অদ্বিতীয় তিনিও চলিলেন দ্বারকা ছাড়িয়া। অত্রি মুনির এক চমৎকার প্রভাব, তাহারই ঘরে তিন দেবতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন শ্রীদত্তাত্রেয়, যাহাকে যোগেশ্বরগণও বন্দনা করেন, অগাধ মহিমা অনসূয়ামাতার, সেই ঋষীশ্বর স্বয়ং অত্রি কৃষ্ণ আজ্ঞা তৎপর হইয়া অতি শীঘ্র পিণ্ডারক তীর্থে গমন করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানে অতি উদার, প্রতাপে মার্ত্তণ্ড, তপস্যায় ভাস্কর স্বরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সদ্‌গুরু তিনিও শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে অনতিবিলম্বে পিণ্ডারকতীর্থে গমনের জন্য বাহির হইলেন। অগাধ জ্ঞানের আকর, সর্ব্বদা পরম আনন্দ মূর্ত্তি, হরি কীর্ত্তনে যাহার পরম আহ্লাদ, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মবীণা বাদন করিয়া ব্রহ্মপদ গান করেন, ব্রহ্মানন্দে নৃত্যশীল সেই দেবর্ষি নারদও হেলিয়া দুলিয়া পিণ্ডারকে চলিলেন। এই প্রকার শাপানুগ্রহে সমর্থ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষীশ্বরগণ সপরিবার সশিষ্য পিণ্ডারক তীর্থে আসিয়া মিলিত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত অপূর্ব্ব মহিমা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ছলনাময়

ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ ॥১৩॥

তে বেষয়িত্বা স্ত্রীবেষৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতম্ ।
এষা পৃচ্ছতি বো বিপ্রা অন্তর্বত্ন্যসিতেক্ষণা ॥১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ আপন সন্তানবর্গের মধ্যে কপট-কুচেষ্টা রচনা করাইয়া কুলক্ষয়ের ব্যবস্থা করিলেন। ঋষিগণের নিন্দা, অবহেলা, অবজ্ঞা, ছলনা, বিদ্বেষ, বৃদ্ধি পাইয়া কুলক্ষয়ের ব্যবস্থা হইল। আর কুলক্ষয়তো অল্প, ব্রাহ্মণের কোপাগুণে মহাদেবেরও পতন হয়, ইন্দ্রেরও সমুদ্র মজ্জন হয়। এই রোষে সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইল। যাহাদের প্রত্যেকের অপার ক্ষমতা সেই ঋষিগণ পিণ্ডারকে একত্র হইয়াছেন। ধরাতলে বেদ ও ব্রাহ্মণের বাক্য পরম প্রমাণ এই কথা সত্য করিবার জন্যই নিজকুল ধ্বংস করাইয়াছিলেন ॥১২॥

যদুকুলের বালকগণ এক অপরের প্রতি ক্রীড়া কন্দুক ছুড়িয়া খেলা করিতেছিল। নানা প্রকার ক্রীড়া বিহার করিতে তাহারা শ্রীমদে অন্ধ হইয়া ঔদ্ধত্যে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রীড়ায় উন্মাদ প্রায়। অতীত অনাগত বিষয়ে জ্ঞানবান অব্যর্থবাক্য ঋষিগণ যে পিণ্ডারকে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন যদুকুলের প্রমোদমত্ত যুবক বালকগণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহারা ভাবে, আমরা এই সকল মুনিদের অবশ্যই ঠকাইয়া দিতে পারি। যাহা কোনমতে হইবার নয়, তাহা কেমন করিয়া হইবে, অসম্ভব কখনও সম্ভব হইতে পারেনা, যত বড় ঋষিই হউক, এই ভাবিয়া তাহারা এক বালককে কুমারীর কপট বেশে সজ্জিত করিল ॥১৩॥

প্রথমতঃ তাহারা ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত তদুপরি কপট স্ত্রীবেশ সুন্দর সাজ সজ্জা বেশ সুন্দর শ্যামলমূর্ত্তি। স্ত্রীবেশে প্রমদার বৈভব বিলাসের সহিত সলজ্জ নয়নে কজ্জল রেখা, চঞ্চল দৃষ্টি, কটাক্ষ ভঙ্গী সুন্দর সুকুমার তনু হেলিয়া দুলিয়া হংসের গতি। উদরে কাপড় বাঁধিয়া বেশ মোটা করা হইয়াছে যাহাতে মনে হয় সে গর্ভবতী নারী। সখীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া গর্ভ ভারে চলিতে পারিতেছে না এরূপ ভাবে ধীর পদ বিক্ষেপে গমন করিতে

প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ প্রক্রতামোঘদর্শনাঃ।
প্রসোষ্যন্তী পুত্রকাম কিংস্বিৎ সঞ্জনয়িষ্যতি ॥১৫॥

করিতে ঋষিগণের সমীপে আসিয়া উপনীত হইল। স্ত্রীসুলভ মর্য্যাদাশীলতা দেখাইয়া ঋষিগণের একটু দূরে রহিল। অন্যান্য যুবক যাদবগণ তাহাদের কাছে যাইয়া সকলেই মুনিগণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। ছলনা পরায়ণ সেই যদুকুমারগণ ঋষিগণের প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া অতি আদরের সহিত তাহাদের চরণে ধরিয়া বলে,—আপনাদের দর্শন আমাদের ভাগ্য। এই প্রকারে দুর্ব্বিনীত সেই যদুকুলের কুমারগণ বিনীতের অভিনয় করিয়া কর জোড়ে মুনিগণকে নিবেদন করে,—স্বামিন্ এই নবতরুণী গর্ভবতী আসন্ন প্রসবা, ইহার গর্ভে কি সন্তান হইবে ইহা সে জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতেছে, আপনারাতো অব্যর্থবাক্য, অনুগ্রহ করিয়া বলুন কি সন্তান হইবে ॥১৪॥

নিজে কাছে যাইয়া প্রশ্ন করিতে লজ্জানুভব করে বলিয়া আমাদের প্রতি বিনীত ভাবে প্রশ্নের ভার দিয়াছে। আপনারা সত্যদ্রষ্টা, আপনাদের কথা অমোঘবীর্য্য, হরি ও হর পর্য্যন্ত আপনাদিগকে নমিত মস্তকে বন্দনা করেন, আপনারা জ্ঞানে উদার। এই গর্ভবতী আদর পূর্ব্বক আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে পুত্র কামনা করে নিশ্চিতই সে পুত্র প্রসব করিবে তো? দুই কর জোড় করিয়া কপট প্রশ্নকারী বালকগণ অবস্থান করে। যাহার যেমন ভাব সেই রূপই ফল ফলিবে তো? তাহাদের এই কুমর্ম্ম জানিয়া দেবর্ষি নারদ ঋষিগণের সমীপে নৃত্য করেন আর বলেন, হায়, যাদবগণের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। পিপীলিকার পক্ষ গজাইয়াছে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্যই। ব্রাহ্মণকে ছলনার ফল হইবে বংশনাশ। ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বিনীতভাবে প্রতিনিবৃত্ত করাইবে, মারিতে আসিলে নিজের মস্তক পাতিয়া দিবে। সেই ব্রাহ্মণের ছলনা বিষভক্ষণের মতই—বিষ খাইলে তো প্রাণ যায়, আর এই ব্রাহ্মণগণের ছলনায় বংশনাশ হইবে। ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ বা মূর্খ যেমনই হউন না কেন ধরাতলে ব্রহ্মের অবতার, তাহাকে ছলনা করিলে নিশ্চিত বংশ নাশ হইবে ॥১৫॥

এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনম্ ॥১৬॥

তচ্ছ্রুত্বা তেঽতিসন্ত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরম্।
সাম্বস্য দদৃশুস্তস্মিন্ মুষলং খল্বয়স্ময়ম্ ॥১৭॥

কিং কৃতং মন্দভাগৈর্যনঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মূষলং যযুঃ ॥১৮॥

হে নৃপবর পরীক্ষিৎ, যাদববংশীয় বালকগণের শরীরে মৃত্যুর প্রবাহ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই তাহারা ব্রাহ্মণগণকে ছলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ছলনা বুঝিয়া মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি বাগ্‌বজ্র অভিশাপ দিলেন। অরে দুর্ব্বোধ, যে সন্তান প্রসব করিবে উহা তোমাদের সমগ্র বংশের কালস্বরূপ হইবে, উহা একটি লোহার মুষল; দুর্ভাগা তোমরা দেখিতে পাইবে সেই মুষল ॥১৬॥

যাদব বালক সেই অভিশাপ শুনিয়া ভয়ভীত হইয়া বস্ত্রবন্ধন খুলিয়া দেখিল সত্যইতো সাম্বের উদরে একটি লৌহমুষল। তখন তাহারা উহা দেখিয়া সকলেই ভয়ে জড়সড় বিহ্বল হইয়া বিস্মিত হইল। যাদবকুল ধ্বংস করিবেন এই প্রবল সংকল্প শ্রীকৃষ্ণের, তাই ঋষিবাক্যে তৎক্ষণে সেই মুষল সৃষ্টি। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রীকৃষ্ণ কখনও অন্যথা হইতে দেন না—ব্রাহ্মণের মুখে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ উহাকে সত্য করিয়া দেন। ঋষীশ্বরগণের কোপ এবং কুলক্ষয়ের-নিমিত্ত অভিশাপ দেখিয়া শুনিয়া যদুকুমারগণ সন্তপ্ত ও ভয়ে কম্পিত হইয়া রহিল ॥১৭॥

আমরা মন্দভাগ্য, বিনা কারণে ঋষিগণের ক্রোধ উৎপন্ন করিয়া নিজেদেরই মৃত্যুর কারণ হইলাম, ইহাতে কুলক্ষয় দোষ আমাদেরই হইল। নগরের লোক আমাদের দেখিয়া কি বলিবে? বলিবে, ঐ যে ব্রাহ্মণগণকে ছলনা করিয়া এখন দুর্দশা দেখ। এই সব কথা বলিয়া ম্লানমুখে সেই বালকগণ মুষল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ॥১৮॥

তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লান মুখশ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ ॥১৯॥

শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ।
বিস্মিতা ভয়সন্ত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ ॥২০॥

তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ।
সমুদ্র সলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতম্ ॥২১॥

কশ্চিন্মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ ॥২২॥

সভায় উগ্রসেন বসুদেব বলরাম অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদব বান্ধববর্গের সহিত বসিয়াছিলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণ সেখানে ছিলেন না। সাম্ব প্রভৃতি যদুকুল প্রসূত বালকগণ সেখানে আসিয়া সম্মুখে সেই লৌহ মুষল রাখিয়া অকপটে আদ্যোপান্ত ব্রাহ্মণগণের অভিশাপের কথা বলিল। তাহাদের মুখ তখন অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে ॥১৯॥

ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের কথা শুনিয়া যাদবগণের ভয় ও কম্প হইতে লাগিল। ব্রহ্মশাপ তো মিথ্যা হইবার নয় ভাবিয়া সকলেই সন্তাপগ্রস্থ হইলেন। প্রত্যক্ষ মুষলটি সম্মুখে দেখিয়া তাহাদের চাঞ্চল্য হইল, নগরের নরনারী সকলেই গণ্ডগোল শুরু করিয়া দিল, সকলেরই ভয় হইল। দেখ রাজা পরীক্ষিৎ, ভবিষ্যতের কথা জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কিছু বলিলেন না, নিজের মনের মত বিচার তিনি করিলেন না ॥২০॥

যাদবরাজ উগ্রসেন সেই লৌহমুষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। সেই মুষলের মধ্যখণ্ড অতিশয় কঠিন, তাই উহা চূর্ণ হয় নাই। ঐ লৌহ খণ্ডও সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল ॥২১॥

সমুদ্রের তরঙ্গপ্রবাহ সেই সমুদ্র নিক্ষিপ্ত লৌহচূর্ণ প্রভাসতীর্থের তীরে তীরে আসিয়া লাগিল আর সেই স্থানে এরকা বৃক্ষ হইল। স্থূল লৌহখণ্ড এক মৎস্য গিলিয়া রাখিয়াছিল—এক মৎস্যজীবি সেই লৌহগর্ভ মৎস্যটিকে

মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকোঽকরোৎ ॥২৩॥

ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরোঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত ॥২৪॥

সমুদ্র জল হইতে জালের মধ্যে ধরিয়া তাহার উদর কাটিয়া সেই লৌহখণ্ড আবিষ্কার করিল। সে ভাবিল মৎস্যের উদরের এই লৌহখণ্ড পাইয়াছি, আমার বড় ভাগ্য। সে হর্ষভরে উহাতে অব্যর্থ বাণ তৈরী হইবে আর অসাধ্য শিকার করা যাইবে, বলিয়া বাণ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল ॥২২-২৩॥

এই মুষল বৃত্তান্ত কেহই শ্রীকৃষ্ণকে জানাইল না। তিনি কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানিতেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপ অন্যথা করিবার কথা তিনি কখনও চিন্তা করেন না। কেহ বলিল, আর বলিলেই বা কি হইবে, ব্রাহ্মণের অভিশাপ কি অন্যথা হয়? কলিকালের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মৃত গুরুপুত্রকেও মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। কলিকালের দাঁত ভাঙ্গিয়া দেবকীদেবীর ষড়্গর্ভের সন্তানকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-তো ঈশ্বরেরও পরম ঈশ্বর, সকল বিষয়েই তাঁহার নির্ব্বাধ সামর্থ্য আছে। ক্ষণেকের নিমিত্ত কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া সমগ্র মথুরার নরনারীকে দ্বারকায় আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিজ কুলের প্রতি কিছুমাত্র মমতা প্রকাশ করিলেন না। নিজ কুল যখন ধ্বংসের মুখে তখনও তিনি ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা হইতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ যখন পদাঘাত করিলেন তিনি ঐ পদাঙ্ক হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীবৎসলাঞ্ছন সকল ভূষণের ভূষণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে ধারণ করেন, এইজন্যই তিনি পূর্ণ ব্রহ্মণ্যদেব। ব্রাহ্মণকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবাক্য অন্যথা করেন না বলিয়াই তিনি ব্রহ্মণ্যদেব —বেদ ও বন্দীজন এরূপ বর্ণনা করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ব্রাহ্মণমূর্ত্তিতে অবস্থান করেন, এইজন্যই তিনি ব্রাহ্মণের জামীনদার, কুলক্ষয়ের ক্ষতিতেও শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের কার্য্যে ক্ষুব্ধ হন না। ব্রাহ্মণের শাপকে তিনি মোহগ্রস্তের

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে বিপ্রশাপো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

বাক্য বলিয়াও ধরিলেন না কেন না উহাতে কুলক্ষয়াত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের সংকল্পই সিদ্ধ করিল এবং উহা তাঁহার সন্তোষের নিমিত্ত হইল। ইহাতে কালমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হইলেন। কুলক্ষয়ে সংসারের কোনো দুঃখ লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিল না—পূর্ণ সন্তোষমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ।

জ্ঞান কথার একটি অধ্যায় অতি রসাল আনন্দে পূর্ণ হইল, শ্রোতৃগণ কৃপা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। নারদ ও বসুদেবের সুন্দর সংবাদ রাজর্ষি জনক ও ঋষভদেবের পুত্র নব যোগেন্দ্রের প্রশ্নোত্তর, যাহাতে জীব স্বাত্মানন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, উহা রসাল ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, শুদ্ধ নিজ পরমার্থ বলিয়া চাখিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে জনার্দ্দনের একনাথ নিবেদন করিতেছি, শ্রোতৃবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক অর্থাবধারণ করুন ॥২৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে পারমহংস্য সংহিতায়াং একাকার টীকায়াং বিপ্রশাপো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু ।১।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

গোবিন্দ ভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ ॥১॥

শ্রীগণেশকে নমস্কার। শ্রীগোপাল কৃষ্ণকে নমস্কার জয়, জয় দেবাধিদেব। গুরুরূপে তুমি ভোগাকাঙ্ক্ষাকে রুচিপ্রদ কর। বিশ্বে বিশ্বপ্রাণকে ব্যাপকরূপে অনুভব করাও। বিশ্বভরা বিশ্ববাসী ভগবান্‌কে বিশ্বাস করাইয়া তুমি প্রসন্নতা লাভ কর। তুমি প্রসন্ন হইলে তোমার চরণে স্থান হয়। তোমার পাদপদ্মের কৃপা দৃষ্টিতে অহং সোহং ভাবের গ্রন্থি ছুটিয়া যায়। তোমার উদর মধ্যেই প্রবেশ লাভ হয়। তখন তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, এরূপ ভাবনার উদয় হয়। ইহা হইতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? গুরুই মাতা ও পিতার স্বরূপ, জনার্দ্দন স্বামীর মধ্যে এইরূপ দেখিয়া একনাথ আমি তাহাদের শিশু সন্তান হইলাম। মাতা পিতার মিলিত স্নেহে বালক আমি ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠিব এবং প্রতিদিন আত্মজ্ঞানের নব নব অনুভব দান করিলে সেই অনুভব লাভ করিব।

শিব শক্তি গণেশ বিশ্বদেব বিষ্ণু সূর্য্য এইরূপ বহু অলঙ্কার তিনি ধারণ করেন। তার পরে আবার আমার মত নিজের শিশু সন্তান তিনি নিজের লীলাবশেই অঙ্গীকার করিয়াছেন। আরও সর্ব্বদা কৃপা-দৃষ্টিতে রক্ষা করিতেছেন। সন্তানের অঙ্গে অলঙ্কার দান করিয়া তাহাকে শোভান্বিত ও সুখী দেখিয়া মাতার যে সুখ হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না সেই সুখ জনার্দ্দন স্বামী ভোগ করেন। তিনি নিজের চিন্ময় রত্নহার আমার কণ্ঠে ধারণ করাইয়া উহার রক্ষার ভার স্বীকার করিয়া আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে সর্ব্বদা আমার সহিত যেমন দুরন্ত সন্তানের সঙ্গে মাতার মত ধাবিত হইতেছেন। সমর্থ পিতার পুত্রকে সকলেই মানিয়া চলে। সেই রীতিতে একনাথের কোনো গুণ না থাকিলেও জনার্দ্দনের সন্তান বলিয়া সে সম্মান পায়। বালক নিজে কথা বলিতে পারে না, মাতা তাহাকে কথা শিখায়, সেই প্রকার গ্রন্থকথা প্রকাশে স্বয়ং জনার্দ্দন বলিতেছেন। তাহাতেই

দেখুন মূর্খের হাতেও ভাগবত কি নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে—দেবভাষার একাদশ স্কন্ধকে দেশভাষা মারাঠীতে প্রাকৃত ভাষায় বলাইতেছেন।

প্রথম অধ্যায় শুনিয়া পরীক্ষিৎ চুপ করিয়া বসিলেন। ইহার পর কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার অভিপ্রায় দেখা গেল না। কারণ, নিজে প্রশ্ন করিলে তারপর শুকদেব যদুবংশ ধ্বংসের শেষ কথা বলিয়াছিলেন। রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া শুকদেব বলিলেন—পরীক্ষিৎ এখন আমি মোক্ষ সম্বন্ধে কথা বলিব মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন; এই একাদশ স্কন্ধ অলৌকিক কথায় পূর্ণ। একটির পর একটি শ্লোকে অধিকারিক মুক্তি সুখের গভীর সংবাদ। ইহা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ তাহার সর্ব্ব অঙ্গকে কর্ণরূপে পরিণত করিলেন। শ্রীশুকদেব তাহার এইরূপ শ্রবণের নিমিত্ত একান্ত অবধান-মূর্ত্তিরূপে অবস্থিতি দর্শন করিয়া বড়ই সুখী হইলেন এবং একান্ত গুহ্যজ্ঞান এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারদ বসুদেব সংবাদের মাধ্যমে নিমি জয়ন্তের কথায় মুখ্য ভাগবত ধর্ম্মের লক্ষণ উপদেশ করেন।

যিনি মুক্তগণের অগ্রণী, যিনি ব্রহ্মচারিগণের শিরোমণি যোগীগণের বন্দনীয় মুকুটমণি ভক্তমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মরসের সমুদ্র আত্মজ্ঞানের পূর্ণচন্দ্র, শ্রীশুকমুনি রাজা পরীক্ষিৎকে বলেন,—যিনি ব্যাসের সাক্ষাৎ গুরুদেব, আমার পরমগুরু, মহামুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ, শ্রীকৃষ্ণভজনে যাহার পরম আদব, তাহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পিণ্ডারক তীর্থে পাঠাইয়াছিলেন। সেখান হইতে নারদ বার বার দ্বারকায় আগমন করেন। যেহেতু দ্বারকায় কালকৃত ভয় ছিলনা। যেখানে সকলের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ সামর্থ্যে সুখে অবস্থান করেন। নারদের প্রতি দক্ষের শাপপ্রভাবে তিনি কোনো স্থানে এক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেন না—শ্রীহরিকীর্ত্তনে সেই শাপের প্রভাব থাকিতে পারে না বলিয়া দেবর্ষি নিষ্ঠার সহিত দ্বারকায় আসিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে অবস্থান করেন। এখানে আর শাপের প্রভাব পড়ে না, এজন্য নিত্যই বাস করেন দ্বারকায়। নারদের পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান তাহার আবার কৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যান কি করিয়া সম্ভব ইহা শংকা করিওনা, কেননা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহচৈতন্যঘন এইজন্য নারদ শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রিয়। মুক্তগণেরও উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই যে তিনি চৈতন্যঘনমূর্ত্তি। দুর্ভাগা লোক তাহা না বুঝিয়া ভজনবিমুখ হয়—শ্রীশুকমুনি সেই সিদ্ধান্ত করেন ॥১॥

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥২॥

তমেকদা তু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতম্।
অর্চ্চিতং সুখমাসীনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ ॥৩॥

বৎস পরীক্ষিৎ যাহারা সর্ব্বোত্তম নরদেহ লাভ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে না, তাহারা মায়াক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুঃখ ভোগ করে। যাঁহার পাদতীর্থ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সদাশিব মহাশ্মশানে বসিয়া আত্মযোগে মগ্নচিত্ত, অপরের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ব্রহ্মাও যাহার উদরে জন্মগ্রহণ করেন, নরদেহ লাভ করিয়া সেই নারায়ণকে যে ভজন না করে, সে তো মৃত্যুর গ্রাসেই আছে। পূর্ণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাহারা নানা প্রকার সাধনের জন্য যত্নবান হয়, তাহাদের বন্ধন কোনো দিনই ছুটিবার নয়। কৃষ্ণচরণ ছাড়িয়া যাহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বার বার মৃত্যুগ্রাসে পড়ে—কে তাহাদের মৃত্যু বারণ করিবে? ইন্দ্রিয়গণ সমর্থ থাকিতে যে শ্রীকৃষ্ণ ভজিল না, তাহাকে মৃত্যুই ধরিয়া রাখে এবং ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু তাহাকে নির্দ্দলন করে। তাহাতেই নারদ মহামুনীশ্বর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ভজন তৎপর হইয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত নিরন্তর দ্বারকায় বাস করেন ॥২॥

ধন্য ধন্য নারদ যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হরিনাম ছন্দে শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের রুচি ও যাহার শ্রীকৃষ্ণ রুচি যাহার সঙ্গলাভ করিয়া জড় জীব তত্ত্বতঃ মুক্তি লাভ করে, সেই নারদ এক দিবস আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বসুদেবের গৃহে গমন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া বসুদেব অত্যন্ত সুখী হইলেন। নমস্কার পূর্ব্বক দেবর্ষিকে উচ্চাসনে বসাইলেন। বসুদেব তাহাকে ব্রহ্মসদ্ভাবে পূজা করিলেন? সাক্ষাৎ নারায়ণ এই বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া স্বর্ণ পাত্রে তাহার চরণ ধুইয়া বিধিপূর্ব্বক মধুপর্ক প্রদান করিলেন। অতি সাবধানতার সহিত পূজা করিয়া নিজের সুখাসনে বসাইয়া অত্যন্ত সুখ অনুভব করিলেন ॥৩॥

শ্রীবসুদেব উবাচ।

ভগবন্ ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাম্।
কৃপণানাং যথা পিত্রোরুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাম্ ॥৪॥

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥৫॥

বসুদেব বলেন—আপনি নিজে কৃপা করিয়া আমার গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন ইহা আমার বড় সৌভাগ্য। হে স্বামিন্, আপনার সান্নিধ্যমাত্র আমি কৃতজ্ঞ হইয়াছি। মাতৃহারা দীন সন্তানের ঘরে যদি মাতা আগমন করেন তাহাতে সেই সন্তানের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহা হইতেও নিত্য সকল জীবের সুখদায়ক আপনার আগমন। আপনি স্ব-লীলায় স্বেচ্ছায় দীনোদ্ধার নিমিত্ত ভ্রমণ করিয়া থাক। মাতার আগমনে তাহার সন্তানেরই আনন্দ হয় আর আপনার দৃষ্টির কোলে নিত্য নব সুখ, উহাতে দীনজন মাত্রের আত্মানন্দ লাভ হয়। মাতা তো জাগতিক সুখদান করেন আপনার আগমনে অবিনশ্বর সুখ, নিত্য চিৎসুখ চিন্মাত্র পরাৎপর বস্তু লাভ। আপনি ভাগবত-ধর্ম্ম পথচারী সেই সঙ্গলাভ আমার নিস্কামভাবে প্রয়াগতীর্থের কোটি পুণ্যের ফল। হে দেবর্ষি, আপনি ভগবানের স্বরূপ, আপনাকে দর্শন করিয়া আমি নিষ্পাপ হইলাম। আপনার অতি স্বল্পকৃপায় জীবের অন্তরে চিৎস্বরূপ ভগবানের অনুভব হয়। আপনার ভক্তির তুলনা নাই, ভক্তি নিষ্ঠা আপনি বৃদ্ধি করেন। ভক্তি ও ভগবৎস্বরূপ, আপনি আত্মনিষ্ঠায় চিৎস্বরূপ। ভক্তি প্রকাশে আপনি দেউটি মশাল। ভক্তিপথের পথপ্রদর্শক। আপনার উপকার পরিমাণহীন, আপনার সমীপে ভক্তির ভাণ্ডার। মুখ্য ভাগবত শাস্ত্র আপনি ব্যাসদেবকে দশলক্ষণ সমন্বিত করিয়া দীনজনগণের উদ্ধারের নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন। নারদ, আপনি দেবতার সমান আপনার সঙ্গে অপর কোনো দেহধারীর তুলনা দেওয়া বৃথা। বসুদেব বলেন—॥৪॥

দেবতার চরিত্র জীবমাত্রের সুখ বা দুঃখের নিমিত্ত হয়। কখনও অতিবৃষ্টি কখনও অনাবৃষ্টি। অতএব দেবতা হইতে সাধু অধিক উপকারক। মনে বিচার করিয়া দেখুন, সুখ ও দুঃখ দাতা দেবতা, সাধু কিন্তু নির্দোষ

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥৬॥

কেবল-সুখ দাতা। সেই সাধুগণের মধ্যে আবার আপনার ন্যায় এরূপ অজস্র-কৃপালু বান্ধব পাইলে আর বিচার কি? পরমার্থ সুখের হাটের কোকিল আপনার মহিমা আর কি বলিব? বৃহৎ সুখের সন্ধান, যে সুখের কল্পান্তে বিচ্যুতি ঘটিবেনা, সেই আত্মসুখস্থিতি নিশ্চিতই আপনার নিকট পাওয়া যাইবে। দেবতার মহিমা আপনার সহিত তুলনা করা অশোভন, কেননা, আমার কথা শুনুন, দেবতার অবতার হইলে তাহার দাসগণের সুখ হয় সত্য কিন্তু দৈত্য দানবের ভয় হয়। তাহাদের ভেদ ভাব আছে কিন্তু দেবর্ষি সাধু আপনার সেই ভেদভাব নাই, পক্ষপাত নাই। আপনাকে দেবতাও বিশ্বাস করেন, দানবগণও আপনার ভরসা রাখে। রাবণও একান্তে বসিয়া নিজের হৃদয়ের কথা আপনাকে জানাইয়া সান্ত্বনা প্রার্থনা করে। রাবণ দেবতাকে বন্দী করিয়া হিংসা করে কিন্তু আপনার চরণ বন্দনা করে। সত্য সত্য আপনি রামেরই মিত্র তথাপি বিষম ভাব দেখা যায় না। জরাসন্ধ কৃষ্ণের শত্রু কিন্তু তাহার গৃহেও আপনার গতাগতির বাধা নাই। আবার কৃষ্ণ সভায় আপনি কৃষ্ণের পরম বিশ্বস্ত। হিরণ্য কশিপু দেবতার নাম গ্রহণ করে না কিন্তু সে আপনার স্তব রচনা করে। আপনার ভেদভাব নাই ইহা তাহারই প্রমাণ। দেবতা পূজা পাইয়া সন্তুষ্ট হন, সাধু কোন পূজার অপেক্ষা রাখেন না। তাহারা নিরপেক্ষভাবে সত্যই সমর্থন করেন ॥৫॥

দেবতার যজ্ঞ যে যে ভাবে করে সে সেইরূপ ফললাভ করে। যে ভজন করে না, তাহার উপর নানা বিঘ্নপাত হয় দেবতার এই স্বভাব। মানুষ যেমন যেমন বসে ছায়া অনুরূপ অভিনয় করে—বড় পূজা দিলে দেবতার সন্তোষ, বড় না দিলে বিঘ্ন উপস্থিত। সূর্য্য যেমন যেমন প্রকাশিত হন, ছায়াও তেমনিই দেখা যায়। নিজ কর্মানুসারে দেবতাকেও অনুরূপ প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন দেখা যায়। সূর্য্য অস্ত গেলে ছায়া নামিয়া যায়—ভজন না করিলে দেবতাও সেইরূপ ক্ষুব্ধ হন। এই প্রকারে দেবতার ভাব বুঝিয়া লইতে হয়। অন্য দেবতার কথা আর কি বলিব, বড় বড় দেবতাও এইরূপ। ভজন

ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়ামর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥৭॥

করিলে তো গর্ভবাস বন্ধ হইয়া গেল, আর ভজন না করিলে জন্ম জন্মান্তর ঘুরিতে হইবে। জীবভাবে তাহাদের ভজন করিলে তাঁহারা আত্মদান করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন সত্য কিন্তু যে ভজন না করে তাহাদের ঘরে কখনও পথ ভুলিয়াও পদার্পণ করেন না। আপনি কিন্তু তেমন নন, কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ আপনি দীনদয়াল, কেবল কৃপার সাগর আপনার কথা আর কি বলিব? আপনি ব্যাসকে জ্ঞানবান দেখিয়া গুহ্যজ্ঞান উপদেশ করিলেন, আবার ধ্রুব বালক অজ্ঞান, তাহা বলিয়া তাহাকে তো উপেক্ষা করিলেন না। দৈত্যপুত্র বলিয়া প্রহ্লাদকে কৃপা বঞ্চিত তো করেন নাই, তাহাকেও উপদেশ দিয়াছেন। আপনার কৃপা লহরী দীনজনের বিশ্রান্তি স্থান। বাটপার লুণ্ঠক রত্নাকর ভজন বিনাই মহাকবি বাল্মীকি অমরবৃন্দের বন্দনীয় হইলেন আপনার অনুগ্রহে। যাহার গ্রন্থ দর্শনে সদাশিবেরও পরম সন্তোষ আপনি এরূপ কৃপালু এবং অনাথের পরম আশ্রয়। মহাপরাধ হইলে আপনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যাহাতে পাপীর পাপ দূর হইয়া যায়। হে দয়ালু, সাযুজ্য মুক্তির প্রদীপ জ্বালাইয়া মহাপাপীকেও সদ্রূপ দর্শন করাইয়া থাকেন (দৃষ্টান্ত—নলকুবর মণিগ্রীব উদ্ধার)। সোজাসুজি বলিতে হয়—আপনি অচ্যুতাত্মা। দেবতা আপনার আজ্ঞাবহ। যাহাকে উদ্ধারের আজ্ঞা করেন, দেবতা তাহাকে উদ্ধার করেন। হাতে ধরিতে হয় না, আপনি এরূপ দীনহীনের দীক্ষাগুরু। ব্রহ্মজ্ঞানে আপনি অত্যন্ত উদার, অতএব বিচার পূর্বক নিজের সিদ্ধান্ত উপদেশ করুন ॥৬॥

আদর পূর্বক পুনরায় বলেন,—দেবর্ষি. আজ আমার সকল পুণ্যফল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। আত্মসুখদাতা পিতামাতার ন্যায় আপনি আজ আমার গৃহে আগমন করিলেন। শিষ্যের প্রতি আপনার যেরূপ কৃপা সেই কৃপা প্রদর্শন করিয়া আমাকে ভবপাশ মুক্ত করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন, আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। আপনার দর্শনে আমি কৃতকৃত্য হইলাম, যেহেতু আপনার সমীপে ভাগবত ধর্ম্ম কথা শুনিতে পাইব, উহার রহস্য কৃপা পূর্ব্বক বলিবেন। যাহাতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং কর্ম্মাকর্ম্ম

অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥৮॥

যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত ॥ ৯ ॥

জন্মমৃত্যু বন্ধন ছুটিয়া যায়, এই ভাবে ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ করুন। মায়ার নিমিত্ত আমার নিদারুণ ভব ভয়, উহা যেন সমূলে নির্দ্দলন হয়, এইরূপ ধর্ম্ম বলিবেন। আমার পূর্ণ অধিকার নাই, ইহা বিচার করিয়াই যোগ্যতানুসারে উপদেশ করিবেন—॥৭॥

আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি আমার পূর্ণ অধিকার নাই। যদিও আমি পূর্ব্বে ভগবদ্‌ভজন করিয়াছিলাম তথাপি দেবাধিদেবের আরাধনা করিয়াও আমি মায়াদ্বারা প্রলুব্ধ হওয়ার ফলে ভজন বিষয়ে মমত্ব না হইয়া পুত্রস্নেহ বিষয়ে আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আমার প্রতি দেবতা প্রসন্ন হইয়া যখন বর চাহিতে বলিলেন তখন মায়া আমাকে মুগ্ধ করিল। আমি চাহিলাম,—"আমার পুত্র হও"। তাহাতে আমার পুত্র কৃষ্ণ, সে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিল না। সে আমার পদ বন্দনা করিয়া বলে, আমি তোমার পুত্র। এ জন্য কৃষ্ণের সমীপে আমার জ্ঞানপ্রাপ্তি তো হইল না। কৃষ্ণ পরমাত্মা হৃষীকেশ, এই কথা আমি জানি। কিন্তু কৃষ্ণ আমারই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া আমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে। আপনি ও আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, তাহা আমি বুঝি; তবে আপনি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। যে মায়াদ্বারা আমি সংসার বন্ধনে পড়িয়াছি সে মায়া সমূলে যাহাতে বিনষ্ট হয়, এরূপ উপদেশ করুন—কথার বাহুল্যে কি প্রয়োজন? ॥৮॥

দুস্তর মায়াজলে পূর্ণ ভবসাগর, তাহা হইতে পারে যাইবার জন্য, হে মুনিপ্রবর, আপনি তরণী সদৃশ। এই মায়া সাগরের জল লবণাক্ত, ইহা নিজ শক্তিতে চরাচর সকলকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ অতি দুর্ঘট মোহ সৃষ্টি করিয়া অবিবেক তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে ধৈর্য্যের দৃঢ়তা কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। অহংকারের ঝঞ্ঝা শব্দ করিয়া

শ্রীশুক উবাচ।

রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।
প্রীতস্তমাহ দেবর্ষির্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ ॥১০॥

প্রবাহিত—'আমি আমার' ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে; বাসনার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করিতেছে, ইহাতে সুর নর কেহই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। ক্রোধে পূর্ণ, দ্বেষে আনন্দিত, অসূয়া তিরস্কারের বিরক্তি জনক বিরামহীন আঘাত, কাম পাহাড়ের শৃঙ্গ, আশা ও ইচ্ছার মোটা ঝাড়, বিষয় ভোগের অঙ্কুর উদ্‌গম, সংকল্প ও বিকল্পের মীন, নিন্দার কুমীর, ব্রহ্মদ্বেষ হাঙ্গর এই প্রচণ্ড সংসার সমুদ্রে বিচরণ করিতেছে। এই ভীষণ সংসার সমুদ্র শোষণ করিতে সমর্থ আপনি অগস্ত্যস্বরূপ। আপনার সহায়তায় এই ভবাব্ধি পার হইতে সমর্থ হইব, ইহাই আমার ভরসা। মায়ার তরঙ্গের ভয় বিশ্বের সকলের। হে নারদ, আপনার কৃপায় কিন্তু উহা আমার বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আমি অনায়াসে মৃত্যুসাগরপার হইব। ভবসাগর পায়ে হাঁটিয়া পার হইব এইরূপ ভাগবতধর্ম্ম বিচার সিদ্ধান্ত আমাকে উপদেশ করুন। বসুদেবের এই প্রকার বাক্যে দেবর্ষি নারদের অন্তরে সুখের উদয় হইল, সেই অভিপ্রায় শ্রীশুক নিজ মুখে বলেন—॥৯॥

বসুদেবের প্রশ্ন বলিতে বলিতে শুকদেব আনন্দে পূর্ণ হইলেন। চৈতন্য মেঘ নারদ চিদানন্দ রস ধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশুক বলেন,—হে রাজন্, বসুদেবের প্রশ্নের ভাবের সঙ্গে দেবর্ষি নারদের ভাবের মিলন ঘটিবার ফলে, তিনি বলেন,—বসুদেব, আপনার প্রশ্নে আমি ধন্য হইলাম। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে চিৎসুখ স্বরূপ নারায়ণ প্রকটিত হইবেন। কথা বলিতে বলিতে নারদ আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। অঙ্গে রোমাঞ্চ, নয়নে সবেগ অশ্রুধারা, আনন্দ রঙ্গে দুলিতে লাগিলেন নারদ, কারণ মনের মত শ্রোতা পাইলে যে বক্তার সুখ পূর্ণতা লাভ না করে সে কখনও কথাসারামৃতের আস্বাদন করে নাই। বসুদেবের প্রশ্নে নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন ॥১০॥

শ্রীনারদ উবাচ।

সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎপৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাং স্ত্বং বিশ্বভাবনান্ ॥১১॥

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥১২॥

হে সাত্বত শ্রেষ্ঠ বসুদেব, আপনি ভাগবত ধর্ম্মের ভাবার্থ জানিতে যে পরমার্থ নিষ্ঠা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন সে জন্য ধন্যবাদ প্রদান করি। আপনি শ্রীকৃষ্ণের জনক, তাই নিজের এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যাহাতে উহার বিচার দ্বারা বিশ্বের সকলের উদ্ধার হইয়া যাইবে। আপনার প্রশ্নোত্তরে সাধক তো নিস্তার লাভ করিবেই, মহাপাপীও ইহা দ্বারা পবিত্র হইয়া যাইবে ॥১১॥

ভাগবত ধর্ম্মের গুণে, যে ইহা শ্রবণ করে, যে পাঠ করে, যে ধ্যান করে সকলেই উদ্ধার হয়, নিস্তার পায়, সংসার বন্ধন মুক্ত হয়। শ্রোতা ও বক্তাকে দেখিয়া কেহ যদি নিজের হৃদয়ে সুখানুভব করে, সদ্ভাবে যদি তাহাদিগকে শুধু ভাল বলে, সে-ও ভাগবত ধর্ম্ম প্রভাবে মুক্ত হয়। ভাগবত ধর্ম্মের আশ্চর্য্য প্রভাব ইহার ফলে দুরাত্মা দেবদ্রোহী অথবা দুষ্টাত্মা বিশ্বদ্রোহী হইলেও নিস্তার পায়। হৃদয়ে ভাগবত ধর্ম্ম থাকিলে অকর্ম্মও সৎকর্ম্ম হইয়া যায়, অধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া ধর্ম্মরূপে পরিণত করে, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমপদ লাভ হয়। ভাগবত ধর্ম্মে প্রবেশ করিলে কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম নিন্দা দ্বেষ ক্রোধ অধর্ম্ম অবিদ্যা প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত আর তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে না। ভাগবত ধর্ম্মে আপনার অতিশয় আদর বুদ্ধি, সেইজন্য শ্রদ্ধার সহিত আপনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। আপনি মহাভাগ্যবান, পরম উদার, পরম পবিত্র। আপনি পবিত্রতার রহস্য জানেন, তাই আপনার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। যাঁহার নাম আমরা জানি পরম পাবন এবং জগদ্বন্দ্য সেই স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আপনার গৃহে নিত্য অবস্থান করেন, এরূপ ভাগ্যবান আপনি। এরূপ ভাগ্য তো আর কাহারও দেখি না। আপনার

ত্বয়া পরমকল্যাণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম ॥১৩॥

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
আর্ষভাণাঞ্চ সংবাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ ॥১৪॥

নাম বসুদেব, সেই নাম অনুসারে অনন্ত স্বয়ং বাসুদেব নাম ধরিয়াছেন। যে বাসুদেব নাম স্মরণে অনন্ত প্রাণী পবিত্রতা লাভ করে ॥১২॥

যাঁহার শ্রবণে পুণ্য বৃদ্ধি হয়, যাঁহার নামে ভব বন্ধন খণ্ডন হয়, সেই কল্যাণময় বাসুদেব শ্রীনারায়ণকে আপনার বাক্যে স্মরণ করাইলেন। আপনার প্রশ্নে আমার হৃদয়ে নারায়ণ পূর্ণরূপে প্রকট হইলেন। পূর্ণ কৃপা করিয়া আপনি পরম কল্যাণমূর্তি বসুদেব।

নারদের এই বাক্যে কাহারও কোনোরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে তবে কি নারদ নারায়ণকে ভুলিয়া ছিলেন যে বসুদেবের প্রশ্নে তাহার পুনরায় নারায়ণ স্মৃতি হইল? পরন্তু এরূপ বিপরীত ভাবনা যদি কেহ করে তবে তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে। কথার যুক্তিটি নিশ্চিতরূপে শুকদেব বলেন। অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিতো নিজেই আছে, তাহাতে আবার ঘৃত প্রদান করিলে যেমন উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষগণের সমীপে সপ্রেম প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলে সুখের উল্লাস বিশেষ হয়। প্রেমের সহিত ভাবার্থ গ্রহণের যোগ্য শ্রোতা পাওয়া গেলে মুক্ত পুরুষ উল্লাসের সহিত হরি-কথা বলেন। তাহাতেই সুখময়ের সুখ যাহতো যথার্থ রীতিতে অনুভব হয়। এই নিমিত্ত মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী সকলেই ভাগবত ধর্ম্মে পূর্ণ শান্তি লাভ করে। সেই প্রকার বসুদেবের প্রশ্নে নারদ পূর্ণ সুখ অনুভব করিলেন। পূর্ব্ব পরম্পরা অনুসারে প্রাপ্ত ভাগবত ধর্ম্ম কালক্রমে জীর্ণ হইলে নারদমুনি নিশ্চিত ভাবে ইতিহাস প্রতিপাদিত সেই কথা বলেন ॥১৩॥

যে বিষয়ে জনক রাজার প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর নয়জন ঋষভদেবের পুত্র প্রদান করেন, নারদ বলেন,—আমি সেই ভাগবত ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস কথা সম্পূর্ণ ভাবে বলিব। আর্ষভগণ কাহারা ছিলেন, তাহাদের বংশ পরিচয় বলিব। তাহাদের উত্তমকুলে জন্ম হইয়াছিল নয়জনের মধ্যেই ব্রহ্মনিষ্ঠা ছিল ॥১৪॥

প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভি র্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥১৫॥

তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া।
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ ব্রহ্মপারগম্ ॥১৬॥

তেষাং বৈ ভরতো জ্যেষ্ঠো নারায়ণপরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতম্ ॥১৭॥

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, তাহার পুত্র অগ্নীধ্র বিখ্যাত। নাভি তাহার পুত্র সূর্য্যবংশী। নাভির পুত্রদের মধ্যে জ্ঞানী বলিয়া ঋষভদেব, বাসুদেবের অংশে তাহার জন্ম। তিনি মোক্ষধর্ম্ম জগতে বিশেষভাবে বিস্তার করেন ॥১৫॥

ঋষভ বাসুদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি অংশাংশ অবতার। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে বিস্তৃত ভাবে তাহার কথা বলা হইয়াছে। ঋষভের শতপুত্র। সকলেই বেদশাস্ত্র সম্পন্ন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র পরম পবিত্র—অতি বিচিত্র চরিত্র ॥১৬॥

জ্যেষ্ঠপুত্র ভরত নারায়ণ পরায়ণ। অদ্যাপি তাহার নামে ভারতবর্ষ উচ্চারণ হইয়া থাকে। তিনি কায়মনোবাক্যে নারায়ণের অখণ্ডিত ভজনই করেন। রাজার কর্ত্তব্য করিয়াও তিনি আত্মজ্ঞান পথ ত্যাগ করেন নাই। পথে চলিতে আঁকা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়াও যেরূপ নিজের প্রিয় স্থান লাভ করিয়া মানুষ সুখী হয়, সেইরূপ রাজা কর্ত্তব্য সাধনে আঁকাবাঁকা পথ চলিয়াও তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন, যেহেতু যথোচিত কর্মসাধনায় তিনি পতিত হন নাই। এরূপ এক অখণ্ডস্থিতি তাহার লাভ হইয়াছিল যাহা কল্পান্তেও পরিবর্তিত হয় না, যে অবস্থা লাভ করিলে অপুনরাবৃত্তি লক্ষণ সুখ হয়। এই প্রকার সদাচার পালন পূর্ব্বক নারায়ণ পরায়ণ হইয়াছিলেন ভরত। নারায়ণ কথার তাৎপর্য বলিতেছি। 'নার' শব্দে জীব সমুদায়কে বুঝায়। 'অয়ন' শব্দে সেই সকল জীবগণের আশ্রয় স্থান অধিষ্ঠান বুঝায়। অতএব নারায়ণ কথার তাৎপর্য সকল জীবের

স ভুক্ত ভোগাং ত্যক্তে মাং নির্গতস্তপসা হরিম্ ।
উপাসীন স্তৎপদবীং লেভে বৈ জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥১৮॥

আশ্রয়, তাহাতে পরায়ণ অর্থাৎ অনন্যচিত্তে শরণ গ্রহণ করা। নিজের অহংকে বিসর্জ্জন দিয়া তন্ময় হইয়া থাকা। ঋষভের পুত্র এইরূপ, যাহার নাম ভরত। ভুবনে যাহার বিচিত্রকীর্ত্তি পরম পবিত্র। এই ভূমিতে ভরত ছিলেন, তাই ইহার নাম ভারতবর্ষ, সকল কর্ম্মারম্ভে সকল সংকল্পে যাহার পবিত্র নাম স্মরণ করা হয়। এইরূপ আত্মারামের সমীপে বিষয় সঙ্গ মোটেই ভাল লাগে নাই। এইজন্য তাহার বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে আমি বলিলাম। তাহার নামে বিশেষ খ্যাতি, এইজন্য তাহার বর্ণনাও 'ভরত-খণ্ড'। তাহার প্রতাপও লোক বিলক্ষণ ছিল ॥১৭॥

তিনি দিগ্‌বিজয় করিয়া সমুদ্র বলয়াঙ্কিত রাজ্য করিয়াছিলেন। দেব দুর্ল্লভ নানা প্রকার ভোগও করিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী পুত্র মন্ত্রী সকলেই অনুকূল ভাবাপন্ন ছিলেন। রাজ্যের কেহ প্রতিকূল ছিল না। এই অবস্থায় বিচিত্র ভোগ ও সমুদ্র বলয়াঙ্কিত বিশাল রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মহিত চিন্তায় তিনি হরি ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহারা রাজ্য সম্পৎ ভোগ করে তাহাদের সহসা বিরক্তি আসে না। ভরত কিন্তু নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভোগ ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীহরির ভজন করিলেন। তাহার কিন্তু সোজাসুজি মোক্ষ হওয়ারই কথা কিন্তু তাহা না হইয়া জন্মান্তর হইয়াছিল, তাহার কারণ বলি। প্রসবের কাল উপসন্ন এরূপ সময় একটি মৃগী জল পান করিবার নিমিত্ত একটি স্রোতের ধারে গিয়াছে। এমন সময় এক সিংহের গর্জ্জনে সে সন্ত্রাসিত হইয়া লাফাইয়া পড়িল। আর সেই সঙ্গে তাহার গর্ভের সন্তান জলেই পড়িয়া গেল।

ভরত সেই সময় জলে নামিয়া স্নান করিতেছিলেন। তিনি হরিণ শিশুটিকে জলে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া দয়াবশে উহাকে জল হইতে তুলিয়া লইলেন। হরিণী ভয়ে কোথায় ছুটিয়া গেল, আর সে আসিল না। কাজেই মাতৃহীন সেই শিশু মৃগটিকে জীবদয়ার আদর্শে পালন করিতে লাগিলেন ভরত। দিনে দিনে মৃগটির উপর মমতাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্নান সন্ধ্যা অনুষ্ঠান সকল সময়ই, এমন কি, জপ ধ্যানের সময়ও ভরতের মন মৃগ

তেষাং নব নবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্ম্মতন্ত্র প্রণেতার একাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ ॥১৯॥

ভাবনাময় হইয়া থাকে। আসন ভোজন শয়নেও মৃগেরই স্মরণ। তাহাকে না দেখিতে পাইলে ধ্যান ত্যাগ করিয়া ভরত উঠিয়া যান তাড়াতাড়ি। মৃগের প্রতি মমতা প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজের ইচ্ছায় মৃগটি একদিন বনের দিকে চলিয়া গেল। তাহাতে ভরত অত্যন্ত দুঃখকাতর হইয়া পড়িলেন। এই সময় তাহার মৃত্যুর কালও আসিয়া উপস্থিত হইল। মমতাই মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। যে সম্পূর্ণরূপে মমতাশূন্য তাহাকে জন্ম মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না। ভরত বহু তপস্যা করিয়াছেন। তাহাকে কাল পরাজিত করিতে পারিত না। মমতার সন্ধান পাইয়া মৃত্যু সেই সুযোগে তীব্রবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেহেরই তো মৃত্যু; সেই দেহান্ত সময়ে ভরতের চিন্তা হরিণ শিশুর; কাজেই মৃগজন্ম লাভ করিয়া জন্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়া গেল। কৃপা করিতে যাইয়া যে সঙ্গ হইল তাহাতেই যোগীর যোগভঙ্গ হইল। এজন্য নিঃসঙ্গ হইয়া যোগ করিলেই সাধকের যোগ অভঙ্গ থাকে। মৃগকে স্মরণ করার ফলে ভরতের মৃগজন্ম লাভ হইল। কৃষ্ণ স্মরণ থাকিলে দেহান্ত সময়ে কৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। অন্তকালে যেরূপ মতি থাকে, প্রাণীর গতি সেইরূপই হয়। এইজন্য চিত্তে সকল সময় অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিবে। মৃগদেহে যাইয়াও কিন্তু পূর্ব্বকৃত অনুষ্ঠানের প্রভাবে তাহার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ হইতে লাগিল। ইহার পর তৃতীয় জন্মে তাহার নাম "জড় ভরত" হইয়াছিল। সেই জন্মে "জড় ভরত" মমতাশূন্য নিত্যমুক্তভাবে স্থিত হইলেন। বহু জন্মের পর উত্তম জন্ম মানুষের। জীব যদি এই দেহে নিজের পরমাত্মার সন্ধান করে, সে পরব্রহ্ম পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ঋষভ দেবের শত পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতের কথা বলিলাম। অপর সকলের কথা বলিতেছি ॥ ১৮ ॥

অপর নয়জন নবখণ্ডের অধিপতি হইলেন। একাশীতি জন কর্ম্মমার্গের প্রবর্ত্তক হইলেন। বাকী নয় জন সর্ব্ব সৌভাগ্যভূষণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিষ্ঠান স্বরূপ নব যোগেন্দ্র হইলেন। তাহাদের কথা বলি ॥১৯॥

নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়ো হ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥২০॥

কবির্হরিরন্তরিক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রুমিলশ্চমসঃ করভাজনঃ ॥২১॥

ঋষভ কুলের কুলপ্রদীপ তাঁহারা স্নেহ বা সূত্র (তেল সলিতা) রহিত হইয়াও চিরদিন প্রকাশময়। যে নবযোগেন্দ্র সচ্চিদানন্দময় সাযুজ্যমুক্তির স্বরূপ প্রকাশক। যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলন পরিশ্রমে কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার নিরসন করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ভ্রম ভাবনা রহিত হইয়া কোনো আশ্রম স্বীকার না করিয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম জ্ঞানে পারংগত হইয়া নিজ শিষ্যগণকে প্রবোধ দানে সমর্থ। তাঁহারা পরম অদ্ভুত স্বভাব, অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ করিতে করিতে তাঁহাদের অবয়বও যেন ব্রহ্মময় হইয়া গিয়াছিল; যেন ব্রহ্মজ্ঞানের কোরক প্রস্ফুটিত বিগ্রহ তাঁহারা। যেন পরাবিদ্যার পূর্ণ বিম্ব স্বয়ং স্বয়ম্ভু পরমব্রহ্ম। এই মুনীশ্বরগণ যেন দশটি দিক্‌কেই এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বায়ুপ্রবাহের ন্যায় তাঁহারা কটিসূত্রপ্রায় সকলকেই পরিবেষ্টন করিয়া গ্রন্থি দিয়াছিলেন। আকাশই তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র। চিদম্বর তাহাদের আবরণ উত্তরীয়। প্রাণ ও অপানবায়ুকে ডোর করিয়া নাভি মধ্যে তাহারা গ্রন্থি দিয়াছিলেন। তাহাদের জীবস্বরূপের চিদচিদ্রূপ গ্রন্থিভেদ হইয়াছিল। তাহারা নয় জন যেন যজ্ঞোপবীতের নয়টি ব্রহ্মসূত্র ছিলেন। তাহাদের মধ্যে পরব্রহ্মের বৈভব ও আত্মস্বরূপের অনুভব-পরিপাক দেখা দিয়াছিল। তাঁহাদের নাম যথা গৌরবে আমি বলিতেছি। ইহাদের নাম স্মরণ করিলে কাল কম্পিত হয়, সংসার মস্তক অবনত করে। তাহাদের নাম মহিমা, হে পরীক্ষিৎ, গ্রহণ করিলে নিশ্চিতরূপে মুক্তির আনন্দ লাভ করা যায়। তাহাদের নামের তুলনা নাই ॥২০॥

তাঁহাদের নাম কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্‌পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন। এই নয়টি নাম স্মরণ করিলেও সকল পাপ দূর হইয়া যায়। এই প্রকার তাহাদের পূর্ণ মহিমা। তাঁহাদের পরমহংস

ত এতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকম্।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তো ব্যচরন্ মহীম্ ॥২২॥

অব্যাহতেষ্ট গতয়ঃ সুরসিদ্ধ সাধ্য—
গন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণ ভূতনাথ—
বিদ্যাধরদ্বিজ গবাং ভুবনানি কামম্ ॥২৩॥

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভে মহাত্মনঃ ॥২৪॥

পদে স্থিতি—তাহাদের চরণস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয়। এই নয় জন পুণ্যময় পূজনীয় ব্যক্তি ॥২১॥

বাহিরে দেখিতে তাহারা নয়জন—অন্তরের ভাবনায় তাহারা এক ভগবৎস্বরূপ। সৎ বা অসৎ যে যেমন হউক, তাহারা সকলকে আপনাদের সঙ্গে অভিন্নরূপেই এক বলিয়া দেখেন। অসৎ ভাব সর্ব্বথা দূর না হইলেও অথবা পূর্ণরূপে সৎ না হইলেও তাহারা ভেদ দর্শন করেন না। কেননা সকলই তাঁহারা চিন্ময় ভাবনায় দর্শন করেন। সমগ্র সংসারময় ভগবান্, নিজেরাও তাহা হইতে ভিন্ন থাকিতে পারেন না। অতএব তাঁহারা জীবমাত্রে এবং পঞ্চ মহাভূত সর্বত্র ভগবানকেই দর্শন করেন। দৃশ্য ও দ্রষ্টা, হওয়া না হওয়া, জানা না জানা সকল ভেদ ভুলিয়া তাহারা সমভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করেন ॥২২॥

বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, সুরসিদ্ধস্থান, সপ্তপাতাল ও উর্দ্ধলোক, চতুর্দ্দশ ভুবনে তাহারা কামনা রহিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। তাহাদের বিষয়াসক্তি মাত্র নাই। তাহাদের এইজন্য গতিরও বাধা নাই। ইচ্ছামাত্র নিষ্কামভাবে তাহারা সুখে ভ্রমণ করিতে পারেন ॥২৩॥

যেখানে মনেরও গতি রুদ্ধ সেখানেও তাহারা স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে সমর্থ। এইভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে একবার তাঁহারা কর্ম্মভূমিতে আসিয়া

তান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্য সঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ।
যজমানোঽগ্নয়ো বিপ্রাঃ সর্ব্ব এবোপতস্থিরে ॥২৫॥

উপনীত হইলেন। যদৃচ্ছাক্রমে অজনাভখণ্ডে অর্থাৎ ভারতে আসিলেন। যেখানে জনক রাজার যজ্ঞক্ষেত্র—যেখানে প্রসিদ্ধ সকল ঋষীশ্বরগণ মিলিত হইয়াছেন—যেখানে বেদ অনুসারে বিধিমত কুণ্ডমণ্ডপ বেদী প্রভৃতি যথাশাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে—যেখানে সুন্দর আড়ম্বর করিয়া অনুষ্ঠান পীঠ তৈয়ার করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি কর্ম্ম শুদ্ধভাবে করা হইয়াছে। স্রুক্, স্রুবা প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র তিন প্রকার ডোরী তিন বর্ণের কুশের আস্তরণ পরিস্তরণ অখণ্ড বসুধারা প্রভৃতি লইয়া ঋষিগণ হোম করিতেছেন। হোম শেষ করিয়া পূর্ণাহুতি দেওয়ার সময় সেই স্বকান্তিতে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি নয় জন যোগেন্দ্র দেখা দিলেন ॥২৪॥

তাহাদের অঙ্গুষ্ঠনখ তেজের সমীপে কোটি সূর্য্যের তেজ নিষ্প্রভ বলিয়া অনুভূত হয়, যেহেতু তাহারা ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাহাদের অলৌকিক তেজ। তাহাদের অঙ্গপ্রভায় সূর্য্যের প্রভা বিলুপ্ত। সেই দীপ্তি দীপ্তিমান পদার্থের শোভা সম্পাদন করে। সেই নয় জন যেন চৈতন্যের সাকার মূর্ত্তি প্রকাশিত। ভগবদ্‌ভাবের বৈভব ভগবানের গৌরব অথবা বিবিধ ভক্তির বিগ্রহ এই নয় জন? অথবা নবখণ্ড এই পৃথিবীর অলঙ্কার, নবনিধির সার, নবরত্নের ভাণ্ডার বুঝি মূর্ত্তি ধরিয়া এই নয় জন যোগীন্দ্র হইয়াছেন। অথবা নারায়ণই এই নয় মূর্ত্তিতে স্বয়ং প্রকটিত হইলেন? নয় জনই বুঝি নৃসিংহ হইয়া প্রভা বিস্তার করিতেছেন। যেন যজ্ঞকুণ্ড হইতে তিন অগ্নির (দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়) আহ্বান করা হইয়াছে। আর সেই তিন অগ্নিই নয়জন যোগীন্দ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, তাই যজ্ঞকুণ্ডে আর অগ্নি দেখা যাইতেছে না। এই প্রকার তেজঃসম্পন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঋত্বিক্ ও আচার্য্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাজা জনক ছুটিয়া গিয়া আনন্দ সহকারে যোগীন্দ্রগণের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি দ্রুত গতিতে গমন করিয়া তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। মাথার মুকুট নামাইয়া রাখিয়া মস্তকে তাহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যজ্ঞমণ্ডপে আনয়ন করিলেন ॥২৫॥

বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণ পরায়ণান্।
প্রীতঃ সম্পূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ ॥২৬॥

তান্ রোচমানান্ স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান্ নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥২৭॥

তাহাদের ভগবৎপরায়ণ দেখিয়া বিদেহরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অত্যন্ত আদর করিয়া স্বয়ং তাহাদের পূজা করিলেন। শ্রদ্ধার সহিত চরণ প্রক্ষালন, ধূপ দীপ পুষ্প চন্দন, এমন কি মধুপর্ক প্রভৃতি বিধানানুসারে প্রদান করিয়া যথাযোগ্য পূর্ণাঙ্গ পূজা করিলেন ॥২৬॥

নিজের অঙ্গের স্বতঃসিদ্ধ প্রভায় ব্রহ্মবিদ্যার পুঞ্জ শোভায়মান নয়টি উজ্জ্বল মূর্তি। হৃদয়ের ব্রহ্মজ্ঞান-পরিপাক পূর্ণরূপে বাহিরে প্রকাশ। উহাতেই অঙ্গের মণ্ডন, অপর কোনো ভূষণের প্রয়োজন নাই। মুকুট কুণ্ডল কংকণ মূর্খের অঙ্গের জন্য, উহাদ্বারা অঙ্গের শোভা বিলুপ্ত করিয়া শুধু তাহারা মূর্খতাই বাহিরে প্রাকাশিত করিয়া রাখে। এই জ্ঞানঘন যোগীন্দ্রগণ সেরূপ নন। পূর্ণ ব্রহ্মানন্দে তাহাদের শোভা। উহাই তাহাদের দেহের শোভা, অপর ভূষণ তাহাদের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মানুভবে পূর্ণ হইয়া সেই আনন্দই তাহারা ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহিরে প্রকাশ করেন। নিজ শান্তিই তাহাদের অলংকার, মুকুট কংকণ প্রভৃতি তাহাদের সমীপে অতি তুচ্ছ অলংকার। পূর্বে যে সনকাদি মুনিগণের বর্ণনা করিয়াছি ইহারা তাহাদের সমান অধিক ইহা বিচার করিলে দেখা যায়, মূলতঃ তাঁহাদের ও ইঁহাদের ভেদ নাই। উভয়ের এক গতি এক স্থিতি, এক শান্তি—ভেদ কিছু নাই। তাহাদের ও ইহাদের একই প্রকার সখ্য, বান্ধবতা সমান, জ্ঞান সমান, অনুবাদ কোনো দিক্ দিয়াই ভেদ নাই। শুধু সনকাদি চারিজন আর ইঁহারা নয়জন। সকলেরই সমান ব্রহ্মজ্ঞান, শান্তিও একপ্রকার ইহারা আসিয়া বিদেহ রাজার কর্ম্ম পূর্ণ করিয়া দিলেন। তাহাদের এই পূর্ণানন্দস্থিতি দর্শন করিয়া রাজার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি অতিশয় নম্রভাবে মৃদু মংজুল বচনে বিনয় প্রকাশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিদেহ উবাচ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি ॥২৮॥

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয় দর্শনম্ ॥২৯॥

সার্বভৌম চক্রবর্ত্তী দেহভাবরহিত বিদেহ জনক ঋষভনন্দন নবযোগীন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক বিনয় প্রকাশ করেন। তাহাদের অভ্যর্থনায় সকলেরই সুখোচ্ছ্বাস, বিদেহরাজ দেহভাবরহিত হইয়াও হর্ষান্বিত। আনন্দে দর্শন করিয়া তিনি বিনীতভাবে বলেন—আপনাদের সামর্থ্য বিচার করিলে বলিতে হয়, আপনারা ভগবৎস্বরূপ। আর দেহভাব বিচার করিলে বলিতে হয়, আপনারা ভগবানের ভক্ত বৈকুণ্ঠ পার্ষদতুল্য। পরম দেবতা নিজেই নিজের ভক্ত, এই উপনিষদের তাৎপর্য্য। উহা আপনাদিগের মধ্যেই যথার্থতা লাভ করিয়াছে। এই আমার পরমার্থ অনুভব। শিব হইয়া শিবার্চনা করিবে, এই লক্ষণের পর্য্যাবসান আপনাদিগের মধ্যেই সাজে। আর তাহা না হইলে উহা শুধু কথার কথা। শুধু বলা হয়, অর্থ পাওয়া যায় না। ভগবান্ বিষ্ণু যে সৃষ্টির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহা পবিত্র করিবার জন্যই দীন উদ্ধারক আপনারা দয়ায় বিচরণ করিয়া থাকেন। জগতের কল্যাণে আপনারা গমনাগমন করেন। মহাভাগ্য উদয়ে আপনাদের দর্শন লাভ হয়। আজ আপনাদের সেবার সুযোগ পাইয়া বুঝিতেছি, আমার উদ্ভট মহাভাগ্য উদয় হইয়াছে। ধন্য আমার অদৃষ্ট, ধন্য আমার বৈভব। অদ্য আপনাদের অপূর্ব দুর্লভ চরণ লাভ করিয়া আমি পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি ॥২৮॥

দেহধারী জীবগণের মধ্যে অতি দুর্লভ মনুষ্যদেহ। এই নরদেহ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমভাবে সঞ্চিত হইলে এই কর্মভূমি লাভ হয়। একটু কম বেশী হইলে হয় স্বর্গ, নয় নরকে গতি হয়। সমান কর্মফল লাভ হইলেই নরদেহ। তবে সকলের সমান বুদ্ধি থাকে না—সাম্যের মধ্যে বিষমভাব আসিলেই পতন হয়। পাল্লার একদিকে পাপের ভারী প্রস্তর অপরদিকে পুণ্যের তৃণচূর্ণ অল্প স্বল্প এইজন্য মানুষ অত্যন্ত পাপ বুদ্ধি

হয়। বালি ও সুবর্ণ দুই দিকে রাখিয়া সমান করিলে হইবে কি ? স্বর্ণ বিক্রয় করিলে ধনলাভ হয়। বালি দিয়া আর কি পাইবে ? কাহারও পুণ্য খুব বেশী আর পাপ অল্প স্বল্প ওজন করিয়া যখন দুইদিকে সমান হয়, তখন সেই জন্মে পুণ্যের প্রতি অধিক প্রীতি হয়। পাপ ও পুণ্য দুইটিকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে জীব নিত্যমুক্তি লাভ করে। এরূপ সূক্ষ্ম সংকটের মধ্যে মানুষ দেহ ধরে—তাহাতেও আবার ধন, দারা ও বিষয়ের অভিমান অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য দেহে আয়ু ক্ষয়িত হয়, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া। উহার দৃষ্টান্ত অমৃতদান করিয়া মৃগজলের প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। গন্ধর্ব্ব নগরের জন্য চিন্তামণি প্রদান করা—মিথ্যা বিষয় সাধনে নরদেহ ধারণ করা বৃথা। কল্পবৃক্ষের উদ্যান বিনষ্ট করিয়া উহা (রান) জঙ্গলে পরিণত করা অথবা সেই স্থানে অগত্যা ভাংএর গাছ লাগানো। এই প্রকার নরদেহ লাভ করিয়া আয়ুষ্কালকে সে লোকসান করে এবং সংপূর্ণরূপে শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া থাকে উপহাস, নিদ্রা ও নিন্দায় কাল কাটায়, প্রতিনিয়ত মায়িক কথা আর বিষয় সম্পর্কে খটপট, কোনো সময় ঘরের বাহির হইল তো খেলায় ডুবিয়া রহিল। নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ নিন্দা কুকর্ম্ম ও বিষয় সম্বন্ধেই বাচালতা।

তাহাকে রামনামাবলী জপ করিতে বলিলে দাঁতে অসম্ভব খিল লাগিয়া যায়। কামধেনু গৃহে আসিলেও তাহাকে পোষণ করিতে ভয় পাওয়ার মত সে শ্রীরামনাম উচ্চারণে ভয় পায়, তাহার দেহ ধারণ বৃথা। নরদেহ ধারণ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর দেহের অহংকার করা উচিত নয়। ক্ষণভঙ্গুর দেহলাভ করিয়া ভগবৎপরায়ণ ভক্তের দর্শনলাভ মহা-ভাগ্যের পরিচয়। যাহার সমীপে ভক্তি মধুর বলিয়া অনুভব হয়, তাহাকে ভগবান প্রীতি করেন, এবং তাহার সাক্ষাৎ দর্শন হয়। তিনি মহাপুণ্যবান। এই প্রীতির লোভে ভগবান্ পদ্মনাভ ফিরিয়া গর্ভে আসিয়া যুগাবতার শোভা বিস্তার করেন। শ্রীভগবানের কৃপার প্রাচুর্য্যে যাহারা তাহার প্রীতির পাত্র হইয়াছেন, তাহাদের সঙ্গলাভ মহাভাগ্যের ফলেই হইয়া থাকে। নিষ্কামভাবে শুদ্ধ দৃষ্টি এবং অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হইলে তবে তো শ্রীহরিপ্রিয়জনের সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিতে পারে। ব্যাঘ্র ও সিংহের দুগ্ধে শরীরে বল হয় পুষ্টি হয়, শুনা যায়। কিন্তু জন্ম মরণ রহিত হয় না তো ? চন্দ্রামৃত পান করিলে নীরোগ

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্ ॥৩০॥

হওয়া যায়, তবে চন্দ্র কেন ক্ষয় রোগী ? অতএব তাহার সুধাকিরণ কি করিয়া মানুষকে নীরোগ করিবে ? ব্যাঘ্র বা সিংহের দুগ্ধে শক্তি আছে, উহাতে প্রাণী অজর অমর হইবে কেমন করিয়া ? যাহা হইতে সেই দুগ্ধের উৎপত্তি সেই ব্যাঘ্র ও সিংহও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে যে হরিভক্তের দর্শন লাভ করে, তাহাকে সংসার সংকট আর নিরুদ্ধ করিতে পারে না। তাহার জন্ম মরণ ব্যাধি দূর হয়। তাহাদের দর্শন বহু ভাগ্যের ফলে হয় ? আমার আজ সেই সৌভাগ্য পূর্ণরূপে উদয় হইয়াছে, তাই আপনাদের দর্শন পাইলাম। অতএব কৃপা করিয়া আমাকে 'আত্যন্তিক ক্ষেম' কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া বলুন ॥ ২৯ ॥

আপনারা নিষ্পাপ, নির্ম্মল, এইজন্য দর্শন মাত্র আপনারা কলিকালের সকল দোষ দূর করিয়া থাকেন, এইরূপ নির্মল চরিত্র আপনারা সকলে। গঙ্গায় স্নান করিলে সমস্ত জগতের জীব পবিত্র হয়। সেই গঙ্গাই নিজ পাপ দূর করিবার জন্য আপনাদের চরণস্পর্শ বাঞ্ছা করেন। আপনাদের দর্শনে চিন্ময় গঙ্গাস্বরূপ লাভ, আপনারা জগতে পরম সমর্থ। কেবল দর্শনেই সংসার ভয় দূর হইয়া যায়—জন্ম মরণের বন্ধন ছিন্ন হয়। আপনাদের দর্শনের সঙ্গে গঙ্গাস্নানের তুলনা হয় না। তীর্থের মহিমা সাধুর মহিমার কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সংসার ভয় নিবারণে তীর্থের সামর্থ্য নাই, উহা কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি মাত্র হইয়া যায়। এই প্রবল পবিত্র আপনাদের দৃষ্টিতে আমিও অত্যন্ত নির্ম্মল হইলাম। আপনারা দীনের প্রতি অতিশয় দয়া করিয়া থাকেন। এই প্রকার পবিত্র কৃপামূর্ত্তি ভাগ্যে দর্শন হইল। সৎসঙ্গের মহিমা বেদ বলিতে বলিতে মৌন হইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্ম, তাহার আর নিজধর্ম্ম কি আছে, সাধুগণের মুখেই ব্রহ্মত্ব লাভ, তিনিই ব্রহ্মা স্রষ্টা হইয়া থাকেন। সেই সাধুসঙ্গের মহিমা অতি গৌরবময় তুলনা রহিত। সৎসঙ্গ পরম নিধির সমান, মণি গাঁথিয়া কণ্ঠের মালা হয়, সৎসঙ্গের মহিমা এরূপ যে, সাধকের পদনখ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত সদ্রূপ করিয়া সুমণ্ডিত করে। বহুমূল্য হার, মণি ধারণ করিয়া বিষয় ভোগ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মহারাজ, সৎসঙ্গে

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥৩১॥

সেরূপ হয় না; উহাতে নির্ব্বিষয় নিরতিশয় সুখ লাভ হয়। ইন্দ্রিয় ছাড়াই স্বানন্দ লাভ এবং বিষয় ভিন্নই পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটে। এই প্রকার অনুভব হয়, তবে সাধুর মহিমা অগাধ অপার। অর্দ্ধ নিমেষের নিমিত্তও সাধুসঙ্গ হইলে সংসার বন্ধন দুঃখ দূর হইয়া যায়। সৎসঙ্গের ভাগ্য ভাগ্যবান সাধকই জানিতে বুঝিতে পারেন। সন্ত চরণে যাহার প্রীতি সাধুগণ তাহার প্রতি তুষ্ট হন। সন্ত সান্নিধ্যমাত্র দেখ সংসার ব্যর্থ বলিয়া অনুভব হয়। নানা প্রকার বিষয় ভোগের বিকার সংসারে জীবকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে—সংসারের সীমা জীবনে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ শুদ্ধি হয় সাধুসঙ্গ ফলে। প্রদীপের সঙ্গ পাইলে কর্পূর সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ জ্বলিয়া শান্ত হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গে ক্ষণার্দ্ধেই সংসার নিবৃত্তি হইয়া যায়। আপনাদের মত সাধুর সঙ্গ আমার ভাগ্যক্রমে অকস্মাৎ পাইয়া গেলাম অতএব আত্যন্তিক ক্ষেম কাহাকে বলে, কোন্ রীতিতে উহা পাওয়া যায় তাহা বলুন। আত্যন্তিক ক্ষেমের কর্ম্মস্বরূপ ভাগবতধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের অনুক্রম আদ্যোপান্ত সহজ সরলভাবে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন ॥৩০॥

ভাগবতধর্ম্ম শুনিবার অধিকারী বলিয়া যদি বিবেচনা হয়, তবে কৃপা করিয়া, হে স্বামিন্, আমাকে উহা উপদেশ করুন। ভাগবতধর্ম্মের অভিনব খ্যাতি আছে। যে প্রীতির সহিত এই ধর্ম্মের আদর করে শ্রীপতি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সেবকের সমীপে আত্মদান করেন। যাহার নাম অজ বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধি, সেই ভগবান্, ভাগবতধর্ম্মে প্রীতিমান্ ব্যক্তির অনেক জন্মশ্রেণীকে শোষণ করেন—অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মে প্রীতি হইলে, আর বার বার জন্ম লইতে হয় না। অনন্য শরণ হইলে, শ্রীনারায়ণ পরিতুষ্ট হন, তিনি সেবককে পূর্ণরূপে নিজাত্মতা দান করেন। ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ বিষয়ে আমার অধিকার না থাকিলেও আমি অনন্যশরণ, আর আপনারা সকলেই পরম কৃপালু। আপনারা সম্পূর্ণরূপে ভূত দয়ার ভাণ্ডার, দয়ার নিধি, দীনের উদ্ধার কর্ত্তা। যাহার প্রতি আপনাদের কৃপা প্রবাহিত হয়, তাহার আর জন্মমরণ থাকে না। আপনাদের কৃপায় সহজেই সর্ব্ববিষয়ে অধিকার লাভ

শ্রীনারদ উবাচ।

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥৩২॥

শ্রীকবিরুবাচ।

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥৩৩॥

হয়। অতএব আপনাদের কৃপা ভিন্ন আর কোনো কিছুরই সামর্থ্য নাই, ইহা নিশ্চিতভাবে জানিয়াই আমি আপনাদের শরণ গ্রহণ করিলাম। জ্ঞানীর অভিমান করিয়া আর লজ্জা পাইব কেন, আপনাদের শরণ গ্রহণেই আমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। এই প্রকার বিদেহ রাজের নম্র প্রশ্ন শুনিয়া নব যোগেন্দ্র সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। উহাই দেবর্ষি নারদ শ্রীমুখে বসুদেবের সমীপে বর্ণনা করেন ॥৩১॥

জগতের গতিস্থিতির জ্ঞাতা—শ্রীহরিহরের পরম প্রিয়—নিজাত্মজ্ঞানে পূর্ণ, দেবর্ষি নারদ বলিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ বলেন—বসুদেব, বিদেহ-রাজের গুরুত্ব পূর্ণ শ্রেষ্ঠ প্রশ্নে সেই মহানুভবগণের পরমানন্দ উচ্ছ্বলিত হইল। সেই নবযোগীন্দ্র সন্তোষের সহিত বিদেহ রাজকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। ঋত্বিক্ ও সদস্য আদরের সহিত পরামর্শ শ্রবণে ত্বরান্বিত হইলেন। অনুমোদন লাভ করিয়া সেই কথার নয়টি ভাগ করিয়া নয় প্রশ্নের উত্তর নয়জন যোগীন্দ্র দিতে লাগিলেন। ভাগবতধর্ম্ম, ভগবদ্ ভক্ত, মায়ার স্বরূপ, মায়া নিস্তারের উপায়, পরব্রহ্ম স্বরূপ, কর্ম্ম, অবতার চরিত্র সংখ্যা, অভক্তের অধম গতি, ও কোন যুগে কি প্রকার ধর্ম্ম—তাহার বর্ণনা অতি উত্তম নয়টি প্রশ্ন রাজা জনক জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ বিদেহ রাজের নয়টি প্রশ্নের যথানুক্রমে নয়জন যোগীন্দ্র উত্তর প্রদান করেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেন কবি যোগীন্দ্র ॥৩২॥

রাজা 'আত্যন্তিক ক্ষেম' সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তাহা সুষ্ঠুরূপে কবি জ্ঞাত

আছেন। সেই আত্যন্তিক ক্ষেমের ধর্ম 'ভাগবতধর্ম' তিনি প্রতিপাদন করেন। তিনি বলেন, দেখুন, এক চমৎকার ব্যাপার, নিজের সংকল্পই নিজের শত্রু, দেহবুদ্ধি বৃদ্ধি করাইয়া ভবভয়কে অতিশয় দৃঢ় করিয়া দেয়। দেহ বুদ্ধিতে সুখ নাই। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধশুদ্ধি দ্বন্দ্ব ও আধিব্যাধি সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। দেহবুদ্ধিতেই সকল দুঃখ ও মহাভয়ের ভূত দিনরাত্রি চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ধরে। দেহবুদ্ধিতেই মানুষ সংকল্প বিকল্পের ও মমত্ব বুদ্ধির আঘাতে অত্যন্ত চিন্তায় অভিভূত হয়। দেহ-বুদ্ধিতে অনুমাত্রও সুখ নাই। যে উহাকে সুখ মনে করে সে মহামূর্খ, কেননা উহা দুঃখের জনক। প্রদীপের মিলন পতঙ্গের কেবল দুঃখের কারণ। অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইরূপ দেহবুদ্ধি লইয়া মানুষ বিষয়ের প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়ে। যে পরিমাণে দেহবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে বিষয়ভোগ তাহার মিষ্টি লাগে। ইহাতে মহাভয় উৎপন্ন হইয়া অগণিত জন্মমরণের পথে আসা যাওয়া করিতে হয়। সন্তাপও তাহার বরাবর থাকে। দেহবুদ্ধিতেই মহাপাপ। ইহা জানিতে পারিলে অনুতাপ করিয়া জীব অল্প পরিমাণেও বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগ করে। বিষয়ের ভোগসুখে অগণিত জন্মমৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইবে ভাবিয়া সাধক ভয়ে উহার ভোগ ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়কে নিয়মের মাধ্যমে বিষয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়কে সংযত কবিলেও সংযত হয় না। বিষয় ছাড়িলেও ছুটেনা, পর পর বাঁধিয়াই রাখে ; এইজন্য হরিভক্তির প্রকাশ করিয়াছেন। হরিভক্তি উদয়ে ইন্দ্রিয় কোথাও আসক্ত হয় না। বিষয়াসক্তি সহজেই বিরত হয়। হে রাজন্, হরিভক্তির এইরূপ নিশ্চিত সামর্থ্য জানিবেন। যোগী ইন্দ্রিয়কে বন্ধ করেন, ভক্ত ভক্তিকে গ্রহণ করেন। যোগী বিষয় ত্যাগ করেন, ভক্ত সেই বিষয় ভগবানে অর্পণ করেন। যোগী বিষয় ত্যাগ করিতে দেহে দুঃখ অনুভব করেন, ভক্ত ভগবান্‌কে বিষয় অর্পণ করিয়া নিত্যমুক্ত জীবনের আনন্দ অনুভব করেন। ইহার আর বিকল্প হইতে পারে না, এজন্য দেখ, 'কায়েন বাচা' ইত্যাদি শ্লোক অর্পণের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। দারা, সুত, গৃহ, প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিবে ইহাই পূর্ণ ভাগবতধর্ম। প্রধানভাবে ইহারই নাম 'ভজন'। এক এক ইন্দ্রিয়কে পৃথক্‌ভাবে কি ভাবে ভগবদ্ ভক্তিতে লাগানো যায়, হে রাজন্, সেই কথা

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৩৪॥

সংক্ষিপ্তভাবে আপনাকে বলিতেছি। মনে শ্রীহরির ধ্যান করিবেন, শ্রবণে কীর্ত্তি শ্রবণ, জিহ্বায় নাম স্মরণ অহর্নিশি হরিকীর্ত্তন, করদ্বারা শ্রীহরি পূজন, পাদ দ্বারা দেবালয় গমন, নাসিকা দ্বারা তুলসীর সুগন্ধগ্রহণ—যাহা দ্বারা শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজন। নিত্য নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবে, উদরে চরণামৃত ও প্রসাদ ধারণ করিবে এরূপ ভক্তকে দর্শন করিলেও অতি অল্পক্ষণে ভবভয় দূর হইয়া যায়, সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়, প্রেম পূর্ণ হয়। যাহার শ্রীকৃষ্ণভজন অখণ্ড তাহার ভববন্ধন থাকে না। সকল ভয়ের মধ্যে ভবভয় সর্ব্বাধিক, উহা হরিভক্তির সমীপে অনাথ কিংকরের মত থাকে। শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে তৎক্ষণাৎ জন্ম মরণ ভয় দূরে যায়। ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সংসার ভয় আর থাকিবে কেমন করিয়া? হরিচরণ ভজনে প্রীতি হইলে ভবভয়ের নিবৃত্তি—ভগবদ্‌ভক্তি পরম নির্ভয়—এই আমাদের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। আমাদের এই নিশ্চয় জ্ঞানের সাক্ষী বেদশাস্ত্র ও পুরাণ, সকলের জন্য সর্ব্ব প্রকারে নির্ভয় স্থান ভগবদ্‌ভজন। বেদ শাস্ত্র এবং পুরাণে স্বমুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমি সর্ব্বথা ভক্তির অধীন। ভগবানের বাক্য ভক্তিপ্রধান। চারিটি হাত তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের শীঘ্র প্রাপ্তির উপায় বলিলেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ॥৩৩॥

বেদশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি লাভ হইল না, নিজের অজ্ঞানেই নিজে আত্মজ্ঞান হইল বলিয়া মনে করিয়া ব্রহ্মস্থিতিকে সুগম করিয়া লইল, এজন্য পরম দেবতা হরিভক্তি প্রকাশ করিলেন। বেদশাস্ত্র পাঠ না করিয়া জড় মূঢ় জনের কি করিয়া উদ্ধার হয়? উন্মত্ত গজেন্দ্রকে কে উদ্ধার করে, পরীক্ষিৎকে কে গর্ভে রক্ষা করে, অম্বরীষের জন্মমরণ ঘুচাইলেন কে? ভক্তিহেতু "অহং ভক্ত পরাধীনঃ" নারায়ণ স্বমুখে বলিলেন। কত বনচর বানর এই ভক্তিতে উদ্ধার হইল; ভল্লুক জাম্ববান নিশ্চিত তরিয়া গেলেন। ভূ-বিবরে থাকিয়া জাম্ববতী ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে বরণ করিলেন। বলিব কি, সরল গোপকুমারী, গোধন, গোপাল কৃষ্ণসখা তাহারা সকলেই অনন্য প্রীতির বলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইল। শাস্ত্রবিরুদ্ধ অবিবেক স্থিতি বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি করিয়াও গোপীগণ অনন্য ভক্তিতেই কৃষ্ণলাভ করিলেন। কোনো প্রকার

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥৩৫॥

বিচার সিদ্ধান্ত না করিয়াই সুগমোপায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। বলহীনকেও অনায়াসে নিশ্চিতভাবে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান নিজ ভক্তিকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই এই ভাগবত। প্রধান ভাবে ইহাতে ভক্তিই মুখ্য সাধন। প্রেমের সহিত ভজন করিলে অজ্ঞানীও উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা ভাগবত নয়, অজ্ঞানের জন্য ভগবানের নিজের নৌকা। সংসার সমুদ্র পারে লইয়া যাইবার জন্য প্রেমময় মহানৌকা প্রভু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভাগবতের মহানৌকায় যাহারা ভজন ভাব লইয়া আশ্রয় লইবেন, তাহাদের হেলায় ভবভয় দূর হয়—ভজন প্রভাবে ভয় স্পর্শও করিতে পারে না। স্ত্রী শূদ্রাদি করিয়া সকলকেই এক খেপে ভজন প্রভাবে অতি অল্প সময়ে সংসার সাগরের পারে লইয়া যান। ভক্তির ভর করিয়া সাধক কর্ম্মাকর্ম্ম স্রোতোজল স্বাত্মজ্ঞানে কাটিয়া কাটিয়া অতি অল্প সময়ে অপর তীরে পৌঁছাইতে পারে ॥৩৪॥

যে শ্রুতি স্মৃতি কিছু জানে না, শুধু ভাব ভক্তিতে ভগবৎপথ আশ্রয় করে, তাহার বিধিনিষেধের বাধ্যবাধকতা স্বপ্নেও বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সদ্ভাবে প্রেমের সহিত ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিলে কর্ম্মাকর্ম্ম বাধা দেয় না। ভাবে পুরুষোত্তম ভগবান্ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। শ্রুতি ও স্মৃতি দুই চক্ষু, যাহার একটিরও জ্ঞান নাই সে অন্ধ। যাহারা ভাববলে শ্রীহরির ভজন পথে ধাবিত হয়, প্রেমযোগে তাহাদের পতন বা স্খলন হয় না। প্রেম বিনা শ্রুতি স্মৃতি জ্ঞান, প্রেম বিনা ধ্যান পূজা, প্রেম বিনা শ্রবণ কীর্ত্তন সকলই বৃথা বলিয়া জানিও।

মাতাকে দেখিয়া প্রেমে উচ্ছ্বলিত আবেগে চক্ষু বুজিয়া ছুটিয়া যায় সন্তান। মাতা সেই ধাবন্ত সন্তানকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া নেন। সেই প্রকার যে ভক্ত প্রেমের সহিত ভগবানকে ভজে তাহার গতি সম্বন্ধে সব দোষ ভুলিয়া নিজেই তাহাকে পদে পদে রক্ষা করেন। এই প্রকারে ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিলে কর্ম্মাকর্ম্ম বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না, কারণ কর্ম্ম সম্বন্ধে যে কিছু আজ্ঞা ও নিয়ম সকলই পুরুষোত্তমের ভজন মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। এই প্রকার ভাগবত ধর্ম্মে স্বানন্দকন্দ শ্রীগোবিন্দের

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতস্বভাবাৎ
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥৩৬॥

সন্তোষ, উহার মধ্যে বিধিনিষেধ ভক্তকে বাধা দিতে পারে না। প্রভু কন্যাকে যেমন দ্বারপাল বাধা দিতে পারে না তেমনই ভাগবত ধর্ম্মাচরণশীলকে কর্ম্মের অর্গল বাধা দিতে অসমর্থ। ভগবদ্ ভজনে যাহার বিশ্বাস বিধিনিষেধ তাহার দাস। নিজ ভজনবিলাস দেখিয়া সুখী হন। ভাগবত ধর্ম্মাচরণকারী যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মও করিয়া যায় তাহাও পুরুষোত্তমের সুখের নিমিত্তই হয়। প্রেমিক ভক্তকে কিন্তু কোনো প্রকারেই কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না—এ বিষয়ে অনর্থক ভুল করে। কর্ম্ম করিতে যাইয়া যদি প্রমাদগ্রস্ত হয় ভক্তের সেই বিপদের সময় গোবিন্দ আবির্ভূত হইয়া সমাধান করেন, এজন্য বিধিনিষেধ হরিভক্তিকে বাধা দিতে পারে না। অজামিল কর্ম্মবন্ধনে পড়িয়াছিলেন। যমদূতগণ তাহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছিল কিন্তু ভগবানের নাম মাত্রে ভগবান প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অত্যন্ত শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই দুটি ভজন সুখাসনে উপবিষ্ট ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী সমীপে আত্মসত্তা বিলুপ্ত করিয়া দণ্ডিত হয়। ভজন-প্রতাপ-সত্তার সমীপে স্বধর্ম্ম ও কর্ম্ম এইরূপ দণ্ডলাভ করিয়া বর্ণাশ্রমের সমীপে স্থান লাভ করিতে চায়, সেখানেও কর্ম্ম ধ্বংস হইয়া যায়। এই ভাগবত ধর্ম্ম সেবকের সমীপে দীন কর্ম্মও দাঁড়াইতেই পারে না, বাধা আর কি করিয়া দিবে? ভাগবতধর্ম্ম কেমন, কিভাবে উহা ভগবানে অর্পণ হয় সেই অতিশয় গুহ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজ ভজনের বর্ম্মস্বরূপ বলিতেছি, হে রাজন্, শ্রবণ করুন ॥৩৫॥

হেতুক অথবা অহেতুক বৈদিক লৌকিক বা স্বাভাবিক সকল কর্ম্মই ভগবানে অর্পণ, ইহারই নাম ভাগবতধর্ম্ম। জলের বুকে চপল তরঙ্গ কিন্তু যেদিকে দেখ জল ছাড়া কিছু নয়। সেই প্রকার ভক্তের সকল কর্ম্ম মিলিত হয় ভগবানে সমর্পণে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রথম মানসিক অর্পণ পরে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি অভিমান এবং শরীর সম্বন্ধে বুঝিবে। ভাগবতধর্ম্মের নিজ স্থিতি মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবানে অর্পণ করিয়া রাখা।

স্বধর্ম্ম-কর্ম্ম তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। হৃদয়ে পুরুষোত্তম প্রকট হইয়া থাকেন এইজন্য ভক্ত হন নিষ্পাপ সত্যসংকল্প শ্রীহরির দাস। যেমন বুদ্ধির খেলায় (দাবায়), রাজা, মন্ত্রী, হাতি, ঘোড়া, সৈন্য সবই আছে বটে কিন্তু সেই সব গুলিই কাষ্ঠের নির্ম্মিত সেইরূপ ভগবদ্ ভক্তের সংকল্পে সব কিছুই ভগবৎস্বরূপ হইয়া থাকে। তাহার সংকল্প যে বিষয়েই হউক না কেন উহাই আত্মারামময় হইয়া যায়। তাহার ভজনের প্রভাব সীমাহীন, উহা নিজেই বৃদ্ধিশীল। জাগৃতি, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন তিন অবস্থায়ই অবাধ ভজন, অখণ্ড অনুসন্ধান এবং সম্পূর্ণ আত্মবোধ থাকে। মনে সে সমাধান করিতে সমর্থ হয়, ফলে ভজন অধিকাধিক হইয়া থাকে, অনুসন্ধান পূর্ণরূপে চলে এবং ধ্যেয় ধ্যাতা ও ধ্যান সমান ভাবে চলিতে থাকে। তুরীয় সাক্ষী উন্মনী-ভাব উদয় পর্য্যন্ত ভগবদ্ভজন চলিতে থাকে যাহাতে আমিত্ববোধের পর্য্যন্ত বিলুপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় ভাবনা বিনাই ভাব উৎপন্ন হয়। সাধক তখন দেব-রূপতা লাভ করে। তখন অর্পণেরও নব পর্য্যায় শুরু হয়—অর্পণ না করিলেও সব কিছু ভগবদর্পিত হইয়াই থাকে। স্বরূপ অনুভবের স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া যায়। জাগৃতির জ্ঞান কাড়িয়া লওয়া হয়। সুষুপ্তির সুখ সমাধানও আর থাকে না। তিন অবস্থারই এক পূর্ণাবস্থিতি হয়। সেই স্বরূপানুসন্ধানে সবখানি মন স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিয়া যে সুখ সমাধান লাভ করে উহা সজ্ঞান ভক্তই স্বয়ং জানে। ইহার পর মানসিক জ্ঞান সহজ স্বরূপে অর্পণ হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের সমর্পণ হয়, তাহার লক্ষণ, হে রাজন্, শুনুন। গৃহের অভ্যন্তরে প্রদীপ আনয়ন করিলে তাহার প্রভা গবাক্ষের দ্বারে ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ মনে শ্রীহরি প্রকাশিত হইলে প্রতি ইন্দ্রিয় দ্বারে ভজনের আনন্দ প্রকাশ হইবে। সেইজন্য ইন্দ্রিয় ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করা হইতেছে। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার পরব্রহ্মে ভজন তৎপর হইয়া থাকে। দৃষ্টি যখন বাহিরের দৃশ্য দেখে উহার মধ্যেও দেবতার দর্শন হয়। তাহার পর দৃশ্য দর্শন হইয়া গেলে দৃষ্টির বিষয়গুলি ভজন সত্তায় অর্পণ হইয়া যায়। তখন দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন তিনই এক হইয়া সহজে ব্রহ্মার্পণ হইয়া যায়। এই প্রকারে ভক্ত শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিকে ভগবানে অর্পণ করেন। দৃশ্য তাহার দৃশ্যরূপতা প্রকাশ করে, তাহাতে দৃষ্টির মধ্যেই দর্শন অভিন্নরূপে থাকে। ভক্ত এইরূপে দর্শন অর্পণ করিয়া ভজন করেন।

অনন্তর শ্রবণের অর্পণ কি ভাবে হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যিনি বাক্যের বক্তা তিনিই শ্রবণ বিষয়ে শ্রোতারূপে অবস্থিত, আবার অর্থের বোদ্ধাও তিনিই। এই প্রকারে শ্রবণের ব্রহ্মপূর্ণতা সিদ্ধ হয়। শব্দরূপে প্রকাশ হইতে না হইতে সেই শব্দের বক্তা সেই শব্দের উদরে প্রকট হইয়া অবস্থান করে। এইভাবে ভজনের অকৃত্রিমতা উৎপন্ন হয় এবং শ্রবণদ্বারে ব্রহ্মার্পণ স্বাভাবিক ভাবে মিটিয়া যায়। শব্দের উচ্চারণ মাত্র উহার অর্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাতে শব্দ উচ্চারণকারীর সমীপে শব্দার্থ মধুর বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাতে হরিভজন রুচিজনক হয়। স্বয়ং সেই শব্দ কানে পড়িতে না পড়িতে ভজনও বৃদ্ধি পায় আর তাহার ফলে শব্দের প্রবর্ত্তককে সেই শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে অর্পণ করা হয়। শব্দের উচ্চারণকারীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভবে শ্রবণদ্বারে ব্রহ্মার্পণতা সহজ হইয়া যায়। সদ্‌গুরুর বাক্য কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলেই মনের মনত্ব বিশ্রাম লাভ করে, শ্রবণ ব্রহ্মার্পণ হইয়া ভগবদ্‌ভজনের সার্থকতা হয়। এইভাবে শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করিলেই শ্রবণের ব্রহ্মার্পণতা লাভ হওয়ার ফলে হেতুরহিত ভগবদ্‌ভজন আপনা আপনিই চলিতে থাকে। ভজনের মধ্যে সন্তুষ্ট হইলে জগন্নিবাসের বাসস্থানে বাস লাভ হয়। পরমেশ্বর ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারে ব্রহ্মার্পণের ফলে সুবাস গ্রহণ করেন। যিনি কুসুমের কুসুমত্ব দিয়াছেন তিনিই সুবাস হইয়া উহার মধ্যে রহিয়াছেন—তিনি রুচিজনক গন্ধ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করেন। নাসিকায় নানা গন্ধের গ্রাহক হইয়া যান। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই গন্ধ কৃষ্ণার্পণ হইয়া থাকে। রসনা রসের স্বাদনে যায়, তখন দেবতার রসাস্বাদন হয়। রসনার মধ্যে যিনি থাকেন তাহার রসভোগবৃত্তি ব্রহ্মার্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। রসনা যে যে রস রুচিজনক বলিয়া গ্রহণ করে উহা যে সেই রসস্বরূপ শ্রীহরি। এই প্রকার স্বাদ গ্রহণের মধ্যেও শ্রীভগবদর্পণ ভাব রাখিবে। রস, রসনা ও রসাস্বাদ তিনই যে নিজের সঙ্গে ভেদরহিত, ইহা ভাবনায় রসসেবনে ও ইন্দ্রিয় দ্বারে পরমানন্দ স্বানন্দ মূলেরই সাক্ষাৎকার। কটু মধুর নানারস অবসর মত রসনা ভোগ করে, তবে উহারা সকলেই ব্রহ্মরস, ইহাই মনে রাখিতে হইবে, তাহাতে উহা স্বাদু সুরস পরমানন্দ। এই প্রকারে রসনা রসাস্বাদন রত হইয়া কৃষ্ণার্পিত।

অনন্তর স্পর্শ-বিষয়-রচনা কি ভাবে ব্রহ্মার্পণ হয়, হে রাজন্, তাহা শুনুন। স্পর্শ দেহেই হইয়া থাকে। স্পর্শের মাধ্যমে দেহে বিদেহীকে অনুভব হয়।

যাহা কিছু স্পর্শ হয় তাহাই ব্রহ্মে অর্পিত হইতেছে এই ভাবনায় স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য যাহাই স্পর্শ হউক না কেন উহাদের মধ্যে আর দ্বৈত ভাব থাকে না, কেবল এক অদ্বৈত ভাবনা সিদ্ধি হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণার্পণ ভজন প্রকাশিত হয়। সাধক যে পদার্থ গ্রহণ করে উহাই সামর্থ্যগুণে পরমার্থরূপতা পরিগ্রহ করিয়া নিজ ভক্তের স্বার্থ পূর্ণ করে। তাঁহাকে ছাড়া কাহাকে দেওয়া যায়—যত দেওয়া নেওয়া সবই যে তাঁহাকে লইয়া। দাতা ও গ্রহীতা ভগবান ভিন্ন আর কেহতো নয়, নিজের অঙ্গাশ্রয়েই দান গ্রহণ সব কিছু। যেখানেই পদ চালিত কর না কেন, পথ, সেই পরমদেবতা ভিন্ন আর কিছু কি? অতএব পদে পদে ব্রহ্মার্পণই হইতেছে। প্রতি পদে ভগবান নিজের ক্ষিতিরূপে নিজের অঙ্গেই চলিতেছেন—এইরূপ বিচার উৎপন্ন হইলে নিজকর্মেও ব্রহ্মস্থিতি অনুভব হইবে। যে কথা মুখে বলিতেছ উহার মধ্যে যিনি থাকিয়া বলিতেছেন. তাহার কথা বলিতে বাণী লজ্জিত হয়। সে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার্পণে বাণী নিজ ভজনের পুষ্টি সাধন করে। নিঃশব্দতার মধ্যে শব্দ লয় প্রাপ্ত হয়, নিঃশব্দেই তাঁহার কথা বলা হয়—এই বিধি কৃষ্ণে শব্দার্পণের। বলার কর্ত্তাতো ধ্বনির মধ্যেই আছেন আর শব্দের মধ্যেইতো তাঁহার ভজন চলে—এইভাবে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সকলই ব্রহ্মার্পণ সহ পরমার্থ প্রকাশ করে। এই প্রকার কায়মনোবাক্যে যে ভগবদ্‌ভজনে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে তাহার ভজনে অভিমান সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, ব্রহ্মার্পণ হয়। সমুদ্রের তরঙ্গ, তাহারই মধ্যে তপ্ত মেঘ লুকাইয়া আছে, সে জগতের শান্তি বিধায়ক ও পোষণকর্ত্তা, আবার ক্ষুদ্র চাতকেরও তৃষ্ণাহারী। সে-ই শস্যকে বৃদ্ধি করায়, নদীকে পূর্ণ করিয়া সমুদ্রের সঙ্গে সমান করিয়া মিলিত করে। এই নিয়মে ভগবদ্‌ভক্তও মূল কেন্দ্র হইতে পূর্ণতা লাভ করিয়া সেই পরিপূর্ণ আনন্দের অনুভব অভিমানে ভজন করিতে থাকেন, তাহার ভজনের লক্ষণ মনোযোগ করিয়া অবধান করুন। তিনি অনুভব করেন সব কিছুরই কর্ত্তা আমি হইলেও কর্ম্ম করিয়াও আমি অকর্ত্তা সকল কিছু ভোগ করিয়াও আমি ভোগ রহিত সকল জগতেই আমার সত্ত্বা, সকল নিয়ন্ত্রণে আমার নিয়ন্ত্রিত্ব সকলের মধ্যে সব কিছু প্রকাশেই আমার প্রকাশ, সকল শাসনেই আমার শাসন, সকল প্রাণীর সঙ্গে আমি এক অভিন্ন, আমিই ব্যাপ্য-ব্যাপক, জনিতা, জনয়িতা ও জনক, অনেক হইয়াও আমি

এক জগদ্রূপ। দেবতার দেবত্ব, দেবীর দেবীত্ব, ব্যয়ের মধ্যে আমি জন্মরহিত অব্যয়, অক্ষরের ক্ষয়হীনতা আমারই সঙ্গে, পরমেশ্বরের যে যে সত্তা সব কিছুর মধ্যেই আমারই সমর্থতা, ভগবানের ভগবত্তা আমারই মধ্যে। জলের রসরূপ আমি, প্রকৃতি পুরুষের জনক আমি, সৃষ্টিরচনার সংকল্প আমারই, আবার আমিই নির্ব্বিকল্প। আমি আদির আদি অনাদি, আমিই সমাধির সমাধি, শুদ্ধতার শুদ্ধি ত্রিশুদ্ধি অভিমানার্পণ। আমার জন্ম নাই, আমি অকর্ম্মা-কর্ম্ম করিলেও উহা বন্ধন করে না। আমারই মধ্যে পুরুষোত্তম উত্তমতার মহিমা লাভ করে। সৎ শব্দে আমার অঙ্গের বোধ হয়। চিৎ শব্দে আমাকে স্পষ্ট অনুভব হয়, আর সৎ চিৎ আনন্দ তিনে মিলিয়া আমি অবিভাজ্য অনির্ব্বাচ্য আনন্দ স্বরূপ হই। আমারই মধ্যে সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। আমার মধ্যেই চিদাকাশের অবকাশ, আমার অঙ্গেই জগতের নিবাস ও আনন্দ কোলাহল। আমি জন্ম রহিত, আমার এই অজত্বেই মায়ার অজাত্ব, নিঃশেষ বীজ রহিত আমি সকলের বীজ, নিজের অঙ্গেই নিজে, নিজের ভোগেই নিজের নৃত্য, যাহা কিছু আছে আমাতেই আছে। জগদীশ্বরের ঈশ্বরতা আমাতে, পরম পুরুষের পুরুষ, পরমেশ্বরের পরমেশ্বর, স্বয়ং আমি। অসতের মধ্যে সৎ, অচিতের মধ্যে চিৎ, নিজানন্দে আনন্দ স্বরূপ আমি, সকল সিদ্ধির সিদ্ধি, সর্ব্বতোপ্রসারী বুদ্ধির বুদ্ধি, মোক্ষ এক উপাধি মাত্র, উহাও আমার সত্তায় সিদ্ধ হয়। সত্যধর্ম্ম আমি। আমার মধ্যে ব্রহ্ম কর্ম্ম বিস্মৃত হন। ব্রহ্মসমাধির পরব্রহ্ম নিঃসীম সত্যস্বরূপ আমি। হরি হর ব্রহ্মা আমারই অংশাংশ। দশাবতারের অবতারী আমি বড় কম নই।

ভক্ত এই প্রকার অনেক বিচারের অভিমানে ভগবদ্‌ভজন করিয়া আমিই ব্রহ্ম এই ভাবনায় আপনিই আপনার পূর্ণত্বকে সমর্পণ করে। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে কেবল বাক্য আছে, উহাকেই ভগবদ্‌ভজন বলি। সাধক এই ভাবনায় তন্ময় হইয়া অভিমান ব্রহ্মার্পণ পূর্ব্বক ভজনে লাগিয়া থাকে। দেহবুদ্ধির কাদামাটি ধুইয়া মুছিয়া লওয়ার পর যে এক শুদ্ধ অহংকারের উদয় হয়, উহা অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকার, উহা লাভ করিলে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মননের মধ্যে মনন, স্মরণে নিত্য স্মরণ, চিত্তের আত্মচিন্তন স্বানুভবে মগ্ন থাকিয়া যে স্বাভাবিক ভজন তাহাতে অপ্রাপ্তকেও পাওয়া

যায়। তখন চিত্তে, যে বিষয়ের বিচার উঠে সব কিছুই ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে পাওয়া হয়। দ্রব্য না থাকা অবস্থায় চিন্তা অতিচিন্তা, দ্রব্য থাকা অবস্থায় চিন্তা নিশ্চিন্ততা, আর থাকা না থাকার চিন্তা ছাড়িয়া যে সহজ ভাব উহাই ভজন। চিত্ত, চিন্তনীয় ও চিন্তন এই ত্রিপুটির একভাব হইলে উহা সমাধান শুদ্ধ পূর্ণরূপে সহজ কৃষ্ণার্পণ হয়। এই প্রকার ভগবদ্‌ভজনের বিধানে বুদ্ধি ভজনশীলা হইয়া সকল কর্ম্ম মধ্যেও নিশ্চয় করিয়া আপনা আপনি সমাধি লাভ করে। কেহ কেহ বলেন—কর্ম্মাচরণ মধ্যে কোনোমতেই সমাধি লাভ সম্ভব নয়। হে জনকরাজ, এরূপ যাহারা বলেন তাহারা ত্রিবিধ ভাবশুদ্ধ আত্মবোধ লাভ করেন নাই, জানিবেন। যে এক তটস্থতার ভাবকে সমাধি নামে অভিহিত করা হয়, উহা বুদ্ধির ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। উহা ত্রি শুদ্ধিময় আসল সমাধি নয়, উহা একপ্রকার মূর্চ্ছা বলিলেই হয়। তটস্থতার অবস্থা হইতে উত্থিত হইলে বলা হয় সমাধি ভঙ্গ হইল। উহা একদেশী ভাব মাত্র, উহা অল্পবুদ্ধি লোকের বাক্য, মোটেই সত্য সমাধি নয়। সমাধিকে একদেশী ভাব বলাও লজ্জাকর। এই অবস্থাকে যাহারা আসল সমাধি বলিয়া মনে করে তাহারা কেবল শব্দ পাণ্ডিত্যই করিয়া থাকে। তাহাদের শুদ্ধ স্বরূপের দর্শন হয় নাই বুঝিয়া লইবে। ইহাদের প্রাচীন প্রারব্ধ অতিশয় সমর্থ বলিয়া ঐ প্রকার মূর্চ্ছা আনয়ন করিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয়। সত্য করিয়া বলিতে গেলে বলা যায়, চলিতে চলিতে বলিতে বলিতে বশিষ্ঠাদি মুনিগণের সমাধি হইত। দেবর্ষি নারদের দিকে চাহিয়া দেখ তাহার আনন্দ পূর্ণ কর্ম্মের মধ্যেও কোনো সময় সমাধি ভঙ্গ হয় নাই, চলা বলা ঘোরা ফেরা সকল অবস্থায়ই দেবর্ষি সমাধিস্থ থাকিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সমাধির অবস্থা প্রসিদ্ধই আছে, মুনিগণ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে দেখিয়াছেন। স্বরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলে তো আপনি উদ্ধার হইল, কিন্তু নিজে উদ্ধার হইয়া সেই জ্ঞান অপরের উদ্ধারের জন্য প্রকাশ করিলেন শুকদেব। এইজন্য সমাধি ও উত্থান এই দুই অবস্থাই ভাল করিয়া জানিয়া ব্রহ্মার্পণ হইলে অখণ্ডভাবে পূর্ণ সমাধি লাভ হয়। অর্জ্জুনকে নিজ সমাধি দান করিয়া দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণ মহাযুদ্ধে সকলকে নিহত করিলেন কিন্তু তটস্থ ভাবের ত্রিশুদ্ধির স্পর্শও দান করেন নাই। সদ্‌গুরুর দান বুদ্ধির শোধন এবং

সকল কর্ম্মেই সমাধি। তবে তো যুদ্ধের মধ্যেও ত্রিশুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম ও ক্রিয়ার শুদ্ধি হইয়া আত্মসমাধি ভঙ্গ হয় নাই।

বুদ্ধি যখন পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে তখন কর্ম্ম অহেতুক হইয়াছে, বুদ্ধির পরম অর্পণ ঘটিয়াছে, অন্য সবকিছুই তো ভ্রমময় অনুমান জ্ঞান। স্বরূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে নিরবচ্ছিন্ন সম বুদ্ধিতে কর্ম্মাকর্ম্ম অজ্ঞানের বন্ধন আর কোথায়—ইহারই নাম 'পরম সমাধি'। নিঃশেষে দেহবুদ্ধি চলিয়া গেলে স্বরূপানুসন্ধানে অহংকার বাধা দেয় না, কর্ম্মাকর্ম্ম অজ্ঞানও বাধা দেয় না, তখন নির্দ্দোষ পরম সমাধি। তখন নিরবধি স্বরূপানুসন্ধানে বুদ্ধি ভজনশীল হইয়া সকল কর্ম্মেই সমাধির আত্মার্পণ নিজেই অনুভব করে। যেমন মনের ব্যাধি শান্ত হইল তখনই পরম সমাধি হইল জানিও। দেহবুদ্ধি না ছাড়িয়া কাঠের মত মূর্চ্ছা প্রায় অবস্থা মাত্র হয়, উহা পরম সমাধি নয়। মনের মধ্যে স্থান পায় না অথচ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার চলে এই কর্ম্মকে কায়িক কর্ম্ম জানিবে। শ্বাস প্রশ্বাস বা নিমেষ উন্মেষ প্রভৃতি ব্যাপার সোজাসুজি নারায়ণে সমর্পণ হয় স্বাভাবিক ভাবে। তারপর গেহাদি সংশ্লিষ্ট বর্ণাশ্রম উচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিজধর্ম্ম অনুসারে পূর্ব্বানুক্রমে অহংকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক করিবে। ইক্ষুদণ্ডের আগাগোড়াই মধুর স্বাদ, সেইরূপ ব্রহ্মার্পণে ইন্দ্রিয় ব্যাপারগুলিও আগাগোড়া মধুর হইয়া যায়। কর্ম্মকলাপ পূর্ণরূপে আচরণ করার গৌরব সত্ত্বেও কর্ত্তৃত্বের অহংভাব স্পর্শ করিবে না। আমি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করি, আমার আচার অতি উত্তম, আমি জন্মমৃত্যু নিরসন করিয়াছি, এই প্রকার দেহ ধর্ম্ম তাহার থাকে না। দেহসঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহধর্ম্ম স্পর্শ করে না, দেহ স্বভাব লক্ষণ ব্রহ্মার্পণ করিয়া বিচরণ করিবে। দেহ ধর্ম্মের অংকুর উদ্‌গম হয় না, জ্ঞানের গর্ব্ব জনিত কঠোরতা তাহাকে স্পর্শও করে না, এজন্য সহজ ভজনানন্দে অভিমানশূন্য ভাবে সে অবস্থান করে। তাহা হইতে যে কিছু উৎপন্ন হয় উহাই, প্রভু বলেন,—আমার অতি প্রিয় আস্বাদ্য হয়। ব্রহ্মার্পণের ফলে ভক্তের সমগ্র জীবনটি অর্পিত না হইলেও অর্পিত হইয়া যায়। স্পর্শমণির স্পর্শমাত্র যে কোনো লৌহখণ্ড শুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মত ভক্তের দেহদ্বারা যে কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় উহাও শুদ্ধ ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ভক্তের খেলাই মহাপূজা, তাহার বৃথা কথাও পরমেশ্বরের স্তবন, তাহার স্বভাব আত্মানন্দে পূর্ণ, তাহাতে

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা—
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৩৭॥

শ্রীনারায়ণের সুখ সংবিধান। ভক্ত যেখানে বাস করে ভগবান আনন্দে সেখানেই থাকেন—সে দেখুক বা না দেখুক দেবতা তাহাকে স্বভাব বশে দেখেন। ভক্ত যে পথে চলে শ্রীরঙ্গদেব শীঘ্র গতিতে সেই পথ ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া আনন্দে চলিতে থাকেন। স্বাভাবিক কর্ম্মগুলিও অহেতুক ভাবে ব্রহ্মার্পণ হইলেই নির্দ্দোষ ভজন নাম সার্থক হয়—ইহারই নাম ভাগবতধর্ম্ম। স্বাভাবিক অবস্থায় বর্ত্তন বা থাকা সাহজিক ভাবে ব্রহ্মার্পণের নামই শুদ্ধ আরাধনা—ইহাই পূর্ণ ভাগবতধর্ম্ম। হে রাজন্, পরে আর কোনো ভজন পথ নাই, এই পথে কোনো দিকে ভয় নাই। হে মহারাজ, আপনি 'অভয়' হওয়ার প্রশ্ন করিয়াছেন। পরতত্ত্ব ভজনেই উহা হয়। হে রাজন্, ভয়ের কারণ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আপনি শ্রবণ সৌভাগ্যের নিধিরূপে পরিণত হইয়াছেন ॥৩৬॥

আত্মা পূর্ণতায় এক। তাহাকে ভিন্ন আমি পৃথক্ সত্ত্বাবান এরূপ যে দেখে তাহার ভয়জনক দুঃখদায়ক ভেদভাব হেতু অজ্ঞান। ভয়ের কারণ এই মূলীভূত অজ্ঞান আর তাহার নিবর্ত্তক প্রধান জ্ঞান। তবে আর ভগবদ্‌ভজনের কোন্ প্রয়োজন, এইরূপ জ্ঞানের অভিমানী পণ্ডিতেরা মনে করেন। ইহার তাৎপর্য্য, হে রাজন্, শ্রবণ করুন—জ্ঞানের কারণ প্রধান হইল ভক্তি—এই বিষয়ে আমার বুদ্ধি কৃতনিশ্চয়, ইহাই একমাত্র আমার অবধারণ।

অজ্ঞানের মূল মায়া। গুণময়ী মায়া ব্রহ্মাদিকে মোহিত করে না, উহা প্রাণীগণকে মুগ্ধ করে, উহা অতি দুস্তর। তাহার প্রধান লক্ষণ স্বরূপ আবরণ। যাহাতে দ্বৈতভাবের স্ফুরণ হয়, তাহার নাম মূলমায়া জানিবে। ব্রহ্ম অদ্বয়ভাবে পরিপূর্ণ তাহাহইতে অহংকার, উহাই মায়ার জন্মস্থান। ইহা হে রাজন্, নিশ্চিত ভাবে জানিবেন। সেই মায়ার নিজের উদরে ভয় শোক দুঃখ প্রভৃতি অনেক আছে উহা ব্রহ্মার শিবিরে পর্য্যন্ত পিছনে লাগিতে

চায়, অপরের সম্বন্ধে আর কি বলিব? সেই মহামায়ার নিবৃত্তি করিতে একমাত্র ভগবদ্ ভক্তিরই সামর্থ্য আছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই তাৎপর্য্য অর্জ্জুনের প্রতি গীতায় উপদেশ করিয়া বলেন—আমাকে যাহারা শরণ গ্রহণ করে তাহারা এই মায়া হইতে নিস্তার পায়। মায়া তো ভগবানের শক্তিই। ভগবদ্‌ভজনেই তাহার নিবৃত্তি। অন্য কোনো উপায় আর এ বিষয়ে চলে না। ভক্ত সুখে সুখে হরিমায়া তরিয়া যায়। হরিমায়া হরিভজনেই যায়—হরিভক্ত সুখে তরে, এই নিজের গোপন তথ্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ার পুষ্টির সঙ্গে স্বরূপ সম্বন্ধে বৈমুখ্য এবং দ্বৈতভাব দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসে। ভ্রমময় ত্রিপুটি সর্ব্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দ্বৈতভাব ভয়ের জনক—আর দ্বৈত জনক মায়া—মায়া নিবর্ত্তক ব্রহ্মজ্ঞান —এই কথা জ্ঞানী সন্তগণ বলেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মজ্ঞান উহা ভক্তির পোষ্য। ভগবদ্‌ভজন না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান কোনোমতে উৎপন্ন হইবে না। যদি দেখ বেদশাস্ত্র সম্পন্ন হইয়াও ভগবদ্ ভজন করিতেছে না, জানিও মায়া নিবর্ত্তক ব্রহ্মজ্ঞান তাহার কখনও হইবে না। শব্দ জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি লৌকিক স্থিতিতে অভিমান বৃদ্ধি করে, মায়া নিবর্ত্তক জ্ঞান প্রাপ্তি ভগবদ্‌ভজনভিন্ন কোনোমতে হয় না। শ্রীহরির গুণাবলীর রসাল কীর্ত্তন ব্রহ্মজ্ঞানের নিজ জননী। শ্রীহরিনামের গর্জ্জনে জীব পলকের মধ্যে মায়া হইতে নিস্তার পায়। শ্রীহরিনামের ধ্বনি উচ্চারিত হইলে আর ক্ষণকালের জন্যও মায়ার অধিকার থাকে না, এজন্য হরিভক্তিতে মায়া তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠে না। হরিভক্ত সুখে সুখে মায়া পারে যায়। এজন্য শ্রীপতি স্বয়ং বলেন—সাযুজ্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তিমাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইবে। অনন্যভাবে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভগবদ্‌ভক্তি না করিলে কখনও মুক্তি পাইবে না। যাহারা শ্রীহরিভজনে বিমুখ তাহাদের সম্মুখে সর্ব্বদা, দ্বৈতভাব, মহাভয় ও দুঃখের কারক প্রপঞ্চ দৃঢ়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দিগ্‌ভ্রম হইলে পূর্ব্বদিক্‌কে পশ্চিমদিক্ বলে। সেইরূপ বস্তু বিমুখ হইলে অতি গাঢ় মিথ্যার দ্বৈত বৃদ্ধি হয়। ভেদবুদ্ধির কুণ্ড হইতে সংকল্প বিকল্পের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, তাহাতে জন্ম মৃত্যুর সরোবর পূর্ণ হয়, আর তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যায়। জন্মমৃত্যুর আকর্ষণ, নানা দুঃখের রোগ, আরও নানাপ্রকার সংকট, অভক্তকে সহ্য করিতে হয়—এইগুলি হরিভক্তকে স্বপ্নেও

স্পর্শ করে না। ভক্তির অগাধ মহিমা। ভববন্ধন তাহাতে নাই। ভক্তেরা ভগবদ্‌ভজনের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর সেবায় লাগিয়া থাকে। নিজ শিষ্যের মরণভয় দূর করিয়া দেন সদ্‌গুরু, অন্যথা গুরুতা শুধু মন্ত্রতন্ত্রের উপদেশেই পর্য্যবসিত থাকে। মন্ত্রতন্ত্রের উপদেষ্টা গুরু ঘরে ঘরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু শিষ্যকে যিনি সদ্‌বস্তু মিলাইয়া দিবার জন্য উৎসুক তিনি সদ্‌গুরু, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। গুরুই দেবতা, গুরুই মাতাপিতা, গুরুই আত্মা, গুরুই পরমাত্মা, গুরুতত্ত্ব পরম ব্রহ্ম। গুরুর সহিত তুলনা করিবাঁর মত জগতে আর কিছু দেখা যায় না। গুরুর মহিমা অগাধ, ভাগ্য ভিন্ন গুরুলাভ হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মের কোটি পুণ্য, অগাধ সীমাহীন বৈরাগ্য, নিত্যানিত্য বিবেক প্রভৃতি পুঞ্জীভূত হইলে সদ্‌গুরু কৃপা লাভ হয়। গুরু কৃপায় ভক্তির ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত হয়, ফলে কলির প্রভাব পলকে দূরীভূত হয় এবং ক্ষুদ্র ভবভয় বিচার আর থাকে না। গুরুদেবই মাতাপিতা। তিনি একজন্মের নয় জন্ম-জন্মান্তরের সনাতন মাতাপিতা। লৌকিক পিতামাতা অধঃদ্বারে সন্তানের জন্মদান করেন। আর সদ্‌গুরু অধঃদ্বার স্পর্শ হইতে শিষ্যকে মুক্ত করেন। গুরুই কুলদেবতা—কুলধর্ম্ম পালনের জন্য কুলদেবতার পূজা হয়, সদ্‌গুরুর পূজ্যতা সকল কর্ম্মের মধ্যে তিনি স্বয়ং কামনা রহিত হইয়া সর্ব্বকালে পূজ্য। গুরু দেবতার সমান বলিলেও হয় না। কেন না সদ্‌গুরুর উপদেশেই দেবতার দেবত্ব প্রতিষ্ঠা, অতএব গুরুদেবের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। গুরু ও ব্রহ্ম দুই সমান, এই তুলনাতেও কিছু ন্যূনতা আছে, কেন না গুরু বাক্যেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব স্বীকৃত হয়, অতএব সদ্‌গুরু অদ্বয়ত্বে ব্রহ্মের সমান। এই নিমিত্ত গুরু গরিমা অগাধ, তাহার উপমা নাই। নিরুপম ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের প্রমাণ শ্রীগুরুদেবের বাক্য মহিমা। ব্রহ্ম সকলের প্রকাশক, সদ্‌গুরু তাহারও প্রকাশক। এই প্রকার গুরু হইতে পূজ্যত্বে আর কেহ অধিক নাই। অতএব গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ত্রিশুদ্ধি হইবে না। সৎশিষ্যের এইভাবে ভাবার্থ শুদ্ধি ও সহজে চিত্তশুদ্ধি হয়। গুরু চরণে যাহাদের নিঃসীম ভাব, দেবতা তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করেন। গুরুর আজ্ঞা দেবতাও পালন করেন। গুরু বাক্যে জড়বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিও আপনা আপনি উদ্ধার হইয়া যায়। ব্রহ্মবুদ্ধিতে গুরুসেবা পরায়ণ হইলে দেবতা তাহার আজ্ঞাধীন। তাহার নিত্য সুখ লাভ হয়। গুরুর মর্য্যাদা দেবতাও

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো—
ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্ন মনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্মসঙ্কল্প বিকল্পকং মনো
বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥৩৮॥

কখনো উল্লংঘন করে না। দেবতা গুরুর আজ্ঞা মানেন, তবেই তো গুরুর পূজ্যত্ব বুঝা যায়। এইভাবে গুরু ও দেবতার অভিন্নতা যাহারা ধারণা করেন, তাহাদের উদ্ধার হয়। মনে সদ্ভাব না রাখিয়া বাহিরে ভক্তিভাব দেখাইলে সেই সংসারী লোক নানা ভাবে নিজেই ঠকিয়া যায়। মানুষের সমাজে সে ঠকে, নিজের স্বার্থ বিষয়ে সে ঠকে এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়েও সে ঠকিয়া যায়। বৃথা দম্ভের ফলে কখনও ভক্তির উদয় হয় না। সদ্ভাব ভিন্ন কিছু হইবার নয়। সদ্ভাবই পরমার্থ সাধক এবং সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ। সদ্ভাব আরোপের ফলে প্রাণহীন শুষ্ক স্তম্ভ হইতে দেবাদিদেব প্রকাশিত হইলেন। সদ্গুরু স্বয়ং পরব্রহ্ম। এইজন্য সদ্গুরু ভজনপরতা ভিন্ন ভজন পরায়ণের আর কোনো দ্বিতীয় পথ নাই। যে জ্ঞানভক্তি তত্ত্বতঃ লাভ করিতে চায়, তাহাকে সদ্গুরু-ভক্তিলাভ করিতে হইবে। গুরু হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ এই প্রকার বলিলে উহা সাধকের পক্ষে বিরুদ্ধ হয়, শিষ্য ব্রহ্মসাম্য লাভ করিতে পারে না। আমাদের সদ্গুরু পরব্রহ্ম এইভাব প্রেমের সহিত নিত্য হৃদয়ে ধারণ পোষণ করিবে উহাই গুরু সেবা—এইভাবে শিষ্যও ব্রহ্মরূপতা লাভ করে। এইরূপ সেবার ফলে প্রহ্লাদ দ্বন্দ্বাতীত। দেবর্ষি নারদ আনন্দে গান করিয়া নৃত্য করেন এবং ব্রহ্মসাম্যে সুরাসুর সকল স্থানে নিঃশঙ্কে বিচরণ করেন। এই প্রকার গুরুসেবা করিয়াই অম্বরীষের জন্মান্তর ব্যথা দূর হইয়াছিল। তাহাকে দেবতা জন্মান্তররহিত করিয়াছিলেন। ভগবান নিজ ভক্তকে সংসার ব্যথা দেন না। এই অভিন্ন ভাবনার সুবুদ্ধি লাভ করিয়া গুরুচরণ ভজন করিলে জনার্দ্দন তাহার বশ হন এবং তাহাকে সংসার ভাবনা স্পর্শ করিতে দেন না। গুরু ও ব্রহ্ম দুই এক, শিষ্যও তদাত্মক। যাহারা ভেদ ভাবনা করে, তাহারা মায়ায় মুগ্ধ, কবি এই কথা বলেন ॥৩৭॥

নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি কোনো কিছু না থাকা অবস্থায়ও স্বপ্ন মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করে, তেমনই প্রপঞ্চ বাস্তবে না থাকিলেও প্রতিভাত হয়। জাগ্রত ব্যক্তি

স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করে এবং মনের ধ্যানের বিষয় না দেখিয়া জল বন প্রভৃতি যেমন আছে তেমনই দেখে। কেহ আসনে বসিয়া যে মূর্ত্তি ভাবনা করে তাহার ধ্যেয়, ধ্যাতা, উপচার বা ধ্যান কিছু না থাকিলেও কল্পনানুরূপ প্রতিভাত হয়। ধন লোভীর সমীপে ধনের চিন্তার মত ধন না থাকিলেও সে চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে না। ধনের মধ্যে তাহার মন বাঁধা পড়িয়া থাকে। ধন লোভে সে পূর্ণরূপে উন্মাদ হইয়া যায়। মন নিজেই দ্রব্য না থাকিলেও দ্রব্যের লোভে আত্মস্মৃতি হারাইয়া বিশেষ মোহবশে উন্মত্ত হয়। সেই ব্যামোহ পূর্ণতা লাভ করিয়া দেহাদি দ্বৈত ভান উপস্থিত করে এবং অহংকারকে আত্মীয় করিয়া দেহ বিষয়ে ভবভয়কে আনয়ন করে। ভবভয়ের কারণ মুখ্যরূপে মনের কল্পনা। সেই মনের নিরোধ হেতু সদ্‌গুরুর বচনে নিজের নিষ্ঠা। ইহা সৎশিষ্য জানিয়া গুরু বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া বিবেক বৈরাগ্য বলে নিজের মনটিকে নিরোধ করে। হে রাজন্, সদ্‌গুরুর বাক্যে চাতুর্য্যের সঙ্গে মনকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সংক্ষেপে ইহাই বলা হইল। চঞ্চলতায় বিষয় ধ্যানে মন যাহা যাহা দেখে উহা ব্রহ্মার্পণ হয়, সদ্‌গুরুর বাক্যে নিজের নিষ্ঠা হইলে। বিষয়ের স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া মন যে যে বিষয় গ্রহণ করিতে যায়, উহাও পরমার্থরূপে পরিণত হয়, সমর্থ শ্রীগুরুকৃপার অনুগ্রহে। ভূমিতে পদস্পর্শ ভয়ে যেখানে পলায়ন কর না কেন সর্ব্বত্রই ভূমি, যদি আসা যাওয়া বন্ধ কর, তাহা হইলেও সেই একই স্থানে থাকিতে হইবে। সেই প্রকার মনকেও ভাবিবে, যে যে বিষয় দেখ সকলই ব্রহ্ম, যাহা কর উহাও ব্রহ্ম এবং সর্ব্বত্রই স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রকাশ। এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তির চঞ্চল নৃত্য গুরুবাক্য প্রতীতি বলে থামিয়া গিয়া ব্রহ্ম আশ্রয়ে যাইয়া মিলিত হয়। তখন সকল প্রবৃত্তির দ্বারে অখণ্ড তালা বন্ধ হইয়া যায়। এই নিয়মে বাহ্য কর্ম্ম ও মনের গতি বন্ধ হইয়া দ্বৈত ভ্রম মিটিয়া যায়। তখন বাহিরেও পরব্রহ্ম পূর্ণ চিদাকাশে প্রকাশ হয়। এইরূপ ভজনে মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলে কল্পান্তকালেও ভয় উপস্থিত হয় না, ভক্ত নির্ভয় হইয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে বিচরণ করে। হে অগাধ নিষ্ঠাপরিপূর্ণ, এই জ্ঞান অবোধ জীব পূর্ণরূপে সাধন করিতে পারে না, এজন্য আরও একটি সুগম সাধন বলিতেছি, উহা শ্রবণ কর ॥৩৮॥

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে—
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥৩৯॥

সাধারণ অবোধ জনের নিস্তারের নিমিত্ত প্রধানভাবে চিত্তশুদ্ধির ক
স্বরূপ শ্রীহরির জন্মকর্ম্ম গুণাবলী অতিশয় আদর পূর্ব্বক শ্রবণ প্রয়োজ
ভ্রষ্টাচার পুত্রের শুদ্ধিকথা মাতা যেমন আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন, সেই
যিনি আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন, তাহার শ্রবণ সার্থক হয়। হ
জন্মকর্ম্ম অনন্ত গুণ উহা সমগ্রভাবে কি করিয়া শ্রবণ সম্ভব? এই শংক
উত্তরে বলা যায় যে, লোক প্রসিদ্ধ যে সকল পুরাণ আছে, ঐ গুলিই শ্র
সহিত শ্রবণ করিবে। পুরাণে ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় বলেন,—সকল পু
তাহার পাদপদ্ম মহিমা বর্ণন করেন। সকল বেদ ও পুরাণ সমর্থ চক্রপা
বন্দনা করে। তাহার অদ্ভুত জন্মকথা এবং পরমার্থযুক্ত লীলাকথা য
স্বয়ং বর্ণনা করেন উহা জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণ করিবে। পুরাণ শ
মনন বিনা ব্যর্থ হয়। এজন্য শ্রবণের পর সাবধান ভাবে মনন প্রয়োজ
মূল্য দিয়া গাভী ক্রয় পূর্ব্বক দোয়াইয়া খাওয়া বিষয় ভোগ, আর দ
পাওয়া গাভীর দুগ্ধ খাওয়া পরম অমৃত খাওয়া। সেই প্রকার শ্রবণ বি
মনন হইলে উহা পরম পাবন হয়। উহা উপেক্ষা করিলে শ্রবণ পরিণ
নিস্ফল হয়। হরিনাম শ্রবণ করিলে কাহারও মুখ দিয়া উহা বাহির হ
যায়, মনে আর থাকে না। কাহারও কানে মাত্র আসিয়া উহা চ
যায়, মুখেও আর উচ্চারণ হয় না। কাহার শ্রবণদ্বারে হরিনাম অন্তঃক
প্রবেশ করিয়া পাপ ধৌত করে, শ্রীহরি চরণে মন লাগিয়া যায়। অত
শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মননযুক্ত শ্রবণ করিবে। তাহাতে বিকল্প আর বাধা f
না। ইন্দ্রিয় বৃত্তি স্বয়ং শুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই মননযুক্ত শ্র
পূর্ণ আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হয়। আপন আনন্দে হরিকী
চলিতে থাকে।

হরিচরিত্র অগাধ জ্ঞানগর্ভ পদাবলীতে উপনিবদ্ধ, উহার উদার কী
পরমানন্দের পূর্ণ প্রবাহ বহিয়া যায়। যাহার প্রাকৃত জন্ম নাই তা

ন্মকথা, কর্ম্মহীনের কর্ম্ম, বর্ণনা করিয়া—অনামার নাম স্মরণ করিয়া প্রেমের হিত হেলিতে দুলিতে থাকে সাধক। নিজের কাজ সাধিবার জন্য লাকের লজ্জা ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করে সে। কীর্ত্তনেই সে সকল দোষ নির্ম্মুক্ত হয়, জপতপ তাহার কাছে নিরাশ হইয়া যায়। যমলোক শূন্য করিয়া সে তীর্থের আশা ত্যাগ করে। যম নিয়ম তাহার সমীপে উপবাসী, যোগাভ্যাস মুমূর্ষু, কীর্ত্তন রোলের নামমাত্র হৃষীকেশ সকল দোষ দূর করিয়া দেন। কীর্ত্তনে গম্ভীর ধ্বনিতে আনন্দ রোলে, উদ্ভট হর্ষে, বৈকুণ্ঠপীঠ দুলিতে থাকে। সেই সুখে নীলকণ্ঠ তাণ্ডব ভঙ্গীতে নৃত্য করেন। হরিকীর্ত্তন পরম সিদ্ধান্ত দান করে। ভক্তি রাজমার্গ। এই পথ চক্রপাণি স্বয়ং কর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া রক্ষা করেন। ভক্তের সমীপে চক্রধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—বল কি কার্য্য করিতে হইবে! সে বলে,—জগতে আমার বৈরী নাই। ভক্তদ্বেষী দেখিলে তিনি নিজ শস্ত্রে তাহাকে বিনাশ করেন। চক্র অভিমানকে চাটনীর মত অতি অল্পে উদরস্থ করে। গদা মোহ মমতা ছেদন করে। শংখ আত্মজ্ঞানের ঘোষণা করে। নিজ কমলে সর্বদা নিজ ভক্তকে পূজা করেন। চক্রপাণি রক্ষক হইলে ভবভয় কথাবার্ত্তা তো থাকেই না, বরং গুণকীর্ত্তনকারীকে শ্রীহরি স্বয়ং রক্ষা করেন। যে কথা শ্রবণ করে না বা কীর্ত্তন করিতে পারে না, সে রাম-কৃষ্ণ-গোবিন্দ প্রভৃতি নাম স্মরণ করুক। অচ্যুত নামের নিজস্ব মহিমা এই যে নামকীর্ত্তনে কল্পান্ত পর্য্যন্ত আর নামকারীর চ্যুতির কথা উঠে না। সেই নাম যে নিত্য স্মরণ করে তাহাকে নিশ্চিতই অচ্যুতের অবতার বলিয়া জানিবে। রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি নামাবলীর যাহার বাণীতে অখণ্ড কীর্ত্তন চলে তাহার সমীপে তীর্থগণ বিলুণ্ঠিত হয়, দেবশ্রেষ্ঠগণ চরণে লগ্ন হয়। নামের নিজ মহিমার কথা আর বলিব কি? যম পর্য্যন্ত নাম গ্রহণ কারীর পদরজ বন্দনা করেন। নামের সমীপে চতুর্ভুজ অধোক্ষজ স্বয়ং অবস্থান করেন। নামের প্রভাবের কাছে তুচ্ছ ভবভয় আর কোথায় লাগে? নাম গ্রহণকারীকে কলি কেমন করিয়া গ্রাস করিবে? নাম যে পরিমাণ পাপ দূর করিতে পারে তত পাপ ত্রিজগতে নাই। হে বিদেহরাজ, জানিয়া রাখুন, নামের কাছেই চারি প্রকার মুক্তি থাকে। শুনুন মহারাজ, নামের মত এরূপ সুগম সাধন আর নাই নাই নাই, ইহা নিশ্চিত। শ্রীধরের জন্মকর্ম্ম ও নাম শ্রবণে পামর

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথোরোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৪০॥

জীবও উদ্ধার হয়, এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মঙ্গলময় হরিলীলা বর্ণনা করেন। এই প্রকার হরিকীর্ত্তনে যাহার মন লাগে তাহার আর জ্ঞানের গরিমা থাকে না। সেই ব্যক্তি অহং মমতাবুদ্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ হইয়া সংসারে বিচরণ করে। শ্রীহরির কীর্ত্তি শ্রবণ স্মরণ করিলে সপ্রেম ভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ভক্ত দেহস্মৃতি ত্যাগ করে। তাহার স্থিতি সম্বন্ধে বলি শুনুন ॥৩৯॥

অখণ্ড শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সর্ব্বাবস্থায় দৃঢ় হরি ভক্তিতে সাধক লাগিয়া থাকে। এই প্রকার ভক্তিতে যে দৃঢ়ভাবে ব্রত গ্রহণ করে, তাহার চিত্ত হরিনামকীর্ত্তনে অদ্ভুত প্রেমোদয়ে বিগলিত হইয়া যায়। পরমপ্রিয় পরমাত্মা হরি তাহার নাম কীর্ত্তনে অত্যন্ত হর্ষান্বিত হন। নিত্য তাহার নবরুচির উদয় হয়। অন্তরে বাহিরে তাহার হরির প্রকাশ অনুভব হয়। কোনো সংকটে পড়িয়া মাতা ও সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটিলে বহুকাল অতীত হওয়ার পর আবার দুজনের মিলন ঘটিলে যেমন ক্রন্দনের রোল উঠে, সেই প্রকার ভক্তির উদয়ে জীব ও শিবের মিলনে আত্মসাক্ষাৎকারের মাধুরীভোগে ক্রন্দনের রোল উঠে। এজন্য সাধক ক্রন্দন করে। পরমাত্মার আলিঙ্গনে সর্ব্বদা কম্প, স্পন্দন, রোমাঞ্চ, রোদন ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পায়। কণ্ঠে গদ্‌গদ বাণী, কখনও হাসি, কখনও সে মনে করে, আমি আমার মধ্যেই আছি। যেন কি হারাইয়াছিলাম, আবার পাইলাম, নিজেকে দেখিয়া নিজেই পাগলের মত হাস্য করে সে।

আমি অখণ্ডত্বে স্বয়ং সর্ব্বত্র, অভেদ পূর্ণতায় অনাদি সিদ্ধ, অব্যয় বলিয়া আমি জন্মরহিত, এই ভাবনায় হেলিয়া দুলিয়া সে হাসিতে থাকে। রজ্জুতে সর্প ভান দেখিয়া প্রথমতঃ ভয় পায় পরে রজ্জুর স্বরূপ দর্শনে নিজেই নিজেকে লইয়া হাসিয়া থাকে, সেই প্রকারই এই সংসার না থাকিলেও দেহভাব

হইতে মায়াময় সকল সংসারে অহংভাব মিথ্যা ভাবিয়া সাধক হাসে। ধন্য গুরুবাক্য, সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দেয় সেই বাক্য। দেহ থাকা অবস্থায়ও আমাকে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতি চারিটি দেহের বন্ধন মুক্ত করিয়া বিদেহ করিয়াছে এই অনুভবে সাধক গর্জ্জন করে। ধন্য ধন্য ভগবদ্‌ভক্তি, যে ভক্তির প্রভাবে চারি প্রকার মুক্তিও তুচ্ছ হইয়া যায়। আমি নিশ্চয়ই সেই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত, এই উল্লাসে সে ত্রিভুবন মুখরিত করে। ধন্য ভগবানের নাম। নাম আমাকে নিত্য নিষ্কাম করিয়া সংসারকে মূলসহ মিথ্যা বুঝাইয়া দিয়াছে। এই কথা সে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে। দ্বিতীয় কেহ এই ত্রিলোকে নাই, একই আছে, সেই এক আমিই, আমিই আমাকে সর্ব্বত্র দেখি, আমিই তো একাকী আছি,—এই অলৌকিক কথা সে বলে। কঠিন ভববন্ধন তাহার নিঃশেষে দূর হইয়া যায়। সদ্‌গুরুর স্তবের মধ্যেই তাহার অলৌকিক বাণীর ধ্বনি শুনা যায়। সে বলে—অহো, এই সংসারের মিথ্যারূপ দেখিয়াছি—জন্মমরণ নাই—কলিকালের স্থান নাই, ভয় করিও না। এই প্রকার সকলকে শুনাইয়া তিনি বলিতে থাকেন, আর আত্মসুখে হেলিয়া দুলিয়া গান করেন। পরম সখার মধুর কথা বলিয়া তাহার সম্যক্‌ তৃপ্তি হয় না, তাই নিজে সুখানুভবে মগ্ন থাকিয়া হরিনাম গাহিতে থাকেন, এই গান আর শেষ হয় না। তাহার মুখে গান শুনিয়া শ্রোতাগণের চেতনার উদ্রেক হয়, সুখানুভব হয়, মুক্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয়। গানের আনন্দে ডুবিয়া তাহারাও গান করিতে থাকেন। গান করিতে করিতে প্রতিপদে অধিকাধিক পরম হর্ষের উদয়ে অলৌকিক নৃত্য আরম্ভ হয়। দ্বৈতভাবের সকল কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক লৌকিক লজ্জা পরিহার করিয়া অহংভাব অভিমান শূন্য সহজ আনন্দে অলৌকিক নৃত্য করেন। ক্রয় করিয়া মদিরা পানের আনন্দেই বোধশূন্য হইয়া নাচে গায়—ব্রহ্মানন্দ সেবন করিয়া সাধক আর কেমন করিয়া আত্মগোপন করিবে? এই জন্য লোক লজ্জা হারাইয়া ব্রহ্মরস পানমত্ততায় সাধক অলৌকিক নৃত্য গান করে। সাধারণ লোক তাহার ব্যবহার বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে উন্মাদ মনে করে। তাহার জ্ঞানের সীমা পণ্ডিতেরাও নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। তাহার আত্মজ্ঞানের কথা এক ভগবান ভিন্ন আর কে জানিবে? হে রাজন্‌, তাহার কথা বলি শুনুন। তাহার লৌকিক ব্যবহার কিছুই থাকে না ॥৪০॥

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥৪১॥

ব্রহ্মরস পানোন্মত্ত সেই আনন্দে যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন চরাচর সর্ব্বত্র সেই পূর্ণানন্দ স্বানন্দকন্দই প্রত্যক্ষ হয়। পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু, নভঃ, স্বয়ম্ভু হরিরূপ দর্শন হয়। মহাভূত সমূহ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া এক অভিন্ন সত্ত্বায় দর্শন। এ যেন মিলিত হইয়াও মিলন হয় নাই। একই কদলীদণ্ডে যেমন আপনিই ফল দল সকলই প্রকাশ পায় সেইরূপ এক বস্তুই মহাভূত ও পাঞ্চভৌতিক সব কিছু। স্ফটিকময় দীপগৃহে অঙ্গনতলে বিচিত্র অশ্ব গজ পদাতিক প্রভৃতি চিত্রিত থাকিলেও উজ্জ্বল আলোক পাতে সকলই এক উজ্জ্বলতায় পূর্ণ হইয়া উঠে সেই প্রকার চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি আলোকময় গ্রহাদি অগ্নি নক্ষত্র যাহা কিছু দৃষ্টিপথে পড়ে সকলই আত্মজ্যোতিতেই জ্যোতির্ম্ময় দর্শন হয়। চাতুর্য্যের সহিত অন্য বস্তুর মিলনে বাজীর অগ্নিও পুষ্পের মত দেখায়, সেই প্রকার এক সত্য বস্তুই লীলায় চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি নানারূপে দৃষ্ট হয়। পৃথ্বীর নিজস্ব গন্ধতো আছেই, সেই গন্ধ সাধকের সমীপে কস্তুরীর গন্ধের মত অনুভব হইয়া ভগবানের সত্ত্বা সর্বত্র আছে, ইহাই সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে প্রকাশ হয়। এজন্য সাত্ত্বিকের সমীপে সত্ত্বগুণ আর উহাতেই ভগবত্তত্ত্ব, সত্ত্বগুণেই সাত্ত্বিকের মহত্ত্ব এবং শ্রীহরিরূপে তাহার মান্যত্ব। পৃথিবীর জলাবরণ, যাহার নাম চতুঃসমুদ্র সেই জল দেবতারই অঙ্গ। যাহার নাম দশদিক্—পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দশদিক্ বিভাগ, উহারাও দেবতার অঙ্গ। শ্রীরঙ্গ এইভাবে তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ হন। তৃণ দুর্ব্বা দর্ভ দ্রুম দেখিয়া সে বলে এইগুলি শ্রীহরির রোম। নিজের অঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই সে হরিরূপে দর্শন করে। তাহার সমীপে কোনো কিছুই বিরোধী মনে হয় না। যেরূপ নিজের অঙ্গে প্রতিটি অংশের সমন্বয়ে এক অখণ্ডরূপ, তেমনিই বন বল্লী দর্ভ অরণ্য দেখিয়া সকলেই হরির অঙ্গ এইরূপ অনন্যভাবেই অখণ্ডরূপ দর্শন হয়, ভিন্নভাবে সে দেখে না। দুর্ব্বা বৃক্ষ বন বা লতা এগুলি হরিরই অনন্ত কোটি রোমাবলী। হরির অঙ্গ এইরূপে নিত্য বৃদ্ধিশীল হইয়া শোভা ধারণ করে। বটের বৃক্ষ

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি—
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু—
স্তুষ্টি পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥৪২॥

যেদিকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন সকল অংশেরই বটত্ব, ইহা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেইরূপ চৈতন্য হইতে নানাপ্রকার জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়, সেইগুলি চৈতন্য মনেরই রূপ, প্রতিটি ধারাই চিদ্রূপ বহন করে। অথবা চন্দ্রবিম্বে অমৃত যেমন বিম্ব হইয়া আছে, সেই প্রকার ভগবান্ সংসাররূপে প্রকাশ হন এবং ভজন বিশ্বাসে তিনি ভগবদ্রূপ হন।

এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ অংশ দেখিয়াও যখন উল্লাসে সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন দেবতা তাহার লুকানো অঙ্গশোভা খুলিয়া দেখান। এইজন্য সকল প্রাণীর সমীপে অনন্য শরণ লইবে যেমন লবণ সাগরের জলে অংশ অংশী ভুলিয়া যায়। ক্ষুদ্র কীট পিপীলিকাকেও সে হরিরূপে জানিয়া বন্দনা করে। মশকেও অনন্য শরণ ব্যক্তি ভগবদ্রূপ দর্শন করেন। গো, খর, চণ্ডাল, কুকুর প্রভৃতি অতি হীন জীব ভগবদ্রূপ দর্শনে অনন্য ভাবে প্রণাম করে। পাষাণ খণ্ডে তৃণ মধ্যে ভগবান্, স্থাবর জঙ্গম সকলের শরণ লইয়া চিদৈক্যভাবে নমস্কার করে সে। হরিনাম স্মরণ করিয়া তাহার কীর্ত্তি, কীর্ত্তনে অতুলনীয় অবস্থা লাভ করিয়া তিনি কিভাবে থাকেন, হে রাজন্, তাহা বলি। পূজা বিধি বিধান অথবা স্মরণ কীর্ত্তন করিয়া সর্বদা চিদৈক্য ভাবনায় পূর্ণ হইয়া তিনি পূর্ণরূপে সাধ্য বস্তু পাইলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥৪১॥

হে বিদেহরাজ শুনুন। এই প্রকার ভগবদ্ভক্তি তাহার সমীপে বিষয় বিরক্তি গোবৎস ন্যায়ে অনুসরণ করে। যেমন উৎকৃষ্ট জাবলী ফলের (পেয়ারার) কোনো অংশ হেয় বলিয়া ত্যাগ করা হয় না, সেই প্রকার ভক্তি ও বিরক্তি এককালেই ভক্তকে বলিষ্ঠ করে কোনো অংশ ত্যাগ করা যায় না। যখন ভক্তি ও বিরক্তি উভয়ের মিলনে সহজে স্থিতি লাভ হয়, তখনই পূর্ণ প্রাপ্তি দাসীর মত সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে। যেহেতু ত্রিভুবনে ভক্তিরই সামর্থ্য সর্ব্বাধিক। ভক্তি ও বিরক্তির মিলন ভক্তের গৃহেই মধুর হয়।

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তি র্বিরক্তি র্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥৪৩॥

ভক্তি, বিরক্তি ও অনুভব প্রাপ্তি এই তিনই একসঙ্গে হয়। হে রাজন্, সেই অবস্থা শুনুন, বিশদভাবে বলিতেছি। যে পরিমাণ ভগবদ্ভক্তি করিবে সেই পরিমাণে বিষয় বিরক্তিও হইবে, তদনুসারে অনুভবও সেই সময় ভক্ত লাভ করিবে। যেরূপ কোনো ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির সমীপে ষড়রস পরিপূর্ণ খাদ্য পরিবেশন করিলে সেই ব্যক্তি গ্রাসে গ্রাসে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি লাভ করিবে সেইরূপ। যেটুকু যেটুকু গ্রাস গ্রহণ করিবে ততটুকু ততটুকু ক্ষুধার নাশ এবং ততটুকুই পুষ্টি বিন্যাস, সুখোল্লাসও ততটুকুই। তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধা নাশ যেমন তিনটিই একসময়ে ভোক্তা ভোজন সময়ে পায়, তেমনই ভগবদ্ ভজনে ভক্তি প্রভৃতি তিনটিই একসঙ্গে লাভ হয়। সদ্‌ভাবে ভগবদ্ ভক্তি করিলে, হে রাজন্, ভক্তি, বিরক্তি, ভগবৎপ্রাপ্তি, এই তিনটি এক সময়ে হয়, এইটি জানিবেন। ভক্তি অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সপ্রেম ভজনের যুক্তি। প্রাপ্তি বলিতে অপরোক্ষ স্থিতি সর্বদা ভগবৎস্ফূর্তি। বিরক্তি সেই ভাব যাহাতে স্ত্রী পুত্র অহংভাব মমতা মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়। তাহারই নাম বিরক্তি ইহার পর ভজনের উদয়ে ভক্তি, বিরক্তি ও প্রাপ্তি এই ত্রিপুটি ঐক্যভাবে সদ্‌ভক্তের হরিভজন বিষয়ে এক হইয়া মিলিত হয়। এজন্য, রাজন্, নিজ হিতার্থী আদর পূর্বক হরিভক্তি করিবে, তাহাতেই অবশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। উপসংহারে কবি বলেন ॥৪২॥

এই প্রকার অনন্যভক্তি যাহারা করেন, তাহারা সহজেই ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকার লাভ করেন। হে রাজন্, হরিভক্তি দিব্য অঞ্জন। উহা সজ্জন ভক্ত গ্রহণ করিয়া নিজ ভজন মহাযোগে অনায়াসে ভগবান্‌কে দর্শন করেন। ঐক্যভাবে নিজ ভক্তি উৎকৃষ্ট পূর্ণশান্তি উৎপন্ন হয়। তাহাতে অসতের নিবৃত্তি হয় এবং ভক্তের পরমানন্দে পূর্ণ প্রাপ্তি হয়। এইজন্য ভক্ত ধন্য। ইন্দ্রিয় থাকা অবস্থায়ও যে বিষয় সম্বন্ধে বিরক্ত, দেহে থাকিয়াও দেহাতীত, ভজনে সে নিত্যমুক্ত। ভাব সহিত ভগবদ্‌ভক্তি করিয়া ভক্ত

শ্রীরাজোবাচ।

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎ প্রিয়ঃ ॥৪৪॥

মুক্তির ইচ্ছা করেন না। তথাপি তাহার নিকট চারি প্রকার মুক্তি সর্ব্বদা দাস্য করে। ইহা ভগবানের নিজ মহিমা। ইহার আর তুলনা নাই। পুরুষোত্তমের প্রেমে মজিয়া ভক্ত পরমাত্মার গৌরব লাভ করেন। ভগবদ্‌ভক্তি অগাধ। ভক্তের প্রাপ্তিও উৎকৃষ্ট।

এই কথা শুনিয়া জনক রাজার চিত্ত আশ্চর্য্য চমৎকারিতায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলেন, ধন্য ধন্য ভগবদ্ ভজন। আনন্দে লুণ্ঠিত হইয়া তিনি শরীরে কম্প, রোমাঞ্চ ও নয়নে অশ্রু ধারণ করেন, আনন্দে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল তটস্থ থাকিয়া পুনরায় সুস্থ হইলেন। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। পুনরায় কাতর প্রার্থনায় আকুল হইয়া রাজা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—তখন ঋষিগণ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া রাজা বলেন,—যাহার পূর্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে এরূপ ভগবদ্ ভক্ত জগতে কিভাবে বিচরণ করেন তাহার সমস্ত লক্ষণ বিচার করিয়া বলুন ॥৪৩॥

ভক্তের পূর্ণ প্রাপ্তি অনায়াসে লাভ হয়, এই কথা শুনিয়া রাজার অত্যন্ত সন্তোষ। তাই ভক্তের লক্ষণাদি ক্রমানুসারে সব কিছু জানিবার জন্য প্রশ্ন করেন। বিদেহ বলেন,—হে প্রভো, মুনিপ্রবর পূর্ণ প্রাপ্তির কথা বলিলেন। সেই ভক্ত কিভাবে এই সংসারে অবস্থান করেন, তাহার লক্ষণ আমাকে শ্রবণ করাইবেন। ভক্তলক্ষণরূপ ভূষণদ্বারা আমার শ্রবণকে অলংকৃত করুন যাহাতে ঐ গুণাবলী শ্রবণে আমিও ভগবানের প্রিয় হইতে পারি। ভক্তের ধর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি, কিভাবে তিনি হৃদয়ে পুরুষোত্তমকে ধারণ করিয়া অবস্থান করেন, তাহার বলিবার ভাষা কি, কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার, হরিভক্ত শ্রীহরির প্রিয়তো অবশ্যই হইবেন, তবে তাহাদের সব কিছু লক্ষণ সমূল আমাকে উপদেশ করুন। বিদেহরাজের প্রশ্নে মুনিগণের সন্তোষ হইল। কবি মুনির অনুজ হরি নামক যোগীন্দ্র মধুর বৈখরী বাণীতে বলিতে লাগিলেন ॥৪৪॥

শ্রীহরিরুবাচ।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৪৫॥

হরি যোগীন্দ্র রাজাকে ভক্তের লক্ষণ ও স্থিতি সম্বন্ধে বলিলেন,—কেহ নগ্ন থাকেন, কেহ স্ব স্ব আশ্রম অনুসারে চলেন, কেহ সুস্থই থাকেন আবার কেহ উন্মাদের মত। কাহাকেও দেখা যায় সর্বদা গান করিতেছেন নৃত্য করিতেছেন, আবার কেহ মৌন হইয়াই থাকেন। কেহ হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন, কেহ নিজ কর্মেই নিযুক্ত থাকেন। কেহ প্রাণীগণের প্রতি দানধর্মে আবার কেহ ভজনে মগ্ন। এই প্রকার অনন্ত বৈচিত্র্য ভক্তের অবস্থা, বলিতে চাহিলেও বলা যায় না। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি মুখ্যভাবে, রাজন্, আপনার নিকট বলিলাম। পূর্ণ প্রাপ্তির অবস্থা সকল জীবের প্রতি ভগবদ্-ভাব, উহাই পূর্ণ ভক্তির নিজস্ব গৌরব। এই অভিপ্রায় হরি বলেন। সকল ভূতে আমি, ভগবান্, সকল জীব আমাতেই আছে, ভূতগণ ও তাহাদের আত্মা সকলই আমি, আমিই আত্মা, আমিই পরমাত্মা এই প্রকার পূর্ণ রূপে আমি-ভাব তাহাতে আত্মাভিমান বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সহজ ভাবে নিজ নিরভিমানিতাই শুদ্ধ লক্ষণ জানিবেন। শুদ্ধ ভক্তের নিজ লক্ষণ প্রত্যগাত্মায় আত্মানুভব, উহা গৌণ ভাবিয়া তাহার ভাবনা পূর্ণ করে। সর্বভূত ভগবান্‌ময়, ভূতগণ ভগবানে অবস্থিত, ভূত ও ভূতাত্মা সকলই তিনি, আমার আমিত্ব কিছুই নয়। সর্বজীবে ভগবান্ দর্শন, ভগবানের আশ্রয়ে সকল জীবগণকে দর্শন এই প্রকারে যে নিজের মধ্যেই সব কিছু দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে সে ভক্ত মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত; সে ভাগবতগণের মধ্যে বরিষ্ঠ, তাহার উত্তমতার মান—অবতার বলিয়া সম্মান। তিনি যোগীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, তিনিই জ্ঞানীগণের শিরোমণি, তিনিই সিদ্ধগণের মুকুটমণি এই কথা চক্রপাণি বলেন। যেমন ঘৃতের কণিকাও ঘৃত ভিন্ন নয়, সেই প্রকার পঞ্চ মহাভূত এবং পাঞ্চভৌতিক কোন কিছু ভিন্ন দেখা চলে না। এই উত্তম ভক্তের অবস্থা, হে রাজন্, আপনার সমীপে বর্ণনা করিলাম। অনন্তর মধ্যম ভক্তের ভজন-রীতি ও গতি শ্রবণ করুন ॥৪৫॥

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৪৬॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৪৭

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৪৮

পরমেশ্বরকে পরম উত্তম, তাহার ভক্তকে মধ্যম, অজ্ঞানীকে অধম এবং বিদ্বেষীকে পরম পাপী মনে করা হয়। ঈশ্বরে পবিত্র প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞানীতো কৃপার পাত্র, বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষাই করিবে। এই প্রকার মধ্যম ভক্তের ভক্তি। এই রীতিতে অনন্তর প্রাকৃত ভক্তের স্থিতি সম্বন্ধে আপনাকে বলিতেছি ॥৪৬॥

দেবতার পাষাণাদি প্রতিমায় যাহার দেবভাব পূর্ণ, কিন্তু ভক্ত সজ্জন সন্তকে দেখিয়া যে মস্তক অবনত করে না, সাধারণ লোকের কাছে তো কথাই নাই স্বপ্নেও কাহাকেও সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাকে প্রাকৃত বলিয়া জানিবেন। এই প্রকার অবস্থায় স্থিত যে জড়বুদ্ধি তাহাকে প্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে হইবে কেননা ইহারা প্রতিমা ভঙ্গ হইলেই মনে করে দেবতাও বুঝি শেষ হইয়া গেল। এই প্রকারে তিন শ্রেণীর ভক্তের কথাই বলা হইল তবে উহার মধ্যে উত্তম ভক্তের লক্ষণই অদ্ভুত, বলিতে বলিতে উহা হৃদয়ে উদয় হয় ॥৪৭॥

ইন্দ্রিয়ে বিষয় সেবা হইলেও সুখ দুঃখ যাহার হৃদয়ে উদয় হয় না, যে সমস্ত বিষয়-জগৎ মিথ্যা বলিয়া দেখে, তাহাকে নিশ্চিতভাবে উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবে। মৃগ জলে স্নান করিলেও যেমন শুষ্ক থাকে, সেই প্রকার ভোগ করিয়াও যে অভোক্তার মত সেই ভক্ত পরম শ্রেষ্ঠ। 'উত্তম ভক্ত বিষয় ভোগ করেন' এই প্রকার সাধারণ লোক বলিতে পারে, মনে করিতে পারে বটে কিন্তু তাহাদের ভোগ্য বিষয়ে বিষয় স্ফূর্তি হয় না, তাহাদের সমীপে ত্যাগও ভোগ উভয়ই মিথ্যা। স্বপ্নে কলা খাইতে মধুরস্বাদ হইলেও নিদ্রাভঙ্গে আবার খাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে, স্বপ্নের কলা হাতেও লাগে না

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসার ধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতঃ প্রধানঃ ॥৪৯॥

মুখেও উঠে না, তেমনিই হরিভক্তের বিষয়সঙ্গ কোনোমতে লাগে না। বিষয় ভান তো মিথ্যা, উহার ভোগ আবার কেমন করিয়া হইবে? তবে বলবান প্রারব্ধ বশে বিষয় ভোগের কিছু ভাগ তাহাদেরও থাকে। তবে আমি এক বিষয়ে ভোক্তা এই প্রকার কথা স্বপ্নেও তাহার মনে উঠে না। এইজন্যই তাহার উত্তম ভক্তভাব তত্ত্বতঃ প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে উত্তম ভক্ত বিষয়াসক্তির মধ্যেও অবস্থান করে, তাহার গভীরভাব বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৪৮॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আর প্রাণ এই পাঁচটি বন্ধনের পঞ্চায়তন। ইহার মধ্যেই আছে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ক্লেশ জন্ম মরণ ইত্যাদি। এই পাঁচটিকে লইয়াই অফুরন্ত পরিশ্রম, আর ইহারই নাম সংসার ধর্ম্ম। ভগবানের ভক্ত আত্মারাম, তাহার ভবভ্রম স্বপ্নেও নাই। দারুণ ক্ষুধা উদয় হইলে প্রাণ অন্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া পীড়া প্রদান করে কিন্তু ভক্তের হরিস্মরণে এরূপ অগাধ ভাব যে তাহার সেই ক্ষুধাও স্মরণে আসে না। ভাবের সহিত ভগবদ্‌ভক্তি করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার স্ফূর্ত্তি হয় না, এই প্রকার অগাধ প্রাপ্তি যে ভবভয়ে তাহাকে কাতর করে না। মনের মধ্যে ভবভয় কি করিয়া স্থান পাইবে, মন যে নিরত হইয়া আছে হরিচরণে, অতএব ভয়ের আর কারণ কোথায়? মন তো আর মনে নাই। মনে যদি দ্বৈত স্ফূর্ত্তি থাকিত তবেই ভবভয় স্থিতি সম্ভব হইত। সেই যে মনে হরির অবস্থান, অতএব দ্বৈত ভানের সহিত ভয় নিবৃত্তি হইয়া যায়। দেহবুদ্ধি হইতেই নানা প্রকার তৃষ্ণার উদ্‌গম। বুদ্ধি নিশ্চিতভাবে হরির চরণে স্মরণে রাখিলে উহা তল্লীন হইয়া যায়। যে দিক দিয়া যে তৃষ্ণার উদয় হউক না কেন সর্ব্বদিকে নারায়ণ প্রকাশ হওয়ার ফলে তৃষ্ণা বিতৃষ্ণ হইয়া পূর্ণতায় লয় হয়। অতএব তৃষ্ণারহিত ভগবদ্‌ভক্ত হরি স্মরণে ইন্দ্রিয় ক্লেশ সম্বন্ধে অলিপ্ত থাকে তাহা বলি, রাজন্, শুনুন।

ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মই ক্লেশের প্রধান অধিষ্ঠান। সেই ইন্দ্রিয় কর্ম্মগুলি হরি-ভক্তের পূর্ণ হরিভজনে ব্রহ্ম স্ফুরণ। দৃষ্টি দর্শন করে, দৃশ্য মধ্যে নারায়ণকে; শ্রবণ শব্দগ্রহণ করে শব্দার্থে সেই বস্তুই পূর্ণরূপে অবস্থান করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নানা গন্ধ গ্রহণ করে কিন্তু গন্ধানুভবে পরমেশ্বরই প্রকাশিত হইয়া পড়েন। রসনা যে যে রস সেবন করে সকল রসে ব্রহ্মরস নিজেরই স্বাদে নিজে প্রকট হন। দেহে শীত উষ্ণ বোধ হয় অথবা কোমল কঠিন অনুভবে স্পর্শজ্ঞান, উহাতেও স্বয়ং চিন্মাত্রই প্রকাশ হয়।

অনন্তর কর্ম্মেন্দ্রিয় বৃত্তি, উহাতেও ব্রহ্ম স্ফূর্তি হয়—দেওয়া নেওয়া আসা যাওয়া ইন্দ্রিয়ের গতি আত্মারামের আনন্দে। এই প্রকারে কষ্টের মধ্যেও আত্মসুখ প্রকাশিত হয়। হরিভক্তের সমীপেই ইন্দ্রিয়গণ সুন্দর বিশ্রাম লাভ করে, তাহারই সমীপে পাকা আনন্দের বাজার বসে। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের কষ্ট উৎপন্ন হয় হরিভক্তের তাহাতেই ইন্দ্রিয়ের সুখ উৎপন্ন হয়। সে ভগবদ্‌ভজনে নিজের যুক্তিমত হরির স্মরণেই হরিভক্তির আনন্দ লাভ করে। জন্ম মরণ দেহের ধর্ম্ম জানিয়া ভক্ত দেহে থাকিয়াই বিদেহীর আনন্দে হরিচরণ ধ্যান প্রভাবে হরিরূপতা লাভ করে। এজন্য দেহ সম্বন্ধে অহংতা ভগবদ্ ভক্তের কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না। ভক্তের কথা, হে রাজন্, শ্রবণ করুন। দেহটিকে সিংহ ব্যাঘ্র আক্রমণ করিলেও ভক্ত কিছুমাত্র চঞ্চল হয় না কারণ বন্ধ্যা পুত্রকে শূলে চড়াইবার কথার মতই দেহের মৃত্যুকে সে মিথ্যা বলিয়া জানে। নিজের ছায়াকে পাল্কীতে বসাইয়া যেমন কোনো চিন্তা স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীবন বা দেহ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র মনের লোভ তাহার থাকে না। দেহের উপর নানা প্রকার বিপদ আসিলেও ভক্ত কিছুমাত্র খেদ করেন না, যেমন আকাশে শস্ত্রাঘাতে কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা হয় না। জননীর উদরে দেহের জন্ম হয়, ভক্ত বলে না আমার জন্ম হয়—কেননা ডাবরের জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বকে কেহ সূর্য্য বলে না। সকাল সন্ধ্যায় সূর্য্যের প্রকাশ অভ্র গন্ধর্ব্ব নগর সৃষ্টি করে অদৃষ্টও দেহকে সেই অভ্র পটল রচিত গন্ধর্ব নগরের মতই প্রতিপালন করে। আমি দেহকে পালন করিতেছি। ভক্ত এরূপ ভাবনা করে না। ভক্ত দেহের পতন হইলেও হেতুরহিত হরি স্মরণ চলিতে থাকে কাজেই দেহ গেলেও তাহার মরণ হয় না, পূর্ণই পূর্ণ হইতে চলিয়া যায়। ডাবর

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫০॥

সমূলে ধ্বংস হইয়া গেলেও সূর্য্য অস্ত যায় না। সেই প্রকার দেহ গেলেও ভক্ত সৎস্বরূপে হরিস্মরণে মিলিত হইয়া থাকেন। রজ্জুতে ভান সৃষ্টি সর্পকে প্রথমে আঘাত করিয়া ভয়ে দৌড়াইলেও রজ্জু তাহার স্বরূপ ত্যাগ করিবে না—যে রজ্জু সে রজ্জুই থাকিবে। সেই প্রকার হরিভক্তের দেহের অভাব হইলেও কাল তাহাকে আঘাত হানিতে পারে না। অতএব যে আমি সেই আমি ব্রহ্মরূপই আছি। তবে সেই ব্রহ্মস্বরূপে মিথ্যা আমি ভাবের অভিমানটিই ব্যর্থ। এইসব দেহধর্ম্ম বা কর্ম্মাকর্ম্ম যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মোহে যাহার সংসার ভ্রম উৎপন্ন করে না তিনই ভক্তোত্তম। হে রাজন্, ভক্তের এই এক চিহ্ন বলিলাম আপনার সমীপে, সংপূর্ণরূপে বলিব যাহার কামনা শ্রীনারায়ণে, এই লক্ষণে ভক্ত অবধারণ করিবেন ॥৪৯॥

আত্মারাম চিন্তা করিয়া যাহার কামনা তন্ময় হইয়াছে, তাহার সকল কর্ম্ম পুরুষোত্তমেয় দেবদেবোত্তমের তুষ্টির বিধান করে। যে যে বাসনা হৃদয়ে বাস করে সকলকে হরিমুখী করিয়া ফিরাইয়া দেয়। এই প্রকারে বাসনা সমূহ হরিরূপেই লগ্ন হইয়া যায়। হরি আশ্রয়ে তাহারা দৃঢ়রূপে ধারণ করে। তখন ভক্তের যত যত কাম সকলই আত্মরাম সম্বন্ধে হয়। বাসনার নিজের মর্য্যাদা স্বয়ং পুরুষোত্তমের সঙ্গে হয়। জগতে হরিভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তখনই বলা যায়। ভক্ত কামকে নিষ্কাম করেন। একটির পর একটি বাসনার অনুক্রমকে চালিত করিয়া তিনি বাসনাহীন ব্রহ্মস্বরূপতা প্রকাশ করেন। প্রতি গ্রাসে রাম স্মরণ করিয়া অন্নকে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে মুক্তপ্রাণ ভক্ত ভোগ করেন। হে বিদেহরাজ, ভক্তের এই রীতি। এই প্রকার নিষ্কাম ভাবনিষ্ঠ ব্যক্তি ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাকেই প্রধান বরিষ্ঠ উত্তমোত্তম জানিবে। উত্তম ভক্ত কি ভাবে চলেন, তাহার স্থিতি কিরূপ, উহা তিনটি শ্লোকে আপনাকে বলিলাম। উত্তম ভক্ত কোন্ গুণে ভগবানের প্রিয় হয়, সেই লক্ষণ বলিতেছি, এই কথা উল্লাসে হরি বলিলেন ॥৫০॥

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥৫১॥

প্রাকৃত দেহাভিমান ত্যাগে গুরুকৃপায় ভজনে তাহার অভিমানশূন্য অবস্থায় নারায়ণ ভাবনা হয়। আমি দেহ ইহা যে মূলেই মিথ্যা আর আমি নারায়ণ এই কথাই যে তত্ত্বতঃ সত্য, এরূপ দৃঢ় ভাবনায় অভিমান দূর হইয়া যায়। অভিমান হরিচরণে লীন হওয়ার ফলে ভক্ত একান্ত নিরভিমান হইয়া যায়। তাহাই নিরহংকারের লক্ষণ। হরি সম্পূর্ণরূপে বলিলেন, নিরহংকারের ভাব এই যে, "জন্ম হইলেও আমি জন্মগ্রহণ করি নাই"। সোনার কুকুর তৈরী করিলে সঙ্গে সঙ্গে আকারের সোনা কুকুর হইয়া যায় না তাঁহার উত্তম ভক্ত সেইরূপ জন্মাদি কখনও গণনা করেন না। কাম ও ক্রিয়ার নির্ব্বাহক আমি কর্ত্তা বলিয়াও নিজেকে মনে করেন না। কর্ম্ম করিয়াও তিনি বলেন না আমি কর্ত্তা। যেমন গগনে সূর্য্যের উদয়ে সূর্য্যকান্তমণি অগ্নি উৎপাদন করে, তেমনি অকর্ত্তা হইয়া আত্মদর্শনেই ভক্ত লাগিয়া থাকেন। সূর্য্যের উদয়ে সূর্য্যকান্তমণিজাত অগ্নিতে যজ্ঞাগ্নি সৃষ্টি হইল কি দাবাগ্নি সৃষ্টি হইল তাহাতে যেমন সূর্য্যের গায়ে তাপ লাগে না সেইরূপ সবকিছু করিয়াও ভক্ত সূর্য্যের মত চিরশুদ্ধ অকর্ত্তা। অচেতন লৌহখণ্ড চুম্বকের আকর্ষণে চলে, লৌহের চঞ্চলতায় চুম্বকের কিছুই হয় না সেইরূপ সকল কর্ম্ম করিয়াও অহংকার ত্যাগে ভক্ত অকর্ত্তা। দেহের কর্ত্তা অদৃষ্টের ফল অতএব আমি কর্ত্তা এই কথা বাধা সৃষ্টি করে, ভক্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে নিরহংকার, ভজনযোগে পরমাত্মপ্রতীতিবান। এই প্রকারে দৈহিক কর্ম্মসম্পাদন করিয়া পূর্ণ প্রতীতিতে ভক্ত অকর্ত্তা। কর্ম্ম বা অকর্ম্মের অবস্থা তিনি শিরে ধারণ করেন না কারণ তিনি নিরহংকার। যদি উত্তমবর্ণে জন্ম হইয়া থাকে তথাপি তিনি বলেন না আমি ব্রাহ্মণ। কুম্‌কুমে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখায় তাহা বলিয়া স্ফটিক বলে না আমি লাল হইয়া গিয়াছি। যাহার দেহাভিমান নাই সে দেহ সম্বন্ধে বর্ণ বা আশ্রমের অভিমান জ্ঞানবান ভক্ত কখনো হৃদয়ে ধারণ করেন না। দেহে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি বলেন না আমি পরমহংস। যেমন নটের অঙ্গে রাজপোষাক নটের মনে রাজার উল্লাস জাগাইতে পারে না সেইরূপ আশ্রমোচিত বেশভূষার কথা

বা জাতির কথা কিছুই ভক্ত হৃদয়ে স্থান দেন না। উচ্চ নীচ অসংখ্য জাতি আছে কিন্তু ভক্ত বলে না আমি এই জাতির লোক। গঙ্গাতীরে বহু গ্রাম আছে তাহা বলিয়া গঙ্গার স্রোতোমধ্যে গ্রাম থাকে না, সেইরূপ জন্ম কর্ম্ম বর্ণ আশ্রম জাতি কোনোটাই ভক্তকে স্পর্শ করে না। এমন কি দেহ সম্বন্ধে অহংকার হরিভক্তের স্বপ্নেও হয় না। আশংকা হয়, তবে কি ভক্ত বর্ণাশ্রম জাতি নিঃশেষে পরিত্যাগ করে? তাহা নয়। সেই সব জাতি বর্ণ থাকা সত্ত্বেও ভক্তের সেই সব বিষয়ে মোটে অহংভাব থাকে না, ইহাই পূর্ব্বোক্ত কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। যেখানেই জন্ম হউক, জন্ম কুল গোত্র বা জাতির অভিমান তিনি করেন না। এই অহংকার ব্রহ্মাদিকেও বন্ধন করিয়া বর্ণাশ্রম জাতির বৃদ্ধি করিয়া সকলকে অভিমানে বন্ধন করে। অহংকারের এরূপ দুর্ব্বার গতি যে ব্রহ্মাদিরও উহা নিবৃত্ত হয় না, কল্পান্তেও উহাকে ছাড়া যায় না। ভক্তের ভাবাবস্থিতিতে ভক্তির প্রভাবে অভিমান দূর হইয়া ভক্তস্থিতি লাভ হয়। মূল সহ দেহাভিমান যাহার থাকে না তিনি দেবতার অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের লাল্য হইয়া থাকেন। তিনি কৌতুকবশে যাহা অভিলাষ করেন তাহাই তখন তাহার দেবতার অনুগ্রহে লাভ হয়, দেবতার পরম সন্তোষে তিনিও পুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি যেখানে যেখানে যান দেবতা তাহাকে নিজের অঙ্গ আবরণে রক্ষা করেন। ভক্ত যেখানে যাহা ইচ্ছা করেন বা দেখেন দেবতা সেই সকল পদার্থ হইয়া যান। ভক্তের যে দিকে দৃষ্টি পড়ে ভগবানও উহা চান। ভক্তের সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ভগবান থাকেন। ভক্তের ইচ্ছায় ভুলিয়া চলেন। নিরভিমানের নামে নিজের সন্তানের প্রতি জননীর মত হইয়া আসিয়া ভগবানই তাহার সকল কাজ করিয়া দেন। এই প্রকারে তিনি নিজ ভক্তকে রক্ষা করেন। তখন ভগবানের মনে এই এক ভয় উৎপন্ন হয়—ভক্ত যদি আমার সঙ্গে এক হইয়া যায় তবে আমাকে প্রীতি করিবে কে? কে আমার কৃপা দৃষ্টির জন্য চাহিয়া থাকিবে? কাহার কাছে আমার নিজজনের কথা বলিয়া সুখী হইব? কাহাকে জড়াইয়া চারিহাতে আলিঙ্গন করিব? এই প্রকার তাহার প্রেমের রুচি। শ্রীঅনন্ত ভক্তকে ঐক্যভাব প্রদান করিয়াও এই ভাবে আকুলতা প্রকাশ করেন। তবে দেবতা ও ভক্ত এই দুইএর মধ্যস্থ হইয়া দেবতা আত্মানন্দে সুখে থাকেন। এই প্রকার নিজেকে নিজে অনন্ত ভক্তি প্রীতি করে—

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫২॥

ইহা বেদান্তীর নিরূপণ। ইহার নাম অদ্বৈত ভক্তি। তাহাকে চারিভুজে আলিঙ্গন করিয়া দেবতার পরম তৃপ্তি হয় না। সত্য বলিতে কি তাহার অন্তরে বাহিরে সর্বাঙ্গে মনে প্রাণে পরমার্থতঃ আলিঙ্গন করেন দেবতা। এই প্রকার প্রেম আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে ভক্তকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া ভগবান্ তাহাকে অন্তরে বাহিরে প্রেম দিয়া পূর্ণ করেন। দেবতার প্রেমে স্বরূপটি নতুন বলিয়া প্রতিভাত হয়, ভক্তের উপর কালের প্রভাব পড়ে না। দেবাধিদেব তাহার ভক্তের শরীরে নতুন হইয়া প্রকাশিত হন। এই প্রকার রুচি যে ভক্তের প্রতি হয়, তাহাকে ভাগবতগণের মধ্যে উত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে। তাহার ভাগবতধর্ম্ম পুরুষোত্তম বশকারী। এই প্রকার উত্তম ভক্ত ভেদের বার্ত্তাও জানে না। সেই অভেদ ভক্তকথা, হে, রাজন্, বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৫১॥

অদ্বৈত ভজনযোগে আমি এবং আমার, তুমি এবং তোমার বলিয়া কোনো ভেদ বুদ্ধি না থাকিলে তাহাকে উত্তম ভক্ত জানিবে। এই ভাবে যাহার হৃদয়ে ভেদ মূল থাকে না তাহার আর আমার তোমার বোধ কোথায় থাকিবে? সে যা আছে তাহাই থাকে অর্থাৎ নিরভিমান তন্ময় হইয়া থাকে। যে অগ্নিতে প্রবেশ করে সে যেমন অগ্নিময় হইয়াই থাকে সেইরূপ তাহার অবস্থা। অভেদ ভক্ত যাহা যাহা দেখে উহা সবই স্ব-স্বরূপই দেখে। নিজের দ্রব্য অপরের হাতে তুলিয়া দিতে তাহার চিত্তে শংকা জাগে না। সে পর বলিয়া কাহাকেও জানেও না। তাহার মনে কোনো বিকল্প উপস্থিত হয় না। এক হাতে গ্রহণ করে অন্য হাতে দান করে—কে গ্রহণ করিল কে দান করিল ইহার কোনো ভেদ বুদ্ধি থাকে না। তাহার কাছে সকলেরই একাত্মতা অনুভব। এইরূপ আপনার মধ্যেই সমস্ত প্রাণীকে দেখিয়া ভক্তের কাছে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু অনুভব হয় না বলিয়া তাহারই সমীপে শান্তি এবং আত্মানন্দের নিঃশংক স্থিতি। এই প্রকার নিজসম শান্তিতে ভগবদ্-ভক্ত ক্রীড়া করেন যে জন্য নিশ্চিত রূপে তাহাকে উত্তম বলা যায়। হরিভক্তের নিরপেক্ষতা, হে রাজন্, বলিতেছি শুনুন। উত্তম ভক্তের কথা বলিতে বড়ই

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥৫৩॥

আনন্দ হয়। নিরপেক্ষই প্রধান ভক্ত, নিরপেক্ষই অতিশয় বিরক্ত, নিরপেক্ষতো নিত্যমুক্ত, কারণ সত্যস্বরূপ ভগবান নিরপেক্ষ ॥৫২॥

প্রেমের সহিত ভক্তি করিয়া হরিচরণে চিত্ত লাগাইলে নিজের স্বার্থের জন্য অতি প্রীতি ও আত্মনিষ্ঠা হইলে তাহার সমীপে ত্রিলোকের সকল সম্পত্তি আসিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলেও তাহার চিত্তবৃত্তি ক্ষণার্দ্ধের জন্যও বিচলিত করিতে পারে না। ভক্ত পরমার্থের প্রতি অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া থাকে। ক্ষণার্দ্ধ চিত্তবৃত্তি ভগবান হইতে অন্যত্র লাগিলে ত্রিলোকের সম্পদ তাহার হস্তগত হয় এ অবস্থায় এত বড় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া হরিভক্তের কি লাভ? এই প্রকার শঙ্কার উত্তরে বলি, হরিচরণে ক্ষণার্দ্ধ কালের জন্যও যে অপরোক্ষ স্থিতি, তাহার সমীপে ত্রিভুবনের সম্পত্তি তৃণের মত বিবেচনা করেন। সকল জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা পিতামহ, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য বস্তুত তাহার অঙ্গনে গড়াগড়ি যায়, ত্রিভুবনে বৈভবের শিরোমণি ব্রহ্মার পদের সামর্থ্য—সেই ব্রহ্মাই নিজ স্বার্থের জন্য হরিচরণ ধ্যান করেন। ব্রহ্মার ভোগ্য বৈভব ত্যাগ করিয়া তিনি একান্তে বসিয়া নিশিদিন হরির চরণ চিন্তা করেন, তথাপি সেই প্রাপ্তি সহসা হয় না। সহসা হরিচরণ পাওয়া যায় না, এজন্য ব্রহ্মার অভিমান। তাই অভিমানে গোপাল ও বৎস চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতে প্রভুর কোনো কষ্ট হইল না। কৃষ্ণত্বও কোনোরূপে ব্যাহত হইল না। গোপাল ও বৎস যেমন ছিল তেমনই দেখা গেল, পূর্ণের পূর্ণত্বই রহিয়া গেল লীলায়। হরিলীলা অগাধ পূর্ণ দেখিয়া ব্রহ্মা মোহিত হইয়া গেলেন। তখন পদাভিমান পরিত্যাগ করিয়া হরিচরণে অনন্যশরণ হইলেন। কৈলাসনিকেতন শূলপাণি, ব্রহ্মা যাহার চরণে প্রণত, তিনিও নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহাশ্মশানে হরি চরণ চিন্তা করেন। কৌপীন ভস্ম জটাধারী চরণোদক শিরে ধারণ করিয়া হৃদয় মধ্যে হরিচরণ নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। এই ভাবে ব্রহ্মা ও শঙ্কর তাঁহার চরণ মহিমার অন্ত পান না। এই অবস্থায় ত্রৈলোক্য বৈভবকে

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা
নখমণি চন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥৫৪॥

যে বড় বলিয়া মনে করে সে অত্যন্ত পামর মন্দভাগ্য। ক্ষণার্দ্ধের জন্য হরিচরণ প্রাপ্তির সমীপে ত্রৈলোক্য রাজ্য সম্পৎ অতি তুচ্ছ, তাই ভক্ত অনায়াসে ইহা ত্যাগ করেন। হরিচরণামৃতসার মাধুরী ক্ষণার্দ্ধ যাহার লাভ হয় সেই ভক্ত ত্রৈলোক্য বৈভবের কিছুমাত্র মনে স্থান দেন না। এই হরিচরণামৃতসার হইতে অন্য কোনো সার বস্তু নাই এজন্য ধন মন প্রাণ দিয়া সুনিশ্চিত ভাবে ভক্ত হরি চরণারবিন্দে মিলিত হইয়া থাকে। নিমেষার্দ্ধ ত্রুটি লব ক্ষণের নিমিত্তও যাহারা হরিচরণ ছাড়া হয় না, তাহারাই বৈষ্ণবগণ-মধ্যে অগ্রগণ্য—হে রাজন্, তাহাকেই উত্তম ভক্ত বলিয়া জানিবেন। যাহারা ত্রিভুবনের সকল বৈভব ভোগ করিয়াও অনুতাপই করিয়াছেন, তাহাদের তাপ নিবৃত্ত হইযাছে হরিচরণ প্রাপ্তিতে, উহা শুনুন ॥৫৩॥

শ্রীহরির চরণমহিমা অসীম। ত্রিবিক্রম পদদ্বারা ত্রিলোক আবৃত করেন। ব্রহ্মাণ্ডসীমা ভেদ করিয়া পদতরু বৃদ্ধি পাইয়াছে পরম সামর্থ্যে। সেই পদক্রমের দশটি শাখা, দশ দিকে পদের অঙ্গুলি দশটি, তাহার অগ্রভাগে অগ্রফল চন্দ্র জ্যোৎস্না নখমণি পরম দর্শনীয় শোভা ভাণ্ডার। সেই নখ-চন্দ্রিকার চন্দ্রকান্তমণিতে চরণচন্দ্রামৃত নিত্য প্রবাহিত। ভক্ত চকোর উহা সেবন করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে তৃপ্ত হন। তাহাকে কামাদি ত্রিবিধ তাপযোগ কোনো প্রকারে আর পরাভূত করিতে পারে না, যেমন সূর্য্যের তাপযুক্ত-কিরণ চন্দ্রবিম্বের মধ্যে কখনও তাপ সৃষ্টি করিতে পারে না। যাহারা সেই চরণচন্দ্র চকোর তাহারা স্বপ্নেও সংসার তাপগ্রস্ত হয় না, এই প্রকার অপার মহিমা সেই চরণের, হরি মুনীশ্বর হর্ষে ইহা বর্ণনা করেন। "দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ" শ্লোকে উক্ত ভক্তি লক্ষণ ও ক্রিয়া যাহা বলা হইয়াছে উহা নিশ্চিত। "ন যস্য স্বঃ পর ইতি" শ্লোকে তাহার যে প্রকার ধর্ম্মস্থিতি, হে রাজন্, আপনাকে বলা হইয়াছে, উহা যথার্থই বলা হইয়াছে। "যাদৃশ" অর্থাৎ কি প্রকারে আছে। ভগবদ্ ভজনে স্বানন্দ তৃপ্তি ত্রিবিধ তাপের নিবৃত্তি করেন

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ
হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে নারদ-বসুদেব সংবাদে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

হরিভক্ত। তাহাদের বলার সময়, চলার সময় কি ভাবে হরি নামের ধ্বনি হয়, সেই কথা হরিযোগীন্দ্র সংক্ষেপে বলেন। সকল লক্ষণের সারকথা প্রেমময় ভক্তে সীমাহীন প্রেমকথা শ্রীপতি যাহা কোনোমতে লঙ্ঘন করিতে পারেন না, সেই শ্লোকের অর্থ হরি বলেন ॥৫৪॥

আচমকা মুখে হরি শব্দ উচ্চারিত হইলেই সকল পাপ দূর হইয়া যায়। সেই হরিনাম যাহারা নিরন্তর উচ্চারণ করেন হরি নামও আপনি উচ্চারিত হইতে থাকেন। যাহাদের জিহ্বায় নাম নিরন্তর নৃত্য করিতে থাকে তাহারা এই সংসারে ধন্যাতিধন্য—হরি এই কথা তারস্বরে ঘোষণা করেন। প্রেমের সহিত সদ্‌ভাবপূর্ণ হইয়া নিত্য নামস্মরণ পূর্ব্বক যিনি নিজের স্বভাব রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন, তাহার লক্ষণ শুনুন। নামের সঙ্গে সঙ্গে হরিও হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করেন। তাহার প্রভাবে অন্তরে অন্তরে পরম শুদ্ধি হইতে থাকে। তখন বাসনা প্রপঞ্চ ত্যাগ করে জনার্দ্দনে লগ্ন হয়, অহংভাব অহংকার ত্যাগ করিয়া সোঽহং ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে। চিত্ত তাহার বিচার প্রবণতা ত্যাগ করিয়া ভগবানে আশ্রয় লয়। মনের মনোগততা মনন সংকল্প বিকল্প ভুলিয়া যায়। কৃতনিশ্চয় বৃত্তি বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া সমাধি লাভ করে। এই প্রকার হৃদয়শুদ্ধি দেখিয়া ভগবান্ আর বাহিরে থাকিতে পারেন না। হরিনাম প্রেম প্রীতিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীহরি ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, ভক্তপ্রীতিকারক কৃপালু হরি বাহিরে আসিবার কথা ভুলিয়া থাকেন। ভক্ত প্রণয় প্রীতির রজ্জুদ্বারা তাহার চরণ ধরিয়া নিজের হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখেন। তবে আর কিরূপে হরি বাহির হইয়া আসিবেন? ভগবান মহাবলবান, কত বিক্রমী দৈত্য দানবকে নির্দ্দলন

করেন, সেই ভগবানকে ভক্ত হৃদয় কমলে বাঁধিয়া রাখিলেন, এই কথা যেন মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। তাহা নয়, কেন না দেখা যায় শুষ্ক কঠিন কাষ্ঠকে ভেদ করিয়া যে ভ্রমর বাহির হয় সেই ভ্রমরই আবার কমলের কোমল বন্ধনে প্রীতিতে বাঁধা পড়ে, কেশরগুলি তাহাকে পূজার অবসর দেয় না। সেই প্রকার ভক্তের পরম প্রেম প্রীতি শ্রীপতি হৃদয়ে রাখিয়া সকল শক্তি হারাইয়া ফেলেন, প্রেমের কাছে বল চলে না। বালককে লালন করিতে যাইয়া বালক কর্ত্তৃক আহত হইলেও পিতা অবিচলিত থাকেন, তাহা বলিয়া তিনি দুর্ব্বল একথা বলা যায় না, কেবল বালকের স্নেহে মুগ্ধ তাই তাহার ক্রোধহীনতার কারণ। সেই প্রকার নিজ ভক্ত লাল্য, তাহার প্রেম অত্যন্ত মধুর, তাহার সমীপে পরাজয়ের লজ্জা ভুলিয়া ভগবান আনন্দ অনুভবেই তাহার অন্তরে আবদ্ধ থাকেন। এই প্রেমপূর্ণ অন্তঃকরণ শ্রীহরি নিজে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করেন না। আর ভক্তও হরির শ্রীচরণ প্রেমের পূর্ণতায় ছাড়িয়া দেয় না। হরির প্রতি যাহার যেরূপ প্রীতি হরিও তাহার প্রতি সেইরূপ প্রীতি করেন। যাহার অনন্যভাবে হরির সমীপে অবস্থান, হরিও তাহার প্রতি সর্ব্বদা অনন্য ভাবে অবস্থান করেন। এই ভাবে হরি চরণে অনন্য ভাব যাহারা তাহারাই ভক্ত মধ্যে প্রধান, বৈষ্ণবগণের অগ্রগণ্য—তাহারাই ভাগবতোত্তম। তাহারা ভগবদ্‌ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া চারি প্রকার মুক্তিকে গৌণ বিবেচনা করেন। এই উত্তম ভক্তের স্থিতি, হে রাজন্, আপনার সমীপে সংক্ষেপে বলিলাম! পূর্ণরূপে ভক্তির নিরূপণ বলিতে গিয়া বেদও মৌন হইয়া যায়, সহস্র মুখে ও জিহ্বায়ও শেষ নাগ উহা বর্ণন করিতে গিয়া স্তব্ধ হইয়া যান। সেই ভক্তির একটি অংশ তোমার সমীপে বর্ণনা করিলাম ইহার পর পরিপূর্ণতা স্বভাবত তুমি জানিয়া লইবে। হরির ন্যায় রসাল বক্তা উত্তম ভক্তের কথা বলিতেছিলেন, সকলে তাহার ভাবার্থ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তখন রাজাকে দেখা গেল রোমাঞ্চিত হইয়াছেন, তাহার প্রতিটি রোমকূপে ঘর্ম স্বেদ উদ্‌গম হইয়াছে, শ্রবণসুখে মগ্ন হইয়া রাজা আনন্দে দুলিতে লাগিলেন। মনে পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিয়া বলেন,—মুনি, আমার বড় উপকার করিলেন, খুব মহৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে আপনার কথা শুনিয়া শ্রবণ ইন্দ্রিয় অতৃপ্তই রহিয়া গেল।

হরিমুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে ভাবেন—এই যোগীন্দ্রগণ

সকলেই অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ বক্তা। ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করিয়া ইহাদের সকলের কথা শুনিব। এই প্রকার শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া রাজা পুনরায় অনুপম প্রশ্ন করেন। রাজার কথা সঙ্কোচপূর্ণ, পুনরায় মধুর সুস্পষ্ট প্রশ্ন করিলে উহা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের অত্যন্ত আনন্দ হইল। সেই প্রশ্নের শুদ্ধজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করিয়াছি, আমার বদনে বক্তা জনার্দ্দন করুণায় যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিবেন। বাঁশের বাঁশীতে নানারূপ মধুর ধ্বনি বাজে, উহা বাদকের চাতুর্য্যেই ঐরূপ বাজে, সেই প্রকার জনার্দ্দনের (গুরু) কৃপায়ই গ্রন্থার্থ বর্ণনাকারী একনাথ কবি বা গ্রন্থকর্ত্তা হইয়াছে॥৫৫॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

রাজোবাচ।

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ ॥১॥

শ্রীগণেশকে নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।
ওঁ নমস্কার শ্রীগুরুরাজকে।

সদ্‌ভাবে চরণে লাগিয়া থাকিলেই আমি-ভাব ও তুমি-ভাব দূর হইয়া যায়। চরণের কঠিনতা অভিনব। লিঙ্গদেহকে বজ্রও ধ্বংস করিতে পারে না—তাহাও চরণে লাগিলে অবলীলাক্রমে চূর্ণ হইয়া যায়। ঐ চরণে লাগিয়া বলির পাতালে গমন হইয়াছে। ঐ চরণের অতুলনীয় শক্তিতে লবণাসুর পরাজিত হইয়াছে। অতিশয় তীক্ষ্ণ কালিয়নাগ ঐ চরণে পড়িয়া তাহার সকল বিষ নিঃশেষে হারাইয়া নির্বিষ হইয়াছে। অতিশয় দারুণ চরণে লাগিয়া শকটের গুণবন্ধন ও গমনাগমন ছুটিয়া গেল। পায়ের সবল চাপে পড়িয়া অহল্যাশিলা উদ্ধার লাভ করিল। অভিশপ্ত নৃগরাজ ঐ চরণ দর্শন করিয়া সংসার বন্ধন মুক্ত হইল। রুচির সহিত এই চরণ চিন্তায় দাসের মনুষ্যধর্ম্ম নাশ হইয়া যমলোক পার হইয়া জীবের জীবাভিমান দূর হইয়া যায়। চরণতীর্থ মস্তকে ধারণ করিলেন শিব, যাহার স্পর্শ পাইয়া মৃত সগরসন্তানগণ প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিল। তাহাদের দেহের ভস্ম ভক্তিভাবে অঙ্গে ধারণ করিয়া নগ্নমূর্ত্তি শিব শ্মশানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ চরণের মহিমায় শিবকে আর শিবাভিমান রাখিতে দেয় না, জীবের জীবাভিমান আর থাকিবে কি করিয়া? অতএব জীবশিব অভিন্ন মনে করা না করা হৃদয়ে স্থান পায় না। এই প্রকার ভাব জানিয়া একা তাহার একনাথ অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছে। চরণের চমৎকারিতা যে বন্দনামাত্রই অদ্বৈতভাব অভিমান তাহার ব্যর্থ হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কেমন করিয়া স্তুতি করে,

কেমনে কে কাহার সমীপে বিনয় নিবেদন করে, কেমন করিয়া দেওয়া নেওয়াই বা চলে। "আমি" "তুমি" ভাব যাহার রহিল না তাহার আর কি রহিল? তবে দেবতা ও ভক্ত এই দুইভাবে তুমিই আমাকে দেখ না কেন? তবে আমার আমি ভাবটা কোথায় রাখিব? তুমিই আমার মাধ্যমে এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত করাইতেছ। হে সদ্‌গুরুরাজ, এই গ্রন্থে কবি কর্ত্তা আমার নামে বস্তুত তুমিই! আমার নাম ও রূপ এক, উহা জনার্দনেরই হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে জনার্দ্দনের আর একার বেশ ঐক্য সম্বন্ধে কৌতুক আছে। সেই কৌতুকের মধ্যেই আমার নামে কবি ও কর্ত্তা স্বয়ং জনার্দ্দনই নিজ জ্ঞানে যথার্থত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেইজন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তে দুস্তর মায়া কিভাবে উত্তম ভক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, তাহা নিরূপণ করা হইয়াছে। হরির মায়া কিরূপ দুস্তর আদর পূর্ব্বক রাজা উহা জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর্য্য অবধারণ পূর্ব্বক অতি আদরে উহা বলেন।

তৃতীয় অধ্যায় নিরূপণে রাজা চারিটি প্রশ্ন করেন: (১) মায়া, (২) তাহা হইতে নিস্তার, (৩) ব্রহ্ম কে ও (৪) কর্ম্ম কিরূপ? উহার মধ্যে মায়ার প্রশ্ন রাজা নিজে জিজ্ঞাসা করেন, মায়ার লক্ষণ রাজা বলেন, দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৃষীকেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহাকে বন্দনা করেন, সেই শ্রীবিষ্ণুর মায়া কি প্রকার? যে মায়া সকলকে মোহিত করে। কি প্রকার মায়াবীর মায়া মোহিত করে? ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি মনে করেন আমরাই পূর্ণরূপে মায়ার নিয়ন্তা, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত যে মায়া মোহিত করে তাহার পরিচয় কি? শিবের বিবাহের সময়ে পার্বতীর সৌন্দর্য দেখিয়া ব্রহ্মা মোহিত হন, আবার জ্ঞানীগণের শ্রেষ্ঠ মহাদেবের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন। জ্ঞানবান ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে যে ছলনা করিয়া মোহিত করে, যাহার নামই অজয়া, সেই শ্রীহরির দুর্দ্ধর্ষ মায়া বিবেচনা করিয়া আমাকে বলুন। বলা হইয়াছে মায়ার বাধা অনতিক্রমণীয় কিন্তু অনন্য ভক্তকে সেই মায়া বন্ধন করিতে পারে না। ভগবানকে যে ভজন করে মিথ্যা মায়ার কথা আর তাহাকে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? সেই তাৎপর্য গুহ্যজ্ঞান মুনির সমীপে শ্রবণের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বিদগ্ধ প্রশ্ন আদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন ॥১॥

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্ ।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥২॥

শ্রীঅন্তরিক্ষ উবাচ ।

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩॥

আপনার বচনামৃত আস্বাদন করিয়া আমার চিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতেছে না। শব্দ ও তাহার তাৎপর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রবণের ক্ষুধা অধিক বৃদ্ধি হইতেছে। অদ্ভুত অতি সুরসপূর্ণ কথা শ্রবণে কর্ণের অধিক পিপাসা। রসনা বলে, আহা অতিশয় মধুর রস। উহার অভিনব রূপ দেখিয়া নয়নের উল্লাস। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে, আহা উহা সুমন কুসুম হইতেও অতি মধুর গন্ধ। বাণী বলে, এই শব্দ বর্ণনায় পরমানন্দ নবীন সিদ্ধান্ত। ভুজযুগল রোমাঞ্চিত হইয়া আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হয়, জীব আত্মভাবে মিলিত হয়। তোমার কথা সুনিশ্চিত দিব্যৌষধি যাহাতে ভবরোগ দূর হইয়া ত্রিবিধ তাপ নিবৃত্তি হয়। জড় মূঢ় প্রাকৃত সকলেই সেই কথা শুনিয়া নির্মুক্ত হয়। রাজার পরমার্থ বিষয়ে রুচি দেখিয়া এবং কথায় তাহার আনন্দ হইয়াছে বুঝিয়া অন্তরিক্ষ নামে যোগীন্দ্র দক্ষতার সহিত বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥২॥

অন্তরিক্ষ বলেন—হে রাজন্, হরির মায়া সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ কিন্তু উহা ব্যর্থ, কারণ মায়া সম্বন্ধে বলা বড় বড় বাগ্মীরও শক্তির অতীত। বন্ধ্যা পুত্রের জন্মকাল জানিতে চাওয়া, তার উপর আবার রাশি নক্ষত্র জাতিকুল বলিতে গেলে যেমন নিরুপায় হইতে হয়, গন্ধর্ব্ব নগরে মৃগজলের উৎকৃষ্ট জলছত্র করা, বাতাসের সল্‌তে করিয়া খদ্যোতের জ্যোতিতে উহা প্রজ্বলিত করা, নিজের ছায়ার মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, আকাশের বল্কল বিচ্ছিন্ন করা, শুক্তির চাকচিক্যে অন্ধকার বিনষ্ট করা, অথবা নিজের অস্ত্রদ্বারা ঝড়ের শিরচ্ছেদ করিয়া তাহার স্ত্রীকে বিধবা করা (যেমন মায়া ছাড়া কিছু নয়) অথবা বন্ধ্যার পুত্র ভীষ্মের স্ত্রীর দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্ট হওয়া, গৃহশূন্য দিগম্বর সাধুর গৃহ ধ্বংস করা, অশ্বশৃঙ্গে আকাশ চিড়িয়া ফেলা, নপুংসকের ঘরে নাতি

নাতিনী, সূর্য্যোদয়কে অন্ধকার বেষ্টন করিয়া থাকা, গুঞ্জাফলের দীপ্তিদ্বারা হনুমানের বিবাহের প্রদীপ জ্বালানো, অথবা বিবাহ উৎসবে গানের জন্য নিজের ছায়াকে প্রেরণ করা, অথবা আকাশকুসুমের গন্ধ মধুর অথবা উহা গন্ধহীন এই বিচার যদি কোনো জ্ঞানবান পুরুষ করিতে পারেন, তবেই তিনি মায়ার তত্ত্ব বিচার সুখে সুখে করিতে পারিবেন (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি যেমন অলীক কল্পনা, মায়ার বিচারও সেইরূপ)। অতএব মায়ার বিবরণ দিতে যাইয়া বাণী লজ্জিত হয়। উহা অজাত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ন্যায় অলীক। 'মায়া' কথায় এমন ভাবটি বুঝায়, যাহা কখনও বিদ্যমান থাকে না। এইজন্য বেদশাস্ত্র তারস্বরে উহাকে অবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, ইহার অর্থ যে থাকে না। মায়ার মূল ভ্রম, উহার ভ্রান্তি নামক উজ্জ্বল ফুল, আর বিষয়রসে পরিপূর্ণ সর্ব্বদা ফলিয়া আছে ভুল নামক ফল। অসৎরূপে স্বরূপের সখী আছে, সে সত্য ও অসত্য দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে। অসত্যের অনেকগুলি সন্তান, ঐগুলি সর্ব্ব বাসনার বিষয় ডোরী দিয়া বেণী রচনা করিয়া সে শোভা দেখায় এবং অহঙ্কারের তারুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া মদনমোহিনী রূপ ধারণ করে। মৃগজলের মুক্তাফলে মস্তকের আভরণ করিয়া গগনে জাত চম্পককলিকা দ্বারা সাজসজ্জা করিয়া অতিশয় সৌন্দর্য্য ধারণ করে। রজ্জু-সর্পের মাথার মণি লইয়া উহা দ্বারা অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করে ও শুক্তির রজতদ্বারা নির্ম্মিত পদের নূপুর রুণু ঝুনু বাজে। শশকশৃঙ্গদ্বারা তৈরী পাদুকা পায়ে সে চলে। অহঙ্কার তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র, সে তাহার অত্যন্ত প্রিয়। কুল বিস্তারের জন্য তাহার কন্যা ব্যালী নানাস্থানে ভ্রমণশীলা, দেহের প্রতি মোহ উৎপন্ন করিয়া তাহাকে ঘরজামাই করিয়া রাখে। এই প্রকারে অহং মোহ আর মমতার যোগে আপনা আপনি জগৎ বিস্তার হইল। শক্তি সম্পন্না স্থূল মমতা নিজের অঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। সংকল্প বিকল্পের উপহার মনকে দেওয়া হইল এবং ত্রিগুণের হার গলায় দেওয়ার ফলে মায়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। এই প্রকার মিথ্যা মূলমায়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আগমন করে, হে রাজন্, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিলাম। সাধু কিন্তু তাহাকে বিনষ্ট করে, জ্ঞান হইলে আর সে থাকে না। অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা আভাস উহা নিজে নিজেই নষ্ট হইয়া যায়, উহার দৃষ্টান্ত মরীচিকার জলের জ্ঞানের মত, দেখিতে গেলে বুঝা যায় উহা কিছু নয়। এইরূপ আভাসেই মায়ার সৃষ্টি এই সংসার ভান। শ্রুতি-

শাস্ত্রে মায়ার লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে আর কিছু শুনা যাইবে না। মায়ার কোনো বাস্তব রূপ থাকিলে তো উহার লক্ষণ বলা যাইবে। সত্য করিয়া দেখিতে গেলে তো আর মায়াকে দেখাই যায় না। মরীচিকার নদী প্রবাহের মূল কি কোনো পাহাড়ে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে? তাহাতো সম্ভব নয়। সেই প্রকার বুদ্ধিদ্বারা অনির্বাচ্য মায়ার সিদ্ধি করা যায় না। দর্পণের কি আর প্রতিবিম্ব আছে? দর্পণেই মুখ প্রতিবিম্বিত হয়। তথাপি নিজের কল্পনা বশে মায়ার উল্লাস হয়। রজ্জুতে প্রতিভাত সর্পকে ধরার মত মায়ার দর্শন মিথ্যা। এই প্রকার মায়ার সম্বন্ধে যে কথা উহা মিথ্যার উপরই নির্ভর করে। নিজের ছায়াকে দূর করিতে চাহিলেও যেরূপ দূর করা যায় না সেইরূপ মায়াকে দুস্তর বলিয়া জানিও, হে রাজন্, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও পরিত্যাগ করা যায় না। অগ্নি উৎপন্ন করিবার সংকল্প সূর্য্যের নাই কারণ সূর্য্যের কিরণেই অগ্নি রহিয়াছে। তাহাতে অগ্নিকে দেখাও যায় না, আর দগ্ধও করেনা, তথাপি উহা সূর্য্য হইতে পৃথক্ হইলেই কার্পাস বস্ত্রকে দগ্ধ করে এবং পৃথক্ দেখা যায়। সেই ভাবেই শুদ্ধ ব্রহ্মের কোনো সংকল্প নাই, তাহার মধ্যে দেহভাবও দেখা যায় না, কিন্তু মধ্যস্থলে বাসনার ছোঁয়া-মাত্র দেহাভিমানে সংসার প্রকাশিত হইল। জাগ্রত দেহের বিস্মরণে দ্বিতীয় স্বপ্নদেহের সংযোগ, তাহাতে মিথ্যা প্রপঞ্চ বৃদ্ধি হয়। স্বপ্নের মধ্যে দেহও যে স্বপ্নময় তাহা বিবেচনা হয় না। সুষুপ্তির মধ্যে বোধ থাকে না, তখন ভবভাব জন্মমরণ সকলই বিলুপ্ত। সংসার সম্ভব শুধু দেহাভিমানেই হয়। সেইজন্য আত্মতত্ত্বকে ভুলিয়া আমি এই দেহ এরূপ অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার হইতে অতিশয় দুস্তর সংসার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন মরীচিকা মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ নাই। উহা না থাকিলেও কিভাবে ঘটে ইহার উত্তরে বলা যায়, উহা যেন ভৌতিক খেলা।

মায়া এই দুইটি অক্ষর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্লোকের অর্থ দূরে পড়িয়া রহিল, অনর্থক গ্রন্থের বিস্তার হইয়া গেল। জ্ঞানবান ব্যক্তিও মায়ার কবলে পড়িলে পাগল হইয়া যায়। নাম রূপ ইত্যাদির ছলে কল্পনা বশে মায়া বৃদ্ধি পায়। হে রাজন্, মায়ার প্রধান লক্ষণ আপনার সমীপে বলিলাম। সকল কল্পনার মূল ভাণ্ডার বলিয়া মায়াকে বুঝিয়া লইবেন। নিজের হৃদয়ে নানা প্রকার আশা, উহাই মায়া। নিত্য সর্ব্বপ্রকারে নৈরাশ্যভাব উহাই পূর্ণতা

লাভ করিয়া পরমেশ্বরেরও আদরণীয় হয়। অতএব যে তাৎপর্য্য লইয়া আপনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উপলক্ষণে তাহার উত্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারিণী ত্রিবিধগুণ সম্পন্না মায়ার কথা বলা হইল। সূর্য্যের সংকল্প না হইলেও তাহার কিরণবশে সূর্য্যকান্তমণি অগ্নি প্রকাশ করে। সেইরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে কোনোরূপ সংকল্প মাত্র না থাকা অবস্থায়ও যাহার উপলব্ধি হয় উহাই 'মূলমায়া'। স্বরূপ পূর্ণরূপে নির্বিকল্প তাহার মধ্যে 'আমি কথা' বলিবে কে, এমন ক্ষেত্রেও 'আমি ভাব' স্ফূর্ত্তি হয়, উহাই মূল মায়া। 'আমি ভাবে'র উদয়ে নিজেই নিজেকে বলে, আদরে নিজেই নিজেকে মিলিত হয়, আপনাকেই প্রীতি করে রতি করে, নিজেকে নিজে বুঝায়, নিজেই নিজেকে প্রাপ্তির জ্ঞান-লাভ করে। নিজে নিজেকে আলিঙ্গন করে, নিজের সঙ্গে সংভুক্ত হয়, মিলিত হয়, সর্ব্বদা নিজেকে নিজের স্বামী ও সেবকরূপে নিযুক্ত করে। শ্রবণ করুন, হে রাজন্, আজানুবাহু শ্রীভগবানকে স্মরণ করুন। তিনি পঞ্চ মহাভূতের স্রষ্টা। তাহার চারিবর্ণ, চারিটি খনি, চারিটি যুগ, চারিটি বাণী, চারিটি পুরুষার্থ, চারিটি লক্ষণ, মুক্তি মণ্ডলের মণ্ডনও চারি প্রকার মুক্তি। তিনটি গুণ প্রকাশ করিয়া তিনি ত্রিভুবন রচনা করিয়াছেন এবং উহাকে ত্রিপুটী বিদ্যা, 'জ্ঞান জ্ঞাতা জ্ঞেয়' দ্বারা কর্ম্মও তিন প্রকার করিয়াছেন। এই প্রকারে এক বহুরূপ ধারণ করিয়া আবার মূলকে স্মরণ করিয়া বহু ভাবকে এক অখণ্ড করিয়া তাহার পূর্ণতার কখনও ভঙ্গ হয় না। কুমার যত ভাণ্ড ঘট তৈরী করুক না কেন, আকাশ স্বাভাবিক ভাবেই সকল ঘটের অভ্যন্তরে থাকে। সেই প্রকার মহাভূতের বিরচিত সকল ভৌতিক বস্তুর মধ্যে শ্রীহরি সর্ব্বদা সমন্বিত হইয়া আছেন। হে রাজন্, এই তাৎপর্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"একাকী ন রমতে"—একা খেলা করা যায় না, এই শ্রুতি বাক্যে ভগবানে দ্বৈত ভাব স্ফূর্ত্তি করিয়াছে। অধিক আর বলিব কি, সমস্ত মহাভূত একের মধ্যেই আছে, ইহাই হরির মায়া বলিয়া জানিবেন! ভূত ও ভৌতিক বলিয়া যে স্ফূর্ত্তি উহা প্রকাশ করিবার শক্তি মায়ার নিজের নাই। মায়ার প্রকাশক চিন্মূর্ত্তি অখণ্ড হইয়াও ভূতাকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হয়। চিদ্‌ঘন পরমাত্মা মায়ার মুখ্যলক্ষণ প্রকাশ করিলে ভূতাত্মা যে ভূতগণ মধ্যে প্রবেশ করেন নাই তাহা বুঝা যায় ॥ ৩ ॥

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥৪॥

এই প্রকারে জড় চেতন মূঢ় নানাপ্রকার পঞ্চ মহাভূত ও প্রাণীগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্থিতি ও গতির নিমিত্ত নিজেই উহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পঞ্চ মহাভূতে পঞ্চ প্রকারে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য শ্রীঅনন্ত পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্, উহা কিরূপ শুনুন। পৃথিবীর মধ্যে গন্ধরূপে অনন্তদেব প্রবেশ করিয়া তাহাতে নিজে পূর্ণ ক্ষমা শক্তি দিয়া চরাচর প্রাণীগণকে বহন করেন। পৃথিবীতে ভগবান প্রবেশ করিয়াছেন, এই জন্য তাহার আবরণ দিলেন জলদ্বারা, উহার মধ্যেও তিনি রহিলেন, এজন্য জল আর শুকাইয়া যায় না। শেষরূপে ধরণীধর ধরাকে ধারণ করিয়া আছেন এজন্য সমুদ্রের জলের অভাব হয় না। ধরাধর শেষ ধারণ করেন বলিয়া প্রাণী সহিত ধরা সুদৃঢ়রূপে অবস্থান করে। শ্রীঅনন্ত স্বাদরূপে জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন বলিয়া উহা দ্রবরূপে সকল জীবকে জীবিত রাখিয়াছে। জীবনের মধ্যে জগতের জীবন প্রবিষ্ট এজন্য তাহাকে আবরণ বলিয়া জানিবে, এ জন্য কখনও তেজে শুষ্ক হইয়া যায় না। তেজের মধ্যে শ্রীহরি সদ্রূপে অবস্থান করেন এজন্য নয়নে অনুপম তেজ আর জঠরে জঠরানল সর্ব্বদা দেদীপ্যমান। তেজের মধ্যে শ্রীহরি বায়ুরূপ হইয়া বায়ুর আবরণে আছেন। স্পর্শ গুণ লইয়া ভগবান বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে প্রাণযোগে অনেক জীব সশরীরে বর্ত্তমান। স্পর্শরূপে ভগবান বায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট এজন্য আকাশ বায়ুকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে না। শব্দরূপে ভগবান আকাশে প্রবিষ্ট হন তাই প্রাণীগণের থাকার মত স্থান পাওয়া যায়। শব্দগুণরূপে ভগবান অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আকাশকে তাহার কারণস্বরূপ মহৎতত্ত্ব লীন করিয়া দিতে পারে না। পঞ্চ মহাভূত নিরন্তর পরস্পরের সঙ্গে বৈরভাব লইয়া এক অপরকে গ্রাস করিবার জন্য অতিশয় তৎপর হইয়া আছে। জল পৃথ্বীকে বিগলিত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে চায়। জলকে তেজ শুষ্ক করিতে চায়, বায়ু তেজকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত আর বায়ুকে আকাশ গিলিতে চায়। শ্রীধর সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে বৈরভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া আনন্দপূর্ণ করেন। এই প্রকারে

পঞ্চ মহাভূতের সাকারতা নানা প্রাণীর মধ্যে করা হইয়াছে। তাহাতে জীবরূপে অবস্থিত, উহা প্রকৃতি যোগেই হইয়া থাকে। তাহারই নাম ব্রহ্মাণ্ড, পিণ্ডের নাম জীব, মায়ার নিজস্ব স্বভাবে দেবতা প্রতিবিম্বিত হইয়া দেহ মধ্যে জীব শিবরূপে থাকে। শিবে যে যোগমায়া নামে বিখ্যাত শক্তি জীবে উহার নাম অবিদ্যা। এই মায়ার প্রধান ভ্রান্তি স্বপ্নস্থিতি এই সংসার। ইহাকে বলা হয় দীর্ঘস্বপ্ন। মায়াময় সম্পূর্ণ সংসার নিদ্রার মধ্যে যে ভাণ দেখা যায়, উহা অবিদ্যা যোগে জীবের স্বপ্ন। জাগ্রত হইলে স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়। প্রকৃত বোধ উদয় হইলে সংসার ভান মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। এইত মায়ার বিদ্যা, হে রাজন্, আপনি অবহিত হউন। জীবের বিষয়াবস্থা বিষয়রসে বিষয়ভোগে একরূপে দশরূপে বিভাগ, হে রাজন্, আমি বলি শুনুন, উহা কি প্রকার। এক ভাগে অন্তঃকরণ স্বয়ং জনার্দ্দনই উহার মধ্যে থাকিয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের স্ফুরণ করেন, এই ভাবে প্রথম চারিটি ভাগ। জীব নিজের পরিপূর্ণতা অহং মধ্যে নিজের আত্মসত্তা মনে করে, উহা মায়ার প্রভাবে আরও লাঘব হইয়া কেবল দেহাত্মভাবকে অর্থাৎ এই দেহই আমি এই অবস্থাকে দৃঢ় করিয়া দেয়। দেহাত্মতাকে অহংকার যে পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়, সেই রীতিতে নিজের চিদ্রূপতা ভুল হইয়া যায়। এই বিস্মৃতি হইতে বিষয় চিন্তা বৃদ্ধি হয়, তাহাকেই তত্ত্বত মহামায়া বা চিত্ত আখ্যা দেওয়া যায়। দেহে অহংতা অতি চপল হইলে উহাকে মন বলা যায়। মন সংকল্প বিকল্পের জাল বুনাইয়া প্রবল ভয়, শোক ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়। দেহ ও অহংকারের বিচার করে বুদ্ধি তাহার নাম। জন্ম মৃত্যু দেহের অনিবার্য্য ইহা যে বৃত্তি স্থির নিশ্চয় করে, তাহারই নাম বুদ্ধি। এই প্রকার দেহ অভিমানকে ভর করিয়া অন্তঃকরণের চারিটি অবস্থা সংসারে কর্ত্তৃত্ব করে, তত্ত্বতঃ ইহাই দেহাভিমান।

অহংকার যখন সোহংভাব গ্রহণ করে তখন চিত্ত চৈতন্যঘনকে প্রকাশ করে তখন মনও উন্মনা হইয়া যায়, পরব্রহ্মবিষয়ে বুদ্ধির পূর্ণ নিশ্চয় হয়। মূল সহ অভিমানকে গ্রাস করিলে কোথায় থাকে বুদ্ধি আর কোথায় থাকে মন! চিত্তের বিচারবৃত্তি ডুবিয়া যায়, পরিপূর্ণ ব্রহ্মই থাকে। এক প্রকার অন্তঃকরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষণ বলিলাম, এখন দশ প্রকার ভেদের কথা বলি শুনুন। অচেতন ইন্দ্রিয় দশটি। তাহাদের চৈতন্য সম্পাদক নারায়ণ দশরূপে

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥৫॥

উহাদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিতে অবস্থান করেন। চক্ষুতে দৃষ্টি হইয়া দৃশ্য বস্তুর দৃশ্যরূপ প্রকাশ করেন। এই প্রকার প্রকাশকতা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দেখাইয়া দেয়। কর্ণে শ্রবণরূপে প্রবেশ করিয়া শব্দকে প্রকাশ করেন এবং অর্থ বোধকরূপে শব্দবিজ্ঞানী হইয়া শ্রবণ করেন। রসের মধ্যে রসাস্বাদ স্বরূপে নারায়ণ, রসনায় রসাস্বাদন ও নানা প্রকার রস সেবা জনার্দন জনগণের রসনায় থাকিয়া করেন। ফুলের মধ্যে শ্রীহরি সুগন্ধ হইয়া থাকেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে তাহার গন্ধ গ্রহণ করেন, তিনি আবার ফুলের মধু, গোবিন্দ নিজের অঙ্গযোগে নিজেই ভোগ করেন। শীত উষ্ণ, মৃদু কঠিন স্পর্শ নারায়ণ প্রকাশ করেন, উহাদের মধ্যে স্পর্শজ্ঞ তিনিই, আবার জগতের জীবন হইয়া তিনিই স্পর্শ ভোগ করেন। বাণীর বাচক কমলাকান্ত, উহা হইতে শব্দ পংক্তি ও নানা প্রকার শব্দার্থ বোধ ও ব্যুৎপত্তি, তিনিই প্রবক্তা হইয়া প্রকাশ করেন। দান ও গ্রহণের শক্তি অকর্ত্তা হইয়াও তিনি কর নামক ইন্দ্রিয়কে দিয়াছেন, আবার পায়েও গোবিন্দই সাবধানে গমন ও স্থিতিশক্তি দিয়াছেন। উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সুখপ্রাপ্তি তাহাতেও সেই শ্রীপতিই সুখানুভব প্রদান করেন, স্ত্রী পুরুষ মৈথুন ব্যুৎপত্তি পুরুষোত্তম প্রীতির সহিত প্রকাশ করেন। গুহ্যদ্বারে যে ক্ষরণ ধর্ম্ম উহাও অক্ষর পরমাত্মার সত্তাতেই সম্ভব হয়। এই প্রকারে আত্মা নিজেকে প্রাণীদেহে ইন্দ্রিয়দ্বারে দশভাগে বিভক্ত করিয়া রহিয়াছেন। দেহের যোগে বিষয় ভোগ করিয়া নিজেই ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ হইয়া নিজেই সব কিছু হইয়া আছেন। যেমন সড়ঙ্গ গাছেই (বৃক্ষবিশেষ কন্দজাতীয়) তাহার বীজের কাজ করে আবার মোটা হইয়া কোনোরূপ বিকার প্রাপ্ত না হইয়াও সমগ্র বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, অথবা যেরূপ উংস বীজ (ইক্ষু জাতীয়) হইতে সেই বৃক্ষবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে একই রস থাকে, সেই প্রকার ইন্দ্রিয় ও বিষয় এবং তাহার বিষয় রস সেবা, সবই জীবভাবে ব্রহ্মেরই ভোগ অথচ অবিকৃত ভাবে ॥৪॥

অন্তর্যামী স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে প্রকাশ করেন। জীব

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥৬॥

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥৭॥

সেই বিষয় সেবা করে এবং অহংভাবে আসক্ত হয়। বলে, বিষয় ভোগ বড় মধুর, আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বিধান করিল, এই প্রকারে অধিক ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয় ক্ষোভ উপস্থিত হয়। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্তি দেহাভিমানে বৃদ্ধি হয় এবং আত্ম জ্ঞান ভুলিয়া মোহমমতায় আসক্তি বাড়িয়াই যায়। দেহকে সে আমি বলিয়া দেহ সম্বন্ধে যাহারা তাহাদিগকে আপন বলিয়া জানে। বিষয় ভোগের লোভে ক্ষণকাল তাহার বিশ্রাম নাই। প্রকৃতির প্রেরণায় যে কর্ম্ম সে করে, উহাকেই নিজের কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। ইহা দ্বারা অসত্য দেহ অহংকারের চাপে উন্মাদ হয়। দেহ সম্বন্ধে অহংকার প্রবল হইয়া অতি অদ্ভুত এবং মোহমমতায় অতিশয় দুর্ঘট জন্মমরণের প্রবাহপথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হয় ॥৫॥

মনের মধ্যে বিষয় ভোগেচ্ছা রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কৃতকর্ম্ম ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞানে জীবের বাধা হয়। ইচ্ছার ফল হয় ভোগানুরূপ দেহে, সেই ভোগ আবার সেই দেহের পর দেহান্তর, এরূপ নানাবিধ জন্ম ও মৃত্যু ফল হয়। ফলের আশায় কর্ম্মের ভয়ঙ্কর পরিণাম, অমৃতস্বরূপের মৃত্যু কল্পনা আর জন্মরহিতের বারবার জন্ম ভাবনা উপস্থিত হয়। এই প্রকারে স্বর্গ ও সংসার, জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারে ভ্রমণ আরম্ভ হয় এবং আপন কর্ম্ম দোষে নানা যোনিতে ভোগ স্পর্শ হয়। ঘানিতে চক্ষু বাঁধা বলদ যেমন ভ্রমণ করে আর কড় কড শব্দ হয়, সেই প্রকার জ্ঞানের চক্ষু বাঁধিয়া আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকিলে জন্মমৃত্যুর খেলা অগণিতবার সহ্য করিতে হয়। সূর্য্যের অস্ত ও উদয়ের মত বিরাম বিহীন জন্ম মৃত্যু জীবের চলিতে থাকে। যতই আশ্চর্য্য জন্মলাভ হউক উহার পিছনেই আছে মৃত্যুভয়—জামফল যেমন অসংখ্য তেমন কোটি কোটি জন্ম মরণ ভোগ ॥৬॥

যিনি পূর্ণতায় স্বতন্ত্র পুরুষ তিনিই কর্ম্ম পরতন্ত্র হইয়া নানা কর্ম্মগতিকে

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥৮॥

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাং স্ত্রীন্‌প্রতপিষ্যতি ॥৯॥

নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। বিষয় সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করিয়া সেই ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনন্ত দুঃখের পাত্র হইয়া যায়। কোটি জন্মে দুঃখ ভোগ করিয়া উহা সে ত্যাগ করিতে পারে না। দুঃখের পর দুঃখের আবর্ত্ত ও মোহ শোকের গর্ত্তে পড়িয়া অত্যন্ত যাতনার মধ্যে সে ডুবিয়া যায় এবং সর্ব্বদা কালাগ্নিতে জ্বালা অনুভব করে। এই প্রকারে জন্ম জন্ম দুঃখ ও শোক সহ্য করিতে করিতে মহাপ্রলয়ের সময় আসিয়া মাথায় পড়ে। এই প্রকারে আপনার সমীপে উৎপত্তি ও স্থিতি প্রকরণ বলিলাম। এখন প্রলয়ের লক্ষণ সাবহিত হইয়া অবধারণ করিতেছি ॥৭॥

সূর্য্যোদয় হইতে দিবসের স্থিতি গড়াইয়া রাত্রিতে পরিণত হয়, সেইরূপ উৎপত্তি স্থিতি প্রলয়ে মিলিত হয়। এই প্রকার প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে অনাদি নিধন কাল পঞ্চ মহাভূত সহিত পৃথিবীকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রবল প্রতাপ প্রকাশ করে। তখন যত কিছু স্থূলাকার ব্যক্ত বস্তু আছে সকলকেই অব্যক্ত করিতে থাকে, যেমন বোনা ফসলের ক্ষেত পাকিয়া গেলে গ্রীষ্মকালে অদৃশ্য হইয়া যায়। বর্ষাকালে আবার স্বাভাবিক ভাবেই ভূমিতে নানারূপ বীজ হইতে তৃণাদি উৎপন্ন হয়, শরৎকালে উহা সুপুষ্ট হইয়া ভূমির শোভা বর্দ্ধন করে, তেমনি আবার গ্রীষ্মের অন্তে ফলমূল সবই অদৃশ্য হইয়া ভূমি বিবরে যার যার বীজে লীন হইয়া থাকে। সেই প্রকার কালের গতিতে এই সংসারের অবস্থা হয়। যেমন বসন্তকালের সমাগমে বৃক্ষের পত্র সমূহ ঝড়িয়া পড়ে, সেই প্রকার কালের প্রভাবে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও নিজ সত্ত্বাকে বিলুপ্ত করেন। তৈরী ক্ষেত্র যেমন ক্রমশঃ সবটাই অদৃশ্য হইয়া যায়, কালের প্রভাবে সেই ভাবে সকল ব্যক্ত বস্তুই অব্যক্ত হইয়া যায়। এই অব্যক্তে স্থিতি, হে রাজন্, কালের ক্ষোভক শক্তি প্রলয়ের পূর্ব্বেই প্রকাশ হয় ॥৮॥

কালের ক্ষোভক দৃষ্টিতে শতবর্ষ অনাবৃষ্টি তাহাতে অতিশয় তাপ সৃষ্টি,

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণ মুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্‌বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥১০॥

সাংবর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।
ধারাভি র্হস্তি হস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট্‌ ॥১১॥

পৃথিবীর উদরে আর কেহ থাকে না, প্রাণীমাত্র বিনষ্ট হয়, বনে বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত ভস্মে পরিণত হয়। বিন্দুমাত্র জল পাওয়া যায় না। এই প্রকার কাল প্রভাব। তখন দ্বাদশাদিত্যের তেজ সমকালে অনুভূত হয়, তাহার দীপ্ত কিরণে ত্রিলোকে সকলেই সন্তপ্ত হয়। এই উষ্ণতায় পর্ব্বত ধরার সঙ্গে মিশিয়া যায়, পাহাড়ও মহাতাপে ভস্মরূপে পরিণত হয় ॥৯॥

উষ্ণতায় পৃথ্বী উত্তপ্ত হইলে শেষ নাগের সেই তাপ লাগে। তখন সহস্র মুখে পাতাল হইতে শেষ নাগের মুখ হইতে অগ্নির স্রোত বহিতে থাকে, যাহাতে শুধু পাতাল নয়, উর্দ্ধমুখে সেই অগ্নিশিখা বিস্তার লাভ করিয়া ত্রিলোকের জ্বালা উৎপন্ন করে, সর্ব্বদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্ষোভে সহস্র মুখে ফুৎকারের ফলে সেই বৈশ্বানর অগ্নি সকল দিগ্‌দিগন্তরে প্রসারিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥১০॥

স্বর্গ ও পাতালে অগ্নি বিস্তার লাভ করিয়া সকলকে ধ্বংস করার পর আবার প্রলয় কালের মেঘ সাংবর্ত্তক, অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ প্রভাবে সেই কালকে ক্ষুব্ধ করে। তখন খুব বেশী করিয়া বৃষ্টি হয় বলিলেই হয় না ভীষণ শব্দের সহিত অবিরাম মুষলধারে বর্ষণ হইতে থাকে। হে রাজন্‌, অপর কোনো জলধারার সঙ্গে এই প্রলয়ের জলবর্ষণের তুলনা দেওয়া যায় না। ইহার সম্বন্ধে শ্রবণ করুন। হে বীরাগ্রগণ্য মহারাজ, উহা অত্যন্ত কঠিন অবস্থা। মদমত্ত হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় প্রলয় কালের ধারা অত্যন্ত প্রচণ্ড। শতবর্ষ ধরিয়া সেই ধারা অবিরল বর্ষণ হয়। বিদ্যুৎ আপনার তেজে সারা আকাশ ব্যাপিয়া যেন চতুর্দ্দিক জ্বালাইয়া দেয়, আর তাহার ভীষণ কড় কড় শব্দে কালের দাঁত লাগিয়া যায়। প্রলয় কালের মেঘ এইভাবে বর্ষিত হয়, তাহার ফলে অপার জল চারিদিক্‌ ছাইয়া ফেলে। এমন কি মনে হয়, ত্রিলোক এক সঙ্গে জলময় হইয়া গেল। নিরন্তর যে মেঘ বর্ষণ করিয়াও

ততো বিরাজমুৎস্বৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥১২॥

বিরত হয় না, তাহাকে সাংবর্ত্তক মেঘ বলে, তাহার বর্ষণ অদ্ভুত। তীর্থ, ক্ষেত্র, পবিত্র জল নদী সমুদ্র সব কিছু এক হইয়া যায়, এমন কি চন্দ্র সূর্য্যাদি সহিত সেই জল প্রবাহে ডুবিয়া যায়। এই প্রকার এক ঐক্য সমুদ্রের মধ্যে পরমেশ্বরের বিরাট্ দেহ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। তবে, দেখুন রাজন্, কিন্তু তখনও সাকার ভাব বিনষ্ট হয় না ॥১১॥

প্রলয় কালের মহাভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে স্থূল দৃশ্যবস্তু সকলই নিঃশেষরূপে বিরাটে প্রবেশ হয় এবং বিরাট্ পুরুষ অব্যক্তে প্রবেশ করেন। ইন্ধন দগ্ধ করিয়া অগ্নি যেরূপ পূর্ব্বস্বরূপে কারণ রূপে অব্যক্ত হইয়া অবস্থান করে, ইহাও সেইরূপ। ব্রহ্মলোকবাসী মহাপ্রলয়ের অন্তঃকালে ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হয়, শ্রুতি ও স্মৃতির এই নির্দ্ধারণ। বৈরাজ পুরুষ বলিয়া খ্যাত হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত প্রলয় কালে অব্যক্তে প্রবেশ করে। অন্তরিক্ষ বলেন—বিদেহরাজ মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, মায়ার শক্তি অপার। যাহারা ভগবদ্ ভক্তি করেন না, তাহারা ব্রহ্মলোকে যাইয়াও মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইলেও ভগবানে ভক্তি ভিন্ন মুক্তি দুর্লভ। ভক্তির সমীপে মুক্তি দাসীর ন্যায় অবস্থান করে। ভগবানের ভজন না করিলে ব্রহ্মারও মুক্তি হইবে না। অতএব অপর জ্ঞানাভিমানীর মুক্তিলাভের কথা পরমার্থবাদী কে আর জিজ্ঞাসা করিবে? যার যে প্রকার পদাভিমান তাহার সেই প্রকার দৃঢ় বন্ধন, এই জন্যই মোক্ষকে ত্রিলোকে দুর্লভ বলিয়া জানিও। এজন্যই কৈলাসনাথের পদাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সদাশিব নিত্য মহাশ্মশানে কাশীক্ষেত্রে বিচরণ করেন। আর আত্মনিষ্ঠায় ভগবদ্ভজন করেন। এই প্রকারে, হে রাজরাজেশ্বর, যাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাহারা ভগবদ্ভক্তি করেন, তাহারা মহাপ্রলয়ের অন্তে মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মলোকে থাকিয়াও যাহারা ভক্তি করেন না, তাহাদিগকে পুনরায় জন্ম মৃত্যুর পথে ফিরিয়া আসিতে হয়—মায়ার এই প্রকার দুর্ব্বার শক্তি। ভক্তি বিনা মুক্তি কিরূপে লাভ করিবে? এই অর্থের প্রকাশে ব্রহ্মার বাক্য দুটি শ্লোকার্থ চিন্তনীয়।

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃত রসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥১৩॥

জ্ঞানাভিমানীর পতন হয়, ভক্তের কখনও সংসার বন্ধন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন—
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্—
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩॥

ভক্তি না করিলে জ্ঞানীরও মুক্তি হয়না। ইহা বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মার বাক্য দুইটি দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত হইল। জন্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ দেহ লাভ, তাহাতে আবার বেদশাস্ত্রসম্পন্ন, এই সকল লাভ করিয়াও ভক্তি না করিলে পতন অনিবার্য্য। ভক্ত সর্ব্বভূতে ভগবদ্‌ভাব রক্ষা করেন। কারণ, তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইবার কোনো স্থান থাকে না। তাহার সমীপে অপায় বা বিঘ্নও উপায় বা সাধক হইয়া অনুকূল হয়। ভিন্ন ভিন্ন মুক্তির চেষ্টা করিলে উহা নিষ্ফল হয়। অনন্তর যে প্রকরণ বলিতেছিলাম, সেই প্রলয়ের কথা বলি—বৈরাজ পুরুষ অব্যক্তে প্রবেশ করে। বৈরাজের অব্যক্তে প্রবেশ হয়। তখন মহাভূতের বিনাশ আরম্ভ হয়। ক্রমে উহা কমিতে থাকে—একে একে অব্যক্তে প্রবেশ করে—উহা শ্রবণ করুন ॥১২॥

প্রলয় বায়ুর ক্ষোভক ক্রোধ পৃথিবীর গন্ধ হরণ করিয়া লয়। তখন শুধু জল দেখা যায়। বায়ু ক্ষুব্ধ হইয়া জলের রস শোষণ করে, জল কমিয়া যায়, শুধু থাকে প্রলয়ের তেজ অবশিষ্ট। বায়ু সেই তেজের তাপ হরণ করে, তখন শুধু এক অন্ধকার আকাশ মণ্ডলকে ঘিরিয়া থাকে, প্রলয় বায়ু ভিন্ন শূন্য অবকাশে আর কিছু থাকে না। এই বায়ুর স্পর্শগুণকেও আকাশ গ্রাস করিয়া ফেলে, তখন আর কি থাকিবে? ॥১৩॥

হৃতরূপস্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃত স্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে।
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥১৪॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥১৫॥

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণাবর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬ ॥

আকাশের শব্দগুণ উহাও প্রলয়কাল গ্রাস করিয়া ফেলে। তমসাভিমান তখন ক্ষুব্ধ হইয়া আকাশকেও গ্রাস করে। দশটি ইন্দ্রিয়ে রাজস অহংকার আশ্রয় গ্রহণ করে। চিত্ত প্রভৃতি চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় মিলিত হইয়া সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও মিলিত হইয়া সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করে। অনন্তর ত্রিগুণের সহিত বর্ত্তমান তিন প্রকার অহংকার মহৎতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া যায়—ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন সন্তান সহিত কন্যা মায়ের বাড়ী যায়। সেইভাবে মহৎতত্ত্ব-স্বরূপ মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়। কুক্কুটী যেমন তাহার ছানাগুলিকে নিজের পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া সে একাই আছে এরূপ দেখায়, সেইরূপ কল্পান্তে মায়ায় অবস্থা। এই প্রকারে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পর্য্যন্ত ত্রিবিধ অবস্থা গুণময়ী মায়া মিথ্যার আভাসে। মিথ্যা খেলায় যেমন দিবসকেও রাত্রি বলিয়া ভাবনা করা হয়, সেইরূপ এক পূর্ণস্বরূপের মধ্যে মায়ার ত্রিবিধ কল্পনা দেখা যায় ॥১৪।১৫॥

উত্তম মধ্যম অধম জন এই ত্রিভুবনে ত্রিবিধ অবস্থা। ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ গুণ। এই সবই মায়ার কার্য্য। ধ্যেয়, ধ্যাতা ধ্যান, পূজ্য পূজক পূজন, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান, এই সকলই মায়ার ত্রিপুটী। দৃশ্য দ্রষ্টা দর্শন, কর্ম্মকর্ত্তা ও ক্রিয়াচরণ, ভোগ্য ভোক্তা ও ভোজন, মায়ার ত্রিপুটী। শব্দ শ্রোতা শ্রবণ, ঘ্রেয় ঘ্রাণকর্ত্তা ও ঘ্রাণ, রস রসনা ও রসাস্বাদন এইগুলিও মায়ার ত্রিপুটী। কর ক্রিয়া ও কর্ত্তা, চরণ গতি ও গমন কর্ত্তা, বাণী বক্তা ও বলা মায়ারই ত্রিবিধ অবস্থা। অহং সোহং জড়মূঢ়তা, সাধক সাধন ও সাধ্যতা,

দেবী দেব ও পরিবার দেবতা ত্রিবিধতা মায়ার। দেহ দেহী দেহাভিমান। ভয় ভব ভববন্ধন, মুক্ত মুমুক্ষু অজ্ঞান সকলই মায়ানির্ম্মিত! সুখ দুঃখ জড়তা, পূর্ণ অর্দ্ধেক সমাধি ব্যুত্থান, উৎপত্তি স্থিতি নিধন সর্ব্বত্র মায়ার বিলাস। আকাশ নীলবর্ণে রঞ্জিত দেখা যায়, কিন্তু উহাতে অল্পমাত্রও নীলিমা পাওয়া যায় না। সেই প্রকার মায়ার আভাস, অনেক কিছু দেখা যায় কিন্তু কিছুই থাকে না. মিথ্যাবশে উহা মায়িক। মৃগজল প্রত্যক্ষ দেখা গেলেও উহাতে প্রখর রৌদ্র ভিন্ন কিছু পাওয়া যায় না। সেইরূপ কেবল মায়া মূলে আভাস নির্ম্মূল। এই মায়া মিথ্যা কল্পনায় ইহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার বিনাশের জন্য জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নাই। নাম রূপের আশ্রয়ে এই মাযা ব্রহ্মাদি সমস্ত ত্রিপুটী বিন্যাস করিয়াছে, উহাতেই ত্রিলোকে বন্ধন ঘটিয়াছে। যেরূপ দৃষ্ট ছায়াকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াও উহাকে নষ্ট করা যায় না। স্ব-স্বরূপের আশ্রয়ে মায়া থাকে বলিয়া তাহার সৃষ্টি দেবতা প্রভৃতি সহিত তাহার নিরসন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দেহের সঙ্গে যেরূপ মিথ্যা ছায়া থাকে সেই প্রকার ব্রহ্মের আশ্রয়ে মায়াও মিথ্যা। উহা কেবল কল্পনার সহায়তায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অতএব তাহাকে অজয়া অর্থাৎ অপরাজেয় বলিয়া বেদশাস্ত্র বলেন। হে রাজন্, যত কল্পনা বৃদ্ধি মায়ারও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয়। মায়ার নির্ণয় করিতে আর কোনো রূপকে বুঝানো যায় না। তাহার ত্রিবিধ প্রধান লক্ষণ বিবেচনা করিয়া বলা হইল। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণে আপনার আগ্রহ, হে রাজন্, তাহা বলুন।

মায়া দারুণ দুস্তর শুনিয়া ঋষি, ব্রাহ্মণ সভাসদগণ ও রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মায়ার স্বরূপ সত্যই বড় অদ্ভুত, উহাকে বুঝিয়াও উহার নিবারণে সামর্থ্য হয না। এই মায়ার কবলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, অপরের কথা আর কি বলা যায়? মায়া শিবকেও আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে জীবদশায় টানিয়া আনিয়াছে। এই প্রকার প্রবল মায়ার সমুদ্র দীন জীবগণ যে ভাবে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই উপায় বিচার করা প্রয়োজন। দীন দুর্বল ব্যক্তিও যাহাতে ত্রিলোক সহিত দুস্তর মায়া সাগর পার হইতে পারে সেই উপায় সম্বন্ধে রাজা অত্যন্ত আগ্রহে ভক্তি সহিত প্রশ্ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূল ধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥১৮॥

শ্রীহরির মায়া অতি দুস্তর ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন। মায়া দেহাভিমানীকে বন্ধন করে। মায়া দুরধিগম্যা ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। তবে যাহারা অতি সাধারণ সাদা সিধা প্রকৃতির লোক আছে তাহারা কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া এই মায়ার বন্ধন হইতে নিস্তার পাইতে পারে তাহা বলিতে হইবে। যে আপনার মনকে বশ করিতে পারে না অথচ ভবসাগর পারে যাওয়ার আগ্রহ পূর্ণ, এই প্রকার মায়ামুগ্ধ ভাবুক লোক কি ভাবে মায়ার পারে যাইতে পারে তাহার সুগম উপায় বলুন। পূর্ব্বে কবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন 'তস্মাগুরুং প্রপদ্যেত' ... ('তন্মায়য়াতো বুধ আভজেতি'), গুরু ও ব্রহ্মের অভেদ ভাব রাখিয়া ভক্তি করিয়া মায়ার পারে যাইতে পারে। সেই ভক্তির স্পষ্ট লক্ষণ এবং উহার বিশদ বিবরণ শ্রবণ করিলে মায়া তরণের উপায় হইবে। এই জন্যই মুখ্য প্রশ্ন এই বিষয়ে মায়া তরণের বিধি সুগম উপায় বলুন। এই কথায় অন্তরিক্ষের কনিষ্ঠ বন্ধু বুদ্ধিমান প্রবুদ্ধ বলিতে লাগিলেন ॥১৭॥

প্রধানভাবে মায়া তরণের উপায় প্রবুদ্ধই পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত যেহেতু তিনি নিজ মায়ার পারে গিয়াছেন। মনে বিষয়ের ছন্দই কেবল বন্ধনের হেতু, যে বিষয় ত্যাগী সে-ই প্রবুদ্ধ বা জ্ঞানী। এই বিষয়টি বিশদভাবে বলিতেছি শুনুন। বিষয়ের প্রতি মন লুব্ধ হইলে বৈরাগ্য পূর্ণ হয় না, আর মায়ারও তরণ সম্ভব হয় না। বৈরাগ্যের নিমিত্তই বিষয়ের নিন্দা। উহা যে নশ্বর তথাপি উহাতেই পরম সুখ মনে করা হয়। সেই সুখও দুঃখদায়ক, বিশেষ করিয়া স্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে মায়া প্রভাব বিস্তার করে। দ্রব্য বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা সুখের নিমিত্ত স্ত্রী লইয়া গৃহে বাসের কালে

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ।।১৯।।

অগণিত দুঃখভোগ করে। এই সংসারে স্ত্রীকামুকের দুঃখের শেষ নাই। এই প্রপঞ্চ সকলই স্ত্রী কামনায়, এইজন্য দুঃখও প্রবল হয়, মায়াও বৃদ্ধি, পায়, ইহাতেই সমস্ত জগৎ মুগ্ধ। স্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে প্রপঞ্চ বৃদ্ধি মহামোহ সৃষ্টি, দুঃখের সাগরে মগ্ন হওয়া। যে মাতা নয়মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, সেই মাতাকে পর করিয়া স্ত্রীকে আপনার করিয়া লয়, মায়ার প্রভাবে স্ত্রীকামুক। যে মাতা নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, যিনি মলমূত্র ঘাটিয়া সন্তানকে মানুষ করে, সেই মাতা হইতে স্ত্রী হয় বেশী আপনার, মায়ামোহিত সংসারে এই প্রকারই দেখা যায়। সংসারে স্ত্রীলাভ দুর্লভ নয় কিন্তু মাতা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ইহা বুঝিতে পারিয়াও লোক স্ত্রীর বশ হইয়া পড়ে। মাতার সেবায় ভক্তি ও মুক্তিলাভ হয়। স্ত্রীসঙ্গে কেবল নরক ভোগ। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা জানিয়াও স্ত্রীকামুক হইয়া মাতাকে উপেক্ষা করে। এইভাবে স্ত্রীর প্রতি আসক্তির মায়া ত্রিভুবন ব্যাপিয়া ফেলিয়াছে। জ্ঞানবানও ভ্রান্তিজালে পতিত হয় কামাসক্তি মহামায়ায়। বিষয়ভোগে সুখ আছে মনে করিয়া মানুষ কাম্য কর্ম্মে নিরত হয়, তার ফলে দুঃখভোগ করে, কাম্যকর্ম্ম দুঃখদায়কই হয়। কামিনীর প্রতি আসক্তিতে গৃহাসক্ত প্রাণীগণ প্রাণান্ত পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করে। হে রাজাধিরাজ, সেই কষ্ট ভোগের শেষে কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহা তোমাকে বলিতেছি। মৃণ্ময় ভিত্তি নির্ম্মল জলে ধুইলে জলের নির্ম্মলতা যায়, হাতও মলিন হয়, কিন্তু ভিত্তি পরিস্কার হইয়া যায়। বিষয়ের সুখে যাহারা সুখ মনে করে এমন ব্রহ্মাদিও সেই বিষয়ভোগে সুখ পান না। বিষয়ে যে হর্ষ মনে করে, সে মহামূর্খ পশুপ্রায় ॥১৮॥

রাত্রি দিবস প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া বিত্ত উপার্জ্জন কিন্তু সেই ধনও মহাদুঃখের জন্মস্থান, অনর্থ ও সর্ব্বনাশের মূল। ধন উপার্জ্জন সময়ে শ্রমসাধ্যকর্ম্ম, উহা লাভ করিয়াও রক্ষা করিবার জন্য হৃদ্‌রোগের মত সর্ব্বদা চিন্তা লাগিয়াই থাকে। ধনলোভেই অবিশ্বাস আনন্দে অবস্থান করে। এই ধনলোভ পিতামাতার সমীপেও চুরি করা শিক্ষা করায়,

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্মিতম্।
সতুল্যাতিশয় ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥২০॥

স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে, ইষ্ট ও মিত্র বান্ধবকে দূর করিয়া দেয়। ধনের গুণ আর কত বলিব? এই ধনের মধ্যে আধি ও ব্যাধি, উহার মধ্যেই দুষ্টবুদ্ধি, উহাতেই লোভ ও ক্রোধ বাস করে। ধনেই বর্ণনার মিথ্যা প্রবঞ্চনা বিতর্ক পাপ সংতাপ যত কিছু, এক কথায় ধনই দুঃখের মূর্ত্তি। এই ধন দানধর্ম্মে ব্যয় করিলে তো উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়, কিন্তু লোভের ফলে এই ধন নরকগামী করে। ধনের মত ত্রিভুবনে নিন্দনীয় আর কিছু নয়। ছোলার আশায় হাত বাড়াইয়া বানর যেমন করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে ফাঁদের মধ্যে ধরা পড়ে, ঠিক সেইভাবে ধন ও স্ত্রীলোভে মানুষও অধঃপাতে যায়। অনায়াসে ধন না পাইলে অন্যায় পথ অবলম্বন করিয়াও উহা সংগ্রহের জন্য মানুষ চেষ্টা করে। এইভাবে দেখা যায় ধনের সঙ্গে কায়মনোবাক্যের শুদ্ধিও যায়, আর সুখও থাকে না। অর্জ্জিত ধন ব্যয় করিয়া খুব বড় বাড়ী করে, কিন্তু জীবনের কোনো স্থিরতা না থাকায় ধনও গেল আয়ুষ্কালও ফুরাইয়া গেল। নিজের দেহ গেল, পুত্র জন্মগ্রহণ করিল সেই পুত্র মৃত্যুমুখে পড়িয়া পিতাকে আরও দুঃখে ডুবাইল। এই সংসারে সকল আত্মীয় বান্ধবই স্বার্থসিদ্ধির কাল পর্য্যন্তই বান্ধবতা রক্ষা করে। তারপর স্বার্থ লইয়া বিরোধ হওয়া মাত্র শত্রুতা করিয়া আঘাত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করে না। খুব পছন্দ (হাউস) করিয়া ঘোড়া গরু কুকুর প্রভৃতি নানারূপ পশু সংগ্রহ করা হয়, আবার তাহাদেরই মৃত্যুতে গৃহস্থ অত্যন্ত ত্রাস ও দুঃখ অনুভব করে। নিজের দেহও নশ্বর, তাহা তো সে ভুলিয়া যায়, পালিত পশু প্রভৃতি আর কেমন করিয়া চিরদিন থাকিবে? সমগ্র সংসারই কালের গ্রাসে, সব কিছুই এখানে নশ্বর। মানুষ কর্ম্মভূমিতে দেহলাভ করিয়াছে, যাগযজ্ঞ করিয়া সে স্বর্গলাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহলোকের মত কর্ম্মজিত স্বর্গলোকও নশ্বর ॥১৯॥

মনে বিষয় ভোগের লালসা রাখিয়া ইহলোকে যাগ অনুষ্ঠানের পুণ্য সঞ্চয়ে মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে। স্বর্গসুখ ইন্দ্রের আধিপত্যে সর্ব্বদাই পতনের ভয়। চিত্তে সাধুগণ তো স্বর্গসুখকে তপস্যার বিঘ্ন স্বরূপই মনে

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌ ॥২১॥

করেন। নিজের পুণ্যে স্বর্গ প্রাপ্তি, উহাকে বলা হয় পুণ্যজিত। সেই ভোগ্য পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে স্বর্গসুখও ক্ষয় হইয়া যায়। এইভাবে স্বর্গস্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরও হৃদয়ে কম্পন অনুভব হয়। খুব বেশী পুণ্য গাঁঠে সঞ্চিত থাকিলে তবেই স্বর্গভোগে সুখ, দেহ সম্বন্ধে সুখ মূলতঃ মিথ্যা। স্বর্গের দুঃখ শুনুন। মহারাজ, সমান পুণ্যে সমপদ প্রাপ্তি। তাহার সঙ্গে অপর সমপদ প্রাপ্ত ব্যক্তির স্পর্দ্ধা ও কলহ অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তি উচ্চপদে স্থিত তাহার প্রতি নিশিদিন দ্বেষ থাকার কথা। এক রাজমণ্ডলে অবস্থিত প্রত্যেকে রাজ্যলোভে যে প্রকার কলহে প্রবৃত্ত থাকে সেই প্রকার স্বর্গ প্রাপ্তগণেরও অতি দুঃখময় দ্বেষ ও কলহ হইয়া থাকে। পতনের ভয়ে কলহ দ্বেষ তাহাকে আকর্ষণ করে, পুণ্যক্ষয়ে অধোমুখ হইয়া বেচারা যাজ্ঞিক পুনরায় সংসারে পতিত হয়। এই প্রকার ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গসুখে যাহারা আনন্দ মনে করে তাহারা অবোধ পশুর তুল্য। কারণ বিদ্বেষ ও কলহ তাহাদের নিত্যই বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্ব হইতে ভুক্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ ভোগ করিয়াও কখনো তাহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। অথচ ইহা দেখিয়া শুনিয়াও এই সুখ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহার কারণ মায়ার মোহিনী শক্তি। অর্থের বিনিময়ে বেশ্যা তাহার রূপ যৌবনের সুখ ভোগ করায়। ঠিক সেই প্রকার বিষয়সঙ্গ জনিত সুখকে বুঝিতে হইবে। উহা অত্যন্ত দুঃখময়। এই নিমিত্ত ইহলোক বা স্বর্গলোক উভয়লোকের ভোগের কথা যাহা বলা হইয়াছে উহা মায়ার বৃত্তি উহার জন্য মানুষ তাহার প্রশংসিত আয়ুষ্কাল ক্ষয় করে। কর্ম্মভূমি সংসারে নিজের ভাগ্যফল দেববাঞ্ছিত নরদেহ লাভ করিয়া দেহ যদি বিষয় ভোগের লালসায় ক্ষয়িত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, বিষয়াসক্তি দিয়া মায়া জীবকে ঠকাইয়া গেল। এই নিমিত্ত বিষয় বিরক্তিদ্বারা গুরুভক্তির কথা বলা হয় ॥২০॥

বৈষয়িক ভোগের নশ্বরতা জানিয়া পূর্ণব্রহ্মের প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনন্যভাবে সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করিবে। হে রাজন্‌, সদ্‌গুরুর বচন মাত্র মায়া হইতে জীব তরিয়া যায়, এই নিশ্চয় করিয়া অনন্য ভক্তিসহ ইষ্ট প্রাপ্তির

নিমিত্ত মুমুক্ষু তাঁহার চরণে লাগিয়া থাকিবে। 'গুরু' এই একটি শব্দ বহু প্রকার গুরুকে বুঝায়। হে রাজন্ আপনার জন্য উহার লক্ষণ বলিতেছি। আচার্য্যগুরু বেদ অধ্যয়ন করান। অপর ব্যাখ্যাতা অর্থ বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভাবে একজন জ্যোতিষজ্ঞানে গুরু, তবে তাহাকে সদ্‌গুরু বলা হয় না। অন্যগুরু আগমোক্ত মন্ত্র উপাসক শিষ্যকে সেই মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক বিধি অনুসারে জপ করিবার উপদেশ করেন। পরন্তু তাহাতে আত্মানুভব লাভ হয় না। কেননা তাহারা গুরু ও শিষ্য উভয়ের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই করে নাই। কেহ প্রাণায়াম শিক্ষাপ্রদান করেন। কেহ একপ্রকার ধ্যানের উপদেশ করেন। হঠযোগের নির্দ্দেশ দিয়া কেহ ভূচরী, খেচরী, ষন্মুখা, শাংভবী, মহামুদ্রা প্রভৃতি শিক্ষা দেন, কেহ ব্রহ্মানুবাদে নিপুণ, তত্ত্বনিরূপণে উদ্ভট, বৈরাগ্য প্রবচনে বরিষ্ঠ যাহাতে উভয় লোকের ভোগে ঘৃণা ধরিয়া যায়। শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান এরূপ নিপুণভাবে হয় যে, তাহাতে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের মনে প্রেমের উদয় হয়। তাহাতেও অন্তঃকরণের ভ্রম যাইতে পারে না, তাহার কারণ উপদেশের মর্ম্মগ্রহণে সে ব্যক্তি অসমর্থ। ইক্ষু গুড় করিবার জন্য পেষণযন্ত্রে রস নিংড়ানোর সময় যন্ত্রের নানা রকম কচ কচ শব্দ হয়। রস কিন্তু অন্য পাত্রে জমিতে থাকে। যন্ত্রকে তাহার স্বাদ ভোগ করিতে দেয় না। সেইরূপ শব্দবিদ্যা বিশারদ নানারূপে জ্ঞানের কথা বক্তৃতা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন বটে, বক্তার কিন্তু উহার মর্ম্মানুভব হয় না। তাহার যোগক্ষেম ভাল ভাবেই চলে, লোকের মধ্যেও প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকেও গুরু করিয়া শিষ্যের আত্মপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা পূর্ণ হয় না। "অমৃত" এই কথা উচ্চারণ মাত্রই তাহার স্বাদ অনুভব হয় না। সেইরূপ শুধু শাব্দিক জ্ঞানের যোগেই অনুভবামৃত স্বতঃলাভ হয় না। যিনি নিজে অমৃতাস্বাদ না করিয়াছেন, তিনি অপরকে তাহার মধুরতা কি ভাবে অনুভব করাইবেন? এই নিমিত্ত যিনি পূর্ণানুভব সম্পন্ন তিনিই সৎশিষ্যগণকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরু বলিয়া বলা হইলেও তন্মধ্যে যিনি অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তাহাকেই সদ্‌গুরু স্বামী বলা যায়। তাঁহারই বচনে অসৎ জগদ্‌ভান অস্ত হইয়া যায় এবং সৎ বস্তুর উদয় অনুভব হয়। এই জন্যই তাহাকে বেদশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য সদ্‌গুরু বলা হয়। যিনি মন্ত্র তন্ত্র উপদেশ করেন, তিনি অবশ্য অত্যন্ত পূজ্য। তবে যাহার সমীপে পূজ্য

পূজক ভেদ থাকে না, তিনিই সদ্‌গুরু হইয়া থাকেন। কাহারও শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সেই অনুভবে তাহার মন লয় হইয়া যায়। দ্বৈতভান অস্ত যায়। চার প্রকার বাণী মৌনভাবে থাকে। ইন্দ্রিয়গণ তটস্থতা অবলম্বন করে। প্রাণ স্থিরতা লাভ করে, পরমাদ্ভুত পরব্রহ্ম দর্শনে দেহভাব তটস্থ হয়। এই প্রকার আত্মানুভবীর সমীপে শিষ্য সদ্ভাবে বিনয় নিবেদন করিলেও তিনি উহা বিচার করেন না। বুঝিলেন কি বুঝিলেন না তাহাও প্রকাশ করেন না, তটস্থভাবে মৌনী হইয়া থাকেন। কাহারও ব্রহ্মানুভব হইলে বাধ্য-বাধকতা ভাবের ভ্রম দূর হইয়া যায়। দ্বৈত ভাবেই কর্ম্ম আর অদ্বৈত ভাব উদিত হইলে জগতে তাহার আর কোনো বিষয়ই বাধা সৃষ্টি করে না। তাহার বাক্য আশ্চর্য, সে অঘটন কর্ম্ম করে, তাহার উগ্রভাবও অতুলনীয়, ভয়ানক এবং দুর্দ্দান্ত। নিজেকে লইয়া নিজে হাসে আবার সংকেতে পরামার্থ তত্ত্ব বর্ণনা করে। শিষ্যের চিত্তে উহার তাৎপর্য্য বোধের বিষয় হয় না, অতএব দুর্ম্মনা হইয়া তাহার কাছে পড়িয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তাহার ব্রহ্মস্থিতিও সাধারণ লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তবে কে আর এরূপ ব্যক্তির সমীপে ভক্তি করিয়া জ্ঞানলাভের আশায় গমন করিবে? এইজন্য, হে রাজন্, সদ্‌গুরুর লক্ষণ তোমার মঙ্গলের জন্য বলিলাম। মন দিয়া এই কথা শুনিলে সদ্‌ভাব লাভ করিয়া অবশ্যই সুখী হইবে। যিনি কায়মনোবাক্যে দীনজনের প্রতি অতিশয় কৃপালু, তিনি শিষ্যের ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া অহংভাব হইতে উদ্ধার করেন। তিনি শব্দ ব্রহ্মজ্ঞানে পারংগম ব্রহ্মানন্দে সর্ব্বদা উল্লসিত, যথাযোগ্য নিজভাবে শিষ্য প্রবোধনে সমর্থ, যাহার যেমন ভাব তাহাকে তদনুরূপ অনুভব দান করিয়াও তিনি গুরুভাবে অহংভাব তিলমাত্রও ধারণ করেন না, শিষ্যের সমীপে সেবা গ্রহণের কথা তিনি স্বপ্নেও মনের কোনে স্থান দেন না, শিষ্যের সেবা নিজেই করিতে প্রবৃত্ত হন, শিষ্যকেই পূজ্য বলিয়া দেখেন, শিষ্যকে পুত্রের মত দেখেন, স্মৃতি শাস্ত্র এবিষয়ে প্রমাণ আছে, সেই প্রমাণে শিষ্যকে গৌণরূপে না দেখিয়া তিনি ব্রহ্মভাবেই দেখিয়া থাকেন। শিষ্যগণ অবশ্য ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কাহাকেও নিজের সেবক বলিয়া না দেখিয়া সর্ব্বভূতে ভগবদ্রূপে দেখেন, শিষ্য তাহার সমীপে খুব শীঘ্র তাহার সেবকত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। বরং আমি এক মহাযোগী, অপর কেহ আমার মত এ সংসারে নাই, এরূপ

গুরুত্বের অভিমান কোনোমতে তাহাকে স্পর্শ করে না। নিজের ভরণ পোষণের সংকট তিনি স্বপ্নেও শিষ্যের কাঁধে চাপান না। বরং শিষ্যের কোনো চাপ পড়িলে উহা তিনি নিজের কাঁধেই বহন করেন। আমি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মবাদী যোগী হইয়াছি, বিষয়ের ভোগ নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছি, এই প্রকার অভিমান তিনি কখনও করেন না। তিনি বিষয় ভোগীও নন, আর স্বয়ং ত্যাগীও নন, যিনি অদৃষ্টের উপর সব কিছু নির্ভর করিয়া দেহ সম্বন্ধে প্রারব্ধে প্রাপ্ত সুখ দুঃখ সমভাবে দর্শন করিয়া পরমব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন। এই দেহের দোলারোহণ হইল বা বিষ্ঠাগর্ভে পতিত হইল সে সম্বন্ধে সুখ দুঃখে তিনি কখনও ক্ষুব্ধ চিত্ত হন না। দেহ ধারণের অহংকার তাহার থাকে না। দেহ থাকিয়াও দেহভাব শূন্য, গৃহ থাকিয়াও গৃহাসক্তি শূন্য। সাধারণ লোকের মধ্যেও সাধারণ লোকের মতই তিনি সুখে থাকেন। তিনি স্ত্রীকেই নিজের পতি মনে করেন, পুত্রকেই পিতা মনে করেন, শিষ্যকেই গুরু মনে করেন। অকপটভাবেই তাহার এই প্রকার ভাবনা চলে। এই প্রকার পূর্ণ প্রীতিতে ভক্তির অনুশীলন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবের প্রতি হরিভজনের জন্য শিষ্যকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করেন, এই সদ্‌গুরুর নিজস্ব লক্ষণ। পাণ্ডিত্যের গুণে পণ্ডিতগণ ইহা জানেন না। পূর্ণ অনুভবেই ইহা জানা যায়, অপরের অবিজ্ঞাত এই রহস্য। গুরুর প্রধানতম চিহ্ন এই যে তাহার মনে প্রাণে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত, ইহাই তাহার লক্ষণ এবং প্রধান ভূষণ। জগতে শান্তি যেন বিদেশী, কোনো স্থানে তাহাকে প্রায়শঃ দেখা যায় না, তবে সে সদ্‌গুরুর চরণ সমীপে আসিয়া সুখের বাসা করিয়া বসবাস করে। মাতৃগৃহে মায়ের কাছে গেলে কন্যা যেমন স্বচ্ছন্দে থাকে, ঠিক সেই প্রকার শান্তি সদ্‌গুরু সমীপে আনন্দে বসবাস করে। যিনি বেদশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জানিয়াও সে বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিমান করেন না, যিঁনি অপরোক্ষানুভবে পূর্ণ শান্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই সুনিশ্চিত সদ্‌গুরু মূর্ত্তি। হে রাজন্, বৃথা গ্রন্থ বাড়িয়া চলিয়াছে ভাবিয়া শ্রোতৃগণ ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, তদুত্তরে বলিতে হয়, মূল শ্লোকে "নিষ্ণাত" কথাটি যে আছে উহার তাৎপর্য খুঁজিতে যাইয়াই পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলি স্ফূর্ত্তি হইল। আমার গাঁঠে কোনো যুক্তি নাই। সদ্‌গুরু নিজেই নিজের স্থিতি, গ্রন্থের তাৎপর্যে পদ পদার্থের বিষয়গুলিও বলিতেছেন।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥২২॥

সদ্‌গুরুর মহিমা অগাধ গম্ভীর, তাই বেদ এবিষয়ে মূক হইয়া আছেন, সেই ক্ষেত্রে আমার বলার কত শক্তি। তবে বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি এই যে আমার প্রতি নিজ সখা জনার্দ্দনস্বামী প্রসন্ন হইয়া শ্রীভাগবত দেশীয় ভাষায় হইলেও ইহাতে পরমার্থ তত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করাইয়াছেন। একনাথ জনার্দ্দনের শরণাগত। তাহার কৃপা পরিপূর্ণ হইলে দেহ থাকিলেও গুরু-ভক্তের দেহ বন্ধন দূর হইয়া যায়। তাহার সমীপে অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ করিলে কোথা হইতে কেমন করিয়া ভাগ্যোদয় হয়, তাহা বেদ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। সদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি না করিলে পরমার্থ প্রাপ্তি হয় না, এই জন্য শিষ্য-হিতের নিমিত্ত গ্রন্থে সদ্‌গুরু-ভক্তির কথা বলা হইল। তিনি শিষ্যের অন্তরে নিজের অনুভব-বেদ্য যথার্থ বিষয়গুলি প্রদান করেন। হে রাজন্, সদ্‌গুরুর ভাব সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হইল। অনন্তর শিষ্যের লক্ষণ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন ॥২১॥

শিষ্য নানা প্রকার। তন্মধ্যে একরকম যাহাদের বরাবর সাত্ত্বিক প্রকৃতির বলিয়া আপাততঃ প্রতীতি হইলেও অন্তরে নানাপ্রকার বিকল্প কল্পনা। এক রকম আছে দাম্ভিক, কেহ আছে জ্ঞান ঠক, অতিধূর্ত্ত কেহ আবার প্রতিষ্ঠাকামী, কেহ আদরণীয় হইবার ইচ্ছা করে, কেহ জ্ঞানীর অভিমান করে। কাহারও অন্তরে আছে মহাসিদ্ধিলাভের মিথ্যা আকর্ষণ। কেহ খুব বেশী কর্ম্মাভিমানী আবার কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিমান করে। কেহ প্রাণায়াম কেহ আসন জয়ের অভিমান করে, অথচ সংশয়াসক্ত মন পূর্ণ বিশ্রাম অভাবে কোনো সাধনায় স্থির ভাবে বসে না। কেহ আদর করিয়া গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়াও উহা সফল হইবে কিনা এইরূপ সংশয় করে। এইভাবে শিষ্যের নানা শ্রেণী উহা নিশ্চিতরূপে মায়িক বলিয়াই জানিবে। অনন্তর যাহারা অমায়িক শোধিত সত্ত্ব বলিয়া সাত্ত্বিক প্রধান ভাবে পরমার্থ সাধক তাহারা সর্ব্বভাবে প্রবঞ্চনাহীন। যাহারা গুরু-চরণের চিহ্নিতদাস, যে গুরু বাক্যেই জীবন ধারণ করে এবং সদ্‌গুরুর জন্য নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে, যে সদ্‌গুরুর বাক্যে নিজের জীবনটিকে

নির্মঞ্ছন করিয়াছে, যে গুরু আজ্ঞার বাহিরে তিলমাত্র চলিতে পারে না, যে সদ্‌গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করে না, যে ত্রিবিধ শুদ্ধি (কায় মনোবাক্যে) লাভ করিয়াছে, যে সর্ব্বদা হর্ষভরে গুরু সেবায় লাগিয়া থাকে, নিজের ভাবে পরমাদরে সেবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তৎপর হইয়া অষ্ট প্রহর দেহ দিয়া গুরু সেবায় অনুমাত্র সে ক্লেশ বোধ করে না। উচ্চ নীচ মনের ধর্ম্ম বা নিত্য কর্ম্মকেও গৌণ করিয়া গুরুসেবাকেই সে পরমোত্তম বলিয়া মানিয়া লয়। অকপট সেবায় নিত্য সে সজাগ হইয়া থাকে, কষ্টকর সেবার সুযোগ আসিলে সে আরও অধিক উল্লসিত হয়। শিষ্য সৎ হউক বা অসৎ হউক সদ্‌গুরু সকলকে সমভাবেই দেখিয়া থাকেন। তবে যাহার হৃদয়ে যেরূপ ভাব সে তদনুরূপ ফল ভোগ করে। নারদ পুরাণে আছে—

কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে তু বিদ্যতে দেব তস্মাদ্ভাবোহি কারণম্॥

এই উপদেশ অনুসারেই সমাধান হয়। নিজের নিজের ভাবেই ফলভোগ হইয়া থাকে। নিজেরই বুদ্ধির দোষে মৃত্যু পরিহার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও হিরণ্যকশিপু উহা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। দেবতাগণ পরামর্শ করিয়া তাহার বধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ "দেবাধিদেব আমার রক্ষক" এই ভাবে তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার উপায়কে ব্যর্থ করিয়া দিল। পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানই শুদ্ধ উপায়। এই নিমিত্ত যে সদ্ভাবপূর্ণ সে জন্মমৃত্যুপাশ ছেদনে সমর্থ। শিষ্যকে পরীক্ষা করিবার মত আমার সামর্থ্য আছে সদ্‌গুরু এই অভিমান করেন না। তাহার সমীপে যে শিষ্যের যতটুকু ভক্তি আছে সে ততটুকুই ফল পায়। হে রাজন্, দেখুন সৎ শিষ্যের কতখানি যোগ্যতা! সে গুরু ও ব্রহ্মের ঐক্য ভাবনা করে। সদ্‌গুরু আমার অন্তরে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চালক, হৃদয়স্থিত আমার আত্মা আবার বাহিরে সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সদ্‌গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্ত্তি। অতএব সদ্‌গুরু চরণে আপন চিত্ত বিত্ত ও জীবনটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দেয়। ইহাতে প্রভু পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়া অন্য সব কিছু বিস্মৃত হইয়া নিজের অঙ্গ দ্বারা সেবককে রক্ষা পূর্ব্বক নিজে তাহারই অধীন হইয়া থাকেন। আত্মার্পণের জন্য প্রভু বনমালী বলির দ্বারের দ্বারপাল হইয়াছেন। ভজনের এই প্রকার

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্ ॥২৩॥

অভিনবত্ব যে সেবকের নিমিত্ত প্রভু প্রহরী হইয়া থাকেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ এই প্রকার অগাধ প্রেমের অধিকারী হইয়াও অতিশয় সাদাসিধাভাবে থাকেন। অতএব সর্ব্বস্ব দান করিয়া সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করিবে তবেই শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া শিষ্যকে ভজনধর্ম্ম উপদেশ করিবেন যে ভজন প্রভাবে তিনি উত্তম ভক্ত আখ্যা লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবও সদ্ভাবে পূর্ণ হৃদয় হইয়া তাহাকে সমগ্র ভাগবত ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত শিক্ষা দান করেন। সৎসঙ্গ প্রভাবেই মুখ্যভাবে ভাগবত-ধর্ম্মে স্থিতি লাভ হয়। অসৎসঙ্গ ত্যাগের নিমিত্ত সদ্‌গুরু এইপ্রকার উপদেশ দান করেন ॥২২॥

সকল সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃসঙ্গতায় মন নির্ম্মল হইলে অবশ্যই সে অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া সৎসঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। দেহাভিমানে আমি আমার ভাবনাই প্রধান অসৎসঙ্গ, উহা সমুল নিবৃত্তি করিবে। জগতে সৎসঙ্গের ন্যায় শক্তি আর কিছুরই নাই। হে রাজন্, দয়া মৈত্রী ও বিশ্বাস যেখানে দেখিবে বুঝিবে উহাই সৎসঙ্গের লক্ষণ, তাহার সঙ্গই সৎসঙ্গ। গৌরব ত্যাগ করিয়া সাধুর নিকট পূর্ণভাবে শরণাপন্ন হইবে, দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া তাহাকে নমস্কার করিবে। সাধুর ন্যায় পূজ্য আর এজগতে কেহ নাই। সাধুর পূজায় দেবাধিদেব স্বয়ং সন্তোষ লাভ করেন। সাধুর পদধূলি শ্রদ্ধার সহিত শিরে ধারণ করিবে। সাধুসন্ত ভিন্ন আপনার বান্ধব আর কেহ নাই। সাধুর আদর্শে ভগবদ্‌ভাব লাভ হয় আর ইহাতেই বিনীত নম্রভাবের উদয় হয় ইহাই প্রশ্রয় নামে অভিহিত। সাধু-চরণ সেবায় নম্রতা আসে, নম্রতা হইতে ভূতদয়া,—যাহা দয়ার স্বরূপ লক্ষণ—উহা বৃদ্ধি পায়, ইহা সাবধানে বুঝিয়া লইবে। প্রাণীমাত্রের দুঃখ দেখিলে যাহার প্রাণ ব্যথিত হয় সে কখনও নিজে কাহাকেও দুঃখ দিতে পারেন একথা স্বপ্নের অতীত। যাহাতে নিজের দুঃখ হয় এরূপ কার্য্য তিনি কোনো প্রাণী সম্বন্ধে করেন না। যাহাতে নিজের সুখ হয় জীবের জন্যও তিনি সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। সকল প্রাণীর প্রতি তাহার সমান দয়া। কাহারও প্রতি কখনও তিনি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেন না।

জীবগণের পীড়া নিবারণ করিয়াই তিনি নিজের সুখোপায় ভাবনা করেন। কাহারও প্রতি দুরুক্তিতে তাহার রসনা কাঁপিয়া উঠে। কোনো প্রাণীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে তাহার অন্তর ব্যথিত হয়। নিজের জীবনের অপেক্ষা অধিক দয়ার দৃষ্টিতে অন্য জীবকে সে দেখিয়া থাকে। এই প্রকার করুণার নাম দয়া।

অনন্তর মৈত্রীর অসামান্য লক্ষণ বলিতেছি শুনুন। সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে বন্ধু ভিন্ন আর কেহ নাই এই মৈত্রী না করিলে নিজের বন্ধন দশা যাইবে না। বিষয় বিয়োগে যাহার মালিন্য আসে না, প্রাণ গেলেও যাহার শান্তি ভঙ্গ হয় না, তাহারই নাম মিত্রভাব। ইহাতে কল্পান্তেও নিজ মিত্রগণের সহিত মিলিত হয়। এই প্রকারে মিত্রভাব রক্ষা করিলে শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই শ্রদ্ধার কথা বলিতেছি। শ্রদ্ধার স্থূল লক্ষণ অসাধারণ। শ্রদ্ধালুর দৃষ্টিতে ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র কীট পর্য্যন্ত সকলেই সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র। সে সকলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। পাদ্য অর্ঘ্য ও বিবিধ দান দ্রব্য সমর্পণ করিয়া সে ব্রাহ্মণকে পূজা ও সম্মান করে। কাহাকেও দান করে, কাহাকেও আচ্ছাদন বস্ত্র, কাহাকেও শুধু ধান্য, কাহাকেও তৃণ জল, কাহাকেও শুধু দুগ্ধ অর্থাৎ যাহার যে দ্রব্য প্রয়োজন এবং যোগ্য তাহাকে সেই সামগ্রী দিয়াই সম্মান করে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি। অনুচিত দ্রব্য দান দুঃখের কারণ হয়, যেমন ব্রাহ্মণকে তৃণ দিয়া যদি গাভীকে মিষ্টান্ন ভোজন করায়. কুকুরকে সিংহাসনে বসাইয়া সাধুকে যদি ভূমিতে বসায়, ইহা অনুচিত। ব্যাঘ্রের উপবাসের পর তাহাকে গো-দান দিবে না—গরুর গায়ে কাঁদা মাখা অবস্থায় তাহাকে তিল তেল মাখাইবে না। দেহ ও ইন্দ্রিয় এক হইলেও জিহ্বার কর্ম্ম নাকে করা যায় না। খাদ্য নাকে ঢুকাইয়া দেওয়া অনুচিত। সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে একই ভূতাত্মা অভিন্নভাবে থাকিলেও উচিত ভাবেই সেবার দ্রব্য অর্পণ করা কর্ত্তব্য। যদিও সেবার ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, অন্তরের শ্রদ্ধা সর্ব্বত্র অভিন্না, ইহাই ভাগবত ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা অভিন্ন-ভাবে অবস্থান করেন। দয়া, মৈত্রী, সাধুর প্রতি ভক্তি কি ভাবে লাভ করা যায় সেই উপায় প্রবুদ্ধ বলিতে লাগিলেন। ভাগবত ধর্ম্মের সমস্ত কথা, সাধকের আত্মবোধ পর্য্যন্ত সকল কথা, এই সকল শ্লোকে প্রবুদ্ধ উপদেশ করেন ॥২৩॥

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্ব সংজ্ঞয়োঃ ।২৪॥

পরমার্থ সাধনের নিমিত্ত মুখ্যভাবে অবশ্যই শুচিতা প্রয়োজন। শৌচ ভিন্ন নিজ স্বার্থ কোনোমতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য, হে রাজন্, শৌচের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অন্তরের মল দূর না হইলে বাহিরের শুদ্ধি সিদ্ধি হয় না। বাসনার আবিলতায় মন মলিন থাকিলে বাহ্য শুচিতার অভিমান দৃষ্টিহীনের দর্শনের মতই নিরর্থক। বাসনায় মলিন মনকে গুরু বাক্যে আত্মনিষ্ঠা দ্বারা বিধৌত করিয়া শুদ্ধ করিবে। স্বর্ণকে বার বার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া যেরূপ শুদ্ধ করিতে হয়, সেইরূপ গুরুবাক্য পালন ও গুরু সেবায় মনের জড়তা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়। মন দর্পণ মার্জ্জন করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলে আপনা আপনি আত্মশুদ্ধি হইয়া যায়। স্পর্শমণি সংযোগে লৌহ তৎক্ষণাৎ লৌহত্ব ত্যাগ করিয়া স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়। সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি হইলে বুদ্ধির জড়ভাব দূর হয়। সূর্য্যকান্তমণিকে সূর্য্যের সম্মুখে ধরিয়া তাহার শুদ্ধতায় সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যে অগ্নি উৎপাদন করে উহা অগ্নিহোত্রাদি মহাযজ্ঞের নিমিত্ত যজ্ঞশালায় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সেই প্রকার গুরুবাক্যে অন্তরের শুদ্ধতা যদি বাহিরেও পবিত্র না করিয়া দেয় তবে জানিবে সবই ভণ্ডামী। শৌচের নিমিত্ত অল্প জল গ্রহণ করিলে শৌচক্রিয়াও হয় না, হাতও শুদ্ধ হয় না, অতএব অপবিত্রই থাকিয়া যায়। বিষাক্ত জল বাহিরে রসপূর্ণ অতি সুন্দর দেখাইলেও উহা কেহ সেবন করে না কারণ উহার অন্তর স্বভাব অত্যন্ত মন্দ। রজকরাজ তীর্থস্নান করিয়া আসিলেই দ্বিজরাজ হইবে না। অভিনেতা রাজদণ্ড হাতে করিয়াছে বলিয়া তাহার বাহ্য ক্রিয়া অভিনয়ে পূজ্য হয় না। সুকুমারী সুন্দরী অলংকৃতা হইলেও তাহার ওষ্ঠে যদি কুষ্ঠরোগ দেখা যায় তাহাকে সুন্দর বলিয়া কি আর কেহ বরণ করিতে পারে? কেশহীন মস্তকে মুক্তার জাল অলংকার দিলে বা নাসিকাহীনাকে নাকের নথ পরাইলে উহা তাহার পরিহাসের বিষয় হয়। সেইরূপ অন্তরে পবিত্রতা না থাকিয়া শুধু বাহিরের শৌচ বিড়ম্বনা। কাকের শরীরে দধি মাখিলে সে রাজহংস হয় না। শুভ্র তুলাকে মন্থন করিলে নবনীত পাওয়া যায় না, ইহাতে তৃপ্তির স্থলে লোকের উপহাসই লাভ

হয়। অন্তরে বিকল্প থাকিয়া বাহিরে পবিত্র আচার উপহাসের বিষয়। অন্তরে গুরুর প্রতি বিশ্বাস বাহিরে শাস্ত্রযুক্তি, এই প্রকার অন্তর্বাহ্য স্থির সিদ্ধান্তে প্রবেশ করিতে অদ্বৈত ভাবের পরমোল্লাস। অন্তরের শুচিতা বাহিরের কর্ম্মেই অনায়াসে অভিব্যক্ত হইয়া পরমার্থ দশা প্রকাশিত করে। ঈশ্বর ভাবের ধর্ম্ম যিনি প্রেমের সহিত ধারণ করিয়াছেন তাহার প্রতিটি কর্ম্ম ব্রহ্মময়, দেহভ্রম তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। ইহার নাম শুচিষ্মতা বা শৌচ। হে রাজন্ এখন আপনাকে তপ সম্বন্ধে বলি শ্রবণ করুন।

শরীর শোষণের নাম তপ। উহা প্রারব্ধ ভোগানুরূপ কিন্তু যদি হৃদয়ে কৃষ্ণ স্বরূপ নিরন্তর ভাবনার বিষয় হয় তবে ঐ তপ শুদ্ধ হয়। সম্মুখে বিজয় পতাকা দর্শন করিয়া যোদ্ধা যে ভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হয় সেইরূপ যিনি পরমেশ্বর ভাবনা লইয়া তপস্যায় অগ্রসর হন তিনিই শুদ্ধ তপস্বী। উহারই নাম তপ, উহাই শুদ্ধ তপ, উহার পর আর বাক্যজাল বিস্তার অপ্রয়োজন। মুমুক্ষুগণের দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা থাকিবে, উহারই নাম তিতিক্ষা। হে রাজন্, উহাকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে। সুখ দুঃখ উভয় প্রকার ভোগ, এই দুই-এর মধ্যে অখণ্ড নিজের শরীর যেমন চিত্রের মধ্যে ব্যাঘ্রকে বন্ধন দশায় দেখা যায়, তেমন দেহের ছবিতে আত্মা বন্ধনে আছে এরূপ মনে হয়। দাবাগ্নির তাপে আকাশ দগ্ধ হয় না। সেই প্রকার দেহ ভাবে তাহার বন্ধন হয় না, আত্মা অলিপ্ত। শীতল জলের কি আর ঠাণ্ডা লাগে? পৃথিবী নিজের ক্ষমা গুণ ত্যাগ করে না। সেইরূপ আত্মস্বরূপের নিরাবিল সুখে কোনো মতে দুঃখ দ্বন্দ্ব স্পর্শ করে না। হিমে শরীর কম্পিত হয়, সাধু কম্পিত হয় না। অতি উষ্ণ তাপে দেহ তপ্ত হয় বলিয়া সাধু দেহ তাপে অভিতপ্ত হন না। দেখিতে সুখ হইলেও উহাই পরিণামে দুঃখরূপে পরিণত হয়, এই ভাবনাই দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা বলিয়া খ্যাত। গুলতির গুলি খাইলে প্রথমতঃ দুঃখ হইবারই কথা, কিন্তু সেই গুলি যদি সোনার বলিয়া দেখা যায় তো দুঃখ দূর হইয়া সুখই বৃদ্ধি পায়। সুখ ও দুঃখ প্রদায়ক বস্তুর তত্ত্ব এক। সেই সুখ দুঃখ প্রকাশ এক অদ্বৈত তত্ত্ব দর্শন পূর্ব্বক সাধক দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হয়। দ্বন্দ্বের জ্ঞান সম্বন্ধে অভিমান পর্য্যন্ত দূর করিয়া সাধক সম্পূর্ণরূপে নির্দ্বন্দ্ব হয়। কঠিন ইক্ষুর রস যেমন অখণ্ড মধুরতা বহন করে, সেই প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যেও নির্দ্বন্দ্ব চিদ্‌ঘন অখণ্ড স্বরূপ দর্শন হয়। এই প্রকার অখণ্ডতা যতদিন সাধকের

করতলগত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা নিজের বিচারেই ভাল করিয়া পূর্ণভাবে বুঝিয়া লইবে।

অনন্তর মৌনের লক্ষণ অবধান করুন। বাদবিবাদ করিয়া শুধু দেহাভিমান বৃদ্ধি হয়। সদ্গুরু সেই অভিমান নিঃশেষরূপে বিধৌত করিয়া দেন। সদ্গুরুর বাক্য শ্রবণে প্রবেশ করিলে স্তুতি নিন্দা দুই-ই দূর হয়, কথা আর বলিতে ইচ্ছা হয় না, সকল কথা হৃদয়েই পরিপাক হইয়া যায়। কাহারও দোষ বলিতে হইলে নিজের হৃদয়েও সেই দোষ আছে এই বিচার করিয়া বাক্য প্রয়োগের নিষ্ঠুরতা হইতে বিরতি আসে, গুরুবাক্যে এই ভাবে মৌন হয়। গুণ দেখিয়া স্তব করিতে গেলেও মৌন আসে কেননা সাধক সকলের মধ্যেই এক আত্মা দর্শন করে। তখন মনে হয় স্তব্য স্তোতা ও স্তব সকলই যে এক আমিই আত্মা। আমি আমার স্তব প্রশংসা করিব ইহাও তো মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমার আত্মা ভিন্ন কোনো স্থান আছে তাহাতো দেখি না। অতএব যে দিকে দেখি কেবল আত্মার প্রকাশই তো দেখি। সদ্গুরুর নির্দেশে এই বিশ্বাসে চিত্তকে স্থির করিয়া নিন্দা বা স্তুতিময় বাক্য আর সে উচ্চারণ করে না। নিজের স্বার্থের জন্য যদি সে কোনো কথা বলে তবে তো সদ্গুরুর তথা বেদ শাস্ত্রের যুক্তি কুণ্ঠিত হইয়া যাইবে, তবে আর তাহাদের বাক্য রহিল কোথায়? এই ভাবে স্তুতি নিন্দা বাদানুবাদ পরিহার পূর্ব্বক সাধক অতিশয় শুদ্ধ মহামৌনের পরমানন্দ লাভ করেন। এই প্রকার অতিশয় দৃঢ় মৌন অভ্যাস করাইয়া সদ্গুরু বেদাধ্যয়ন করান এবং উপনিষৎ বিচার করিয়া সম্পূর্ণ অর্থ বোধের উপযোগী উপদেশ দান করেন। অথবা অত্যন্ত দৃঢ় মৌন করিয়া শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করেন। অখণ্ড নাম করিতে থাকিলে সকল বেদের তাৎপর্য্য তাহার নিকট করযোড়ে অবস্থান করে। যাঁহার বাণীতে নিত্য শ্রীরাম নামের ধ্বনি তাহার অঙ্গনে সকল তীর্থ লুণ্ঠিত হয়, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তাঁহার চরণতলে মিলিত হন, এমন কি যমও তাহার চরণ তীর্থ মস্তকে ধারণ করেন, রামনামের স্মরণের নামই মহামৌন। বেদ নামের মহিমা কীর্ত্তন করেন শুদ্ধ হরি নামোচ্চারণেই বেদাধ্যয়ন হয়। নামস্মরণই স্বাধ্যায় বলিয়া জানিবে।

অনন্তর হে রাজন্, আর্জ্জবের লক্ষণ শুনুন। সকল জীবের মধ্যে যে ভাবে

জীবন নির্ব্বাধে বাস করে অথবা বস্ত্রের মধ্যে যে সহজ ভাবে সূত্র অবস্থান করে সেই রীতিকেই আর্জ্জব বলা যায়। কটু আস্বাদ ইন্দ্রাবন (?) ফলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিলে চিনির মধুরতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ বিষম স্বভাব জীবের মধ্যে থাকিয়াও স্বাভাবিক ভাবে যিনি আর্জ্জব গুণের অধিকারী, তিনি স্বভাবগুণে সকলকে রঞ্জিত করেন। চন্দ্রের কলা বক্র হইতে পারে, তাহার জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না, সেই রীতিতে বিষম স্বভাব লোক দেখিয়াও তাহার মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি কাহাকেও হীন বুদ্ধি করেন না। সকলের সহায়তায় তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকেন। লৌহ উত্তাপে গরম হয়, তখন যে ছাপে খুশী তাহাকে সেইভাবে পরিণত করা যায়, কিন্তু ঘন হইলে সেই লৌহ খণ্ড কাহারও আঘাতে রূপান্তরিত হয় না, নিজের স্বরূপে শক্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার যে স্বরূপ বিচ্যুতে না হইয়া সকলের বিশ্বাস পাত্র হইয়া থাকে তাহার ভাবই আর্জ্জব। তাহার অপূর্ব্ব গুরুদীক্ষা।

ইহার পর ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলা হইতেছে। দেবতা দানব এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ যে কামে বশীভূত হন সেই মদনকে জয় করা অতীব কঠিন কার্য্য। এই অনঙ্গ দুর্দ্ধর্ষ। অন্তরে কামনা রাখিয়া দাঁত মুখ চাপিয়া কামকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া যায় না, উহাতে লোক ভুলানো যায় মাত্র। এই ভাব সদ্‌গুরুর অভিমত নয়। তাঁহার উপদেশে কামনার বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি শিষ্যের প্রতি অভঙ্গ ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ করেন। মদনের বাক্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বুদ্ধি। কিন্তু গুরুদীক্ষা অলৌকিক। সেই দীক্ষায় স্ত্রী পুরুষ দুই দেহই মায়িক মিথ্যা বলিয়া এবং বিষয় ভোগ অনর্থ বলিয়া জ্ঞান হয়। শংকা হইতে পারে, জননেন্দ্রিয়কে উপনিষদে আনন্দের স্থান বলা হইয়াছে, ইহার সমাধান কি? সমাধান করিয়া বলেন, যাহারা বেদবিদ্যায় পূর্ণজ্ঞানী তাহাদের বিবেচনা এই প্রকার চিনি কিরূপ মিষ্টি তাহা কোনো ভাষায় বুঝানো যায় না, তাই এক কণা চাখাইয়া দিলে উহার মধুরতা বুঝা যায়। কণামাত্রের আস্বাদনে একরাশি চিনির স্বাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ পরমানন্দ সুখের আভাস মাত্র মানুষ জননেন্দ্রিয় দ্বারে পায় বলিয়া বেদে উহাকে আনন্দের স্থান বলা হইয়াছে। উপস্থজনিত সুখ ক্ষণিক। সম্ভোগ বিনাও যে সুখের নিত্যস্থিতি এবং যে সুখ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে কোনো

দিন হ্রাস পায় না, তাহার সমীপে স্ত্রী পুরুষ মিলনজনিত সুখ যে মিথ্যা এই জ্ঞান সহজেই হয়। একটু চিনি খাইয়া মিষ্টি লাগিলে আরও খাইতে চায়, সেইরূপ মৈথুনে একটু সুখ পাইয়া পামর মানুষ বিষয়ান্ধ হইয়া লাগিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মহামূর্খ লোক স্ত্রী-কামনায় অত্যন্ত তীব্র আকর্ষণ জীবনের লালসায় সহ্য করিয়া থাকে। চিনি দিয়া নারকেল তৈরী করিলে উহার বল্কল বা শস্য সকল অংশই মিষ্ট আস্বাদ হইবে। সেই প্রকার বিষয় জগতের যত কিছু সুখের স্রোত সকলের মূলই পরমানন্দ, অতএব বৈষয়িক সকলই সুখের বলিয়া মনে হয়। নানা প্রকার পক্কান্ন ও বড়া হইলেও মূলত মধুর রস বলিয়া মিষ্ট আস্বাদ হয়। সেইরূপ আত্মানন্দের স্পর্শে বিষয়ও সুখের অনুভব হয়। বিষয়ের আকর্ষণে পড়িয়া আত্মানন্দের সন্ধান থাকে না কিন্তু বলবান সদ্‌গুরুর কৃপা শিষ্যকে বিষয় সুখের দিক্ হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক এক আত্মার আনন্দে লাগাইয়া দেয়। অতএব সৎশিষ্যের মনে আর বিষয়ের প্রতি আস্থা থাকে না। গুরুর বাক্যে নিষ্ঠার ফলে স্ত্রীভোগাসক্তি তত্ত্বত মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হয়। আত্মার পুংভাব বা স্ত্রীভাব নাই। পুরুষ আত্মা অপর স্ত্রী-আত্মাকে দেখিতেছে এই প্রকার মিথুন ভাব মূলত নাই। এই প্রকার তত্ত্ব প্রত্যয়ে অভঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য বা উত্তম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় এই অলৌকিক অখণ্ড শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়।

অনন্তর, হে রাজচক্রবর্ত্তি, অহিংসার বিষয় শ্রবণ করুন। এই অহিংসায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কোনো অবস্থায় কোনো প্রাণীর প্রতি বক্রদৃষ্টিপাতও সম্ভব হয় না। অহিংস ব্যক্তি পদ পরিক্রমায় পাছে পৃথিবীর দুঃখ অনুভব হয় মনে এই পর্য্যালোচনা করিয়া অতি সন্তর্পণে ভূমিতে পদক্ষেপ করেন। যদি বা খুব উচ্চস্বরে চিৎকার করিলে আকাশের ভীতি জন্মে এজন্য ভয়ে ভয়ে চিৎকার করেন না তিনি। তাহার বাণীতে পরিপক্ক অমৃত, তাই বাক্যে সকলকার পরম সুখোদয় হয়। তাহার বাণী যে গগনে ধ্বনিত হয় উহা শব্দানন্দ চমৎকৃতিতে আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়, এরূপ সুখের উদ্‌গার তাহার বাক্যাবলী। জলে প্রবেশ করিবার সময় পাছে জলের অনভিলষিত অধিক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এই ভয়ে হাত দিয়া জলকে আলোড়িত না করিয়া তরঙ্গের মতই জলে প্রবেশ করেন। এই প্রকারে জলে ডুব দিলে তাহার বাহু স্পর্শে যেন জলেরই তাপ প্রশমিত হয়, ইহার পর স্নান করিলে তো যেন

জীবন জলই নবজীবন লাভ করে। পাছে বায়ু প্রবাহের দুঃখ হয় এজন্য তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন না। শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি দেহ ধারণ করেন। নিজেকে আঘাত করিবার জন্য যেমন নিজের হাত কখনো উঠে না, সেইরূপ কোনো প্রাণীকেই আঘাত করিবার মত তাহার কখনো মনে ভাবনা উদয় হয় না। অত্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে পাছে কাহারও ভয় হয় এজন্য কাহারও প্রতি প্রাণীদৃষ্টিতে বাহ্যত ক্রূর দৃষ্টি করেন না। দেহমর্দন করিলে রোম সমূহেরও মর্দন হইবে ভাবিয়া নিজের দেহ সম্বন্ধেও ভূতহিংসা ভয়ে অহংতা ভাব ত্যাগ করেন। প্রাণীমাত্রের অতি অল্প দুঃখ হইলেও তাহার অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মার দুঃখ হইবে এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি পোষণ করেন, তিনিই যথার্থ অহিংস।

প্রাণী সমূহের কায়িক বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যাহার এইগুলি নিঃশেষ হইয়া যায় তাহারই সমীপে অহিংসার প্রতিষ্ঠা। হে নৃপবর, ইহারই নাম সত্য অহিংসা। ইহা দ্বন্দ্বভাবের সাম্যাবস্থা, এই লক্ষণেই অহিংসাকে বুঝিতে হইবে। সুখ দুঃখ অদৃষ্টের অধীন। এই অদৃষ্ট দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব সদ্‌গুরু বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দেহ সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্ব হইবে। অদৃষ্টানুসারে দেহ সুখ দুঃখ ভোগ করে। অবোধজন তাহাতে কখনো অনুরক্ত ও কখনো বিরক্ত হয়। সদ্‌গুরুবাক্যে যে শিষ্যের মন রঙ্গীন হইয়াছে দেহ সম্বন্ধে সুখ দুঃখ সে নিজের গায়ে লাগায় না। দেহ সুখে সুখী বলিয়া যে মনে করে সর্ব্বপ্রকার দুঃখ তাহাকে পাইয়া বসে। অতএব গুরুর সমীপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দেহাভিমান সে ত্যাগ করে। নিরভিমানের শরীরে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইলেও দুঃখ লাগে না আর সুখভোগেও সুখাসক্তি থাকে না। সে উভয় অবস্থায় নির্লিপ্ত। ছায়া উষ্ণতায় তাপযুক্ত হইলে আবার ছায়াতেই শীতল হয়। সুখ দুঃখও সেইভাবেই মিথ্যারূপে অনুভূত হইলে দেহে যে যে সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় উহারাও মিথ্যা বোধ হয় এবং আনন্দই অবশিষ্ট থাকে। অদৃষ্টবশে দেহে অনুভূত সুখ বা দুঃখ আনন্দানুভবের বাধক হয় না। এই অলৌকিক গুরুগম্য রহস্য শ্রদ্ধাবান শিষ্য লাভ করিয়া থাকেন। গুরুগম্য রহস্য লাভ ভিন্ন দ্বন্দ্বসমতা কখনও হইতে পারে না। যতদিন দেহ সম্বন্ধে অহমিকা আছে ততদিন দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতার নিদারুণ বাধা আছে। যাহারা গুরুবাক্যে নিরভিমান তাহাদের সমীপে

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্ত চীর বসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥২৫॥

দ্বন্দ্ব একান্ত মিথ্যা। স্বপ্নের দারিদ্র্য বা সমৃদ্ধি উভয় ভাবই জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ মিথ্যা সেইরূপ দ্বন্দ্ব বাধাও গুরুভক্তের অপরোক্ষ জ্ঞানের সমীপে বাধক নয়। ছেলেমানুষদের খেলার মধ্যে একাদশী ও পারণার যেমন কোনো অর্থ হয় না, তেমনি গুরুবাক্যের সমীপে দ্বন্দ্বদশাও অমূলক নিরর্থক। চন্দনের সুগন্ধ সম্বন্ধে যে ভাবে সাধারণ বৃক্ষও চন্দনরূপে গৃহীত হয়, গুরুবাক্য প্রভাবে সেইভাবে সকল প্রকার দ্বন্দ্বভাবও আত্মস্বরূপতা লাভ করে। চন্দনবৃক্ষ সমীপে অবস্থান হেতু চন্দনগন্ধে অন্যান্য বৃক্ষরাও চন্দনসাম্যে ব্রাহ্মণ ও দেবতার শিরোদেশে স্থান পায়, সৎসঙ্গের এইরূপ ভাগ্য। সৎগুরুই সেই সৎসঙ্গ, তাহার সঙ্গ পাইয়া শিষ্য রূপান্তরিত হয়—স্বয়ং ব্রহ্মরূপতা লাভ করিয়া দ্বন্দ্বাতীত হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাসী এইরূপে দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা করতলগত করে। এজন্য গুরুবাক্যই বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥২৪॥

সদ্‌গুরু বচনে বিশ্বাস পূর্ব্বক সর্ব্বত্র পরমাত্মা ঈশ্বর অবস্থান করেন এই নিশ্চয় বুদ্ধি মনে মনে বিচার করিবে। এই আমার স্থূল শরীর আত্মার অবস্থানেই চলা বলা প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে পারে। তাহার পূর্ণ চিৎপ্রকাশে এই বিশ্ব বিশ্বরূপে অবভাত হয়। তাহারই প্রকাশে আমার চক্ষু সকল দৃশ্য দর্শন করে। দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন ক্রিয়া, সর্ব্বরূপেই পরমাত্মা বিরাজমান। যাহা কিছু দৃশ্য রূপ তাহার অন্তরে ও বাহিরে আত্মাই পূর্ণরূপে আছেন। তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া সকল সৃষ্টি ভুবন ভরা। এইরূপে সর্ব্বভূতের আকৃতিতে পরমাত্মা প্রতীতি হয়। তাহা না হইলে আমিই এই ত্রিলোকের ঈশ্বর, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আমিই, এই প্রকার স্থূল অহংকার স্ফূর্তি হয়। এই ভাবে যখন দেখে তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে আমিই আছি। দৃশ্য দ্রষ্টা ও দর্শন এই ত্রিপুটি লয় হইয়া ক্রমে অহংকার বিলুপ্ত হয়। সেই ভাবে পর-ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হওয়ার ফলে সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ হইয়া যায়। গুরুর উপদেশেই সৎশিষ্য এরূপ শুদ্ধ প্রতীতি লাভ করে। তিনি বৈকুণ্ঠে বাস করেন এই কথা তাহার সম্বন্ধে বলা কিছু বড় কথা নয়। এরূপ ঐক্য ভাবনায় প্রতিষ্ঠিতকে দেখিয়া ক্ষীর সাগরবাসী দেবতা হাসেন। সেই পরম দেবতার

সত্তা ভিন্ন তাহার সমীপে তিলমাত্র স্থান নাই তাঁহাকে এক দেশস্থিত দেবতা বলিয়া ভাবিবার কথা তাহার মনে স্থান পায় না। বৈকুণ্ঠ বা ক্ষীরসাগর যাঁহার প্রকাশে তাঁহাকে প্রকাশ করে সেই পরমাত্মা বৈকুণ্ঠবাসী অথবা ক্ষীর-সাগরবাসী এই কথা বলাও নিরুপাধি ব্রহ্মকে উপাধিযুক্ত করা বলিয়া মনে হয়। যিনি সর্ব্বত্র পরামাত্মারূপে পূর্ণ প্রকাশ তাহাকে একদেশী বলিয়া মহিমা বর্ণনা যুক্তিযুক্ত নয়। অতএব পূর্ণ ব্রহ্ম অনাশ্রয়ী! বৈকুণ্ঠাদি আশ্রম তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। অখণ্ডের আবাহন, অধিষ্ঠানের আসন, সর্ব্বগতের সিংহাসন কল্পনা নিজকল্পনা। যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মরূপ দর্শন করেন তাহার নিজের কল্পনাবৃত্তিতেও তাহারই পরব্রহ্মস্থিতি কল্লান্তেও ভঙ্গ হয় না। পরব্রহ্ম প্রাপ্তি এই প্রকার, ইহা লাভ করিলে সাধক নিত্য নিশ্চিত দ্বৈতভাব ত্যাগ করিয়া একাত্মিত্ব লাভ করে। পরমার্থ বস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধক অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা ত্যাগ করেন। তিনি বল্কল অথবা অপরের পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রখণ্ড ধারণ করেন এবং যথাপ্রাপ্ত শাক ফল মূল কন্দ প্রভৃতি ভোজন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। পরমার্থ সাধন ছাড়িয়া তিনি অন্নবস্ত্রের সন্ধান কখন করিবেন? ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া তিনি দ্বারে দ্বারে অন্নবস্ত্রের জন্য একতিল আয়ু ব্যয় করেন না। জ্ঞানী সাধক উহার জন্য কোথাও যাওয়া আসা করেন না। এই দেহ অদৃষ্টাধীন জানিয়া দেহ রক্ষার ভার অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেন। সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও কেহ অদৃষ্টকে অতিক্রম করিয়া বেশী সংগ্রহ করিতে পারে না, জ্ঞানী সাধক এইরূপ বিশ্বাস করেন। অতএব যেটুকু পাওয়া যায় উহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া সাধক স্থির থাকিয়া গুরুবাক্যানুসারে আনন্দে পরমার্থ সাধনায় দেহের প্রারব্ধ অনুসারে সুখ দুঃখ হয় এইরূপ ভাবনায় সন্তুষ্ট থাকেন। গুরু-বাক্যামৃতের পরম মধু আস্বাদনে তিনি মুগ্ধ। দেহের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে ভোজন পান, তাহা বলিয়া গুরুবাক্য বিনা সে দেহের মমতায় মন লাগায় না। অযাচিত ভাবে যদৃচ্ছাক্রমে যাহা পাওয়া যায় তাহাই মঙ্গল বলিয়া গুরুবাক্যবলে আনন্দে সেবন করে। দেহ ধারণ ভিন্ন অপর কিছুর অভিলাষ না করিয়া সাধক যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। প্রারব্ধ অনুসারে সুখ দুঃখ, সাধকের অন্তরে কিন্তু সন্তোষ, ইহা গুরুবাক্য বিশ্বাসের ফলেই সাধক লাভ করে। সে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আদর পূর্ব্বক গুরুদেবের সমীপে

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্কর্ম্ম দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥২৬॥

ভাগবত শাস্ত্র পাঠ করে, উহাতে তাহার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত জ্ঞানের উদয় হয় ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ সগুণ বা নিগুর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন অথবা ভগবান্ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন সেই ভগবদ্ গুণানুবাদকেই, হে রাজন্, আপনি ভাগবত শাস্ত্র বলিয়া জানিবেন। বিশেষ করিয়া সেই বাক্য বিচার পূর্ব্বক উহাতে প্রেমযুক্ত হইয়া থাকুন। গুরুমুখে সেই উপদেশ শুনিলে উহা অধিক মধুর অনুভব হয় এবং শ্রীভাগবতের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয়। ফলে শ্রোতার মনোরথ পূর্ণ হইয়া বিষয় ভোগের ইচ্ছা প্রশমিত হয়। মনে বিষয় ভোগের আনন্দ ভাবনা নাই অথচ বাহিরে বিষয় আবশ্যক এই অবস্থায় বিষয় সাধক জীবনের বাধক হইয়া অনুতাপ সৃষ্টি করে। অনিবার্য্য বিষয় তাহাকে ত্যাগ করে না বলিয়া মুমুক্ষুর মনে অত্যন্ত অনুতাপ ব্যথা হয়। বিষয়ের প্রতি প্রীতিও নাই আর বিষয়ের নিবৃত্তিও নাই এইরূপ এক স্থিতি, শাস্ত্র তাহার জন্য কিছু নিয়ম বিধান করিয়াছেন। যাহারা কেবল বিষয়াসক্ত তাহারা কখনও শাস্ত্রার্থ স্বীকার করে না। যাহারা জীবন্মুক্ত তাহাদের জন্য শাস্ত্র মানা আর না মানা সমান কথা। মরীচিকায় জল দর্শনের মতই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সমীপে বিষয়দর্শন অর্থহীন। তাহারা বিষয়ের নিবৃত্তির জন্য আর কোন্ নিয়ম মানিবেন? এইভাবে দেখা গেল অতি আসক্ত এবং অতি বিরক্ত এই উভয়ের নিমিত্তই কোনো নিয়ম আর চলে না। কেবল মুমুক্ষুর জন্যই শাস্ত্রের যত বিধি বিধান নিয়ম কানুন।

গুরুশিষ্য সংবাদে জ্ঞান হয়। তাহার মধ্যে বিষয় পড়িলে উহা ত্যাগ করাইবার নিমিত্তই শাস্ত্রার্থ বিধান। মন, বাক্য ও কর্ম্মের বাধা—এই ত্রিবিধ বিষয় বাধা দূর করিবার জন্য ত্রিবিধ বিশুদ্ধ নিয়ম শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছে। মনোবাক্ কর্ম্মদণ্ডং চ সত্যং শমদমাবপি। মনের জন্য নিয়ম উপশম, ইন্দ্রিয়ের নিয়ম দম, আর বাক্যের নিয়ম সত্য কথন। তিনটির জন্য তিন প্রকার বিধান। বিষয়ের কামনা মত্ত গজ, অহংকারে পূর্ণ উন্মাদ, দেহের তারুণ্যে উহা অতিশয় বলবান হইয়া বিধি বিধানের সকল

শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলে! এই মত্ত হস্তী সুহৃদ, রাজা, গুরু যে কেহ হউক না কেন সকলকেই ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। তাহার শুঁড় যেন আকাশমণ্ডল আলিঙ্গন করে পরে অতি দুস্তর নরকের নদীর মধ্যে ডুবাইয়া দেয়। কখনও ধর্ম্মজলে সর্বাঙ্গ ধুইয়া আবার পরক্ষণেই লোভের ধুলায় সর্ব্বাঙ্গ সমস্তক কর্দ্দমাক্ত করে এবং ব্রহ্মাদি দেবতার মত নিজেকে মনে করিয়া অহংকারে গর্জ্জন করিতে থাকে। বিবেকই এই হাতীর মাহুত, তাহার হাতে শাস্ত্রবিধি অঙ্কুশ, সে এই হাতীর মাথায় চাপিয়া বসে এবং সংযত করে। তাহাকে বৈরাগ্যযুক্ত পাহারায় রাখিয়া দম বা ইন্দ্রিয় দমনের শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ করিয়া সেই বিবেক মাহুত তাহাকে সত্যস্বরূপ স্তম্ভে বাঁধিয়া রাখে।

কায় মন বাক্যের কর্ম্ম ইহারা বিষয়ের বাধা দেয় বলিয়া এই তিনের জন্য তিনটি নিয়ম করা হইয়াছে। সেই তিন বিধানের মর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর।

শম গুণের এই প্রকার অবস্থা যে উহাতে মন বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমার্থ জ্ঞান আনয়ন করে। সূর্য উদয়ের পূর্ব্বেই যেরূপ ত্রিলোকের আঁধার দূর হইয়া যায় সেই প্রকার গুরুবাক্যে শমধর্ম্মের প্রাপ্তি এবং মানসিক বিষয় নিবৃত্তি হয়। গুরুবাক্যেই বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিকে দমগুণের উদয়ে সংযমিত করে। ইন্দ্রিয় কর্ম্মেই শমগুণের সংগতি ও বিষয় ভোগের নিবৃত্তি সাধিত হয়। কন্যাকে প্রতিপালন করিয়া যথা-সময়ে যেরূপ সেই কন্যাকে দান করা হয়, তখন কন্যা পিতার কুলগোত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করে সেইরূপ দমগুণে ইন্দ্রিয়গণ সকল বিষয়ই পরিত্যাগ করে। বাক্য যদি কোনোমতে বিকল হয় তখন সত্যরূপ শৃঙ্খলে উহাকে বাঁধিয়া ফেলা হয়। সত্যধৃত বাণী অটল, উহা কখনও অন্যথা হয় না। "ব্রহ্মাদি দেবতাও সত্যবাদীকে বন্দনা করেন। অসত্যে অধোগতি হয়।" এইরূপ কথা যাহারা বলেন তাহারাও অসত্য বলিতে পারেন। কিন্তু রাম নামের সতত উচ্চারণ ও স্মরণে যে বাণী পবিত্র হইয়াছে উহা কল্পান্তেও আর অসত্যের মধ্যে পড়িবে না। একবার মন্থনদণ্ডদ্বারা নবনীত তুলিলে সেই নবনীত আর ডুবিয়া যায় না। সেইরূপ নাম একবার বাণীতে উঠিলে আর অসত্য কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। রবির কিরণ পাইলে ঘৃত যেরূপ আপনিই

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুত কর্ম্মণঃ ।
জন্ম কর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্ ॥২৭॥

গলিয়া যায় সেইরূপ সত্যের প্রকাশ হইলে অসত্য নির্ম্মূল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। চন্দন বৃক্ষের সান্নিধ্যে আসিয়া যে ভাবে বন্য বৃক্ষও চন্দনের গন্ধযুক্ত হইয়া যায় সেইরূপ নাম প্রভাবে বাণীতে সত্য প্রকাশিত হয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন খদ্যোতের প্রভা দৃষ্টির অগোচর হয় সেইরূপ নামের প্রকাশে অসত্য আপনিই লোপ পায়। অমাবস্যার পর যে ভাবে ক্রমে চন্দ্রের বিম্ব প্রকাশিত হইতে থাকে, রাহুগ্রাস মুক্ত হইলে যে ভাবে চন্দ্রের প্রকাশ হয় সেই ভাবেই অসত্য পরাভূত হইয়া বাণীতে সত্যের প্রকাশ হয়। রাজার আজ্ঞায় প্রজার মত সত্যের নিয়ন্ত্রণে বাণীর প্রকাশ। সত্য ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নাই। সত্যেই সৎস্বরূপের প্রাপ্তি। সত্যেই সাধক নিষ্পাপ। এই প্রকারে কায়মনোবাক্যে শম, দম ও সত্য এই তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণ হইলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। পরম মঙ্গলের নিমিত্ত সাধক অন্তরে ভাগবত শাস্ত্রের অনুশীলন করিবে, পরন্তু অপর শাস্ত্রকে কখনও হিংসা নিন্দা করিবে না। এক শাস্ত্রের প্রশংসা, অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করিলে অঙ্গী অর্দ্ধাঙ্গ বাধ হয়, এজন্য সাধক শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করিবে না। অর্দ্ধাঙ্গিনী লক্ষ্মীর বন্দনা করিয়া চরণস্থিতা গঙ্গার কি নিন্দা করা যায়? নিজের মাতাকে নমস্কার করিবে আর অপর স্ত্রীলোককে অপমান করিবে? পদাঘাত করিবে? অতএব আদর করিয়া নিজের আরাধ্যকে ভজন করিবে। নিন্দা স্তুতি ত্যাগ পূর্ব্বক নিজ সত্যব্রতে মৌনী হইয়া থাকিবে। তবেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার পাইবে। এই প্রকার তাৎপর্য্য না বুঝিলে কষ্ট যাইবে না। একনিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ ভক্তি করিলে হরিভক্ত অনায়াসে মুক্তি পাইবে। সেই ভক্তির কথা, হে রাজন্, আপনার নিকট বলিতেছি। হরি-ভক্তের অনায়াসে পরমাত্মার প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥২৬॥

মুখ্য ভক্তিলাভের উপায় পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির জন্ম কর্ম্ম এবং গুণাবলী শ্রবণ ও আনন্দে হরিকীর্ত্তন। হরিকীর্ত্তনের তুলনায় অপর সর্ব্ব-প্রকার সাধন অতি অল্প শ্রীহরির লীলা অত্যন্ত মহিমাময় ও অদ্ভুত। উহা কীর্ত্তন করিলে মনের পরম উল্লাস। ভাসমান শিলায় সৈন্য সাগর পার হইল,

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈ নিবেদনম্ ॥২৮॥

গোবর্দ্ধন হাতে তুলিয়া ধরিল, নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া রাতারাতি দ্বারকায় মথুরাকে আনয়ন করা হইল। গুরুপুত্রকে যমপুরী হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইল, অগ্নি গ্রাস করা হইল; নিজের মাতার সন্তোষের নিমিত্ত মৃত পুত্রগণকে আনিয়া দেওয়া হইল; অজ হইয়াও কতবার জন্ম নিলেন; কর্ম্মাতীতেরও কত কর্ম্ম গীত হইল আর নির্গুণেরও কত গুণ বর্ণনা করা হইল। ইহাতেই শ্রীপতির সুখোদয়। যিনি স্বরূপতঃ একমাত্র সুখের মূর্ত্তি তাহারই জন্ম কর্ম্ম গুণ বৈভব গান করিলে তাহার অত্যন্ত সুখ হয়, আনন্দ গৌরবে দুলিতে থাকেন। এই প্রকার তাহার কীর্ত্তি গান করিলে হৃদয়বৃত্তি নির্ম্মল হয়, তাহাতে ধ্যানের মূর্ত্তির উদয় হয়। হে রাজন্, সেই রূপ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, মধ্যদেশে কটিবন্ধ, পীতবাস, কণ্ঠ হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত বৈজয়ন্তী মালা, ঘনশ্যামল মূর্ত্তি সুস্পষ্ট। এই প্রকার সুন্দর সগুণমূর্ত্তি মনশ্চক্ষুতে বিরাজিত। অথবা এই নাম রূপ গুণ নিরসন করিয়া পূর্ণব্রহ্ম নির্গুণ স্বরূপ অন্তরের চৈতন্যরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার ধ্যানসিদ্ধ হইলে ভক্তের বাহ্য ও আন্তর সকল কর্ম্ম এমন কি স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সহ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণার্পণ হইয়া যায় ॥২৭॥

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ, গ্রহণাদি সময়ে উত্তম দান, স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ, তপস্যা, যথোচিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন, আগমোক্ত যথাশাস্ত্র যথাবিধি গুরুর সমীপে দীক্ষা গ্রহণ, শুদ্ধ মন্ত্রলাভ অথবা কেবল নাম জপ প্রভৃতি যাহা কিছু অনুষ্ঠান উহাদের সংকল্প ত্যাগ না করিয়া নির্ব্বিকল্প কৃষ্ণার্পণ করিবে। যে হরির অনন্য শরণ গ্রহণ করে সে পূর্ণভাবে হরির প্রীতিপাত্র হয় এবং হরি তাহাকে প্রতিপালন করেন ঠিক মায়ের মতই স্নেহে। এই জন্য জীবন ধারণের নিমিত্ত যে কিছু প্রচেষ্টা সকলই কৃষ্ণার্পণ করিবেন। জ্ঞানীভক্ত কখনও 'ইহা আমার, এই প্রকার অভিমান করিবে না। যে সকল বস্তুর উপর নিজের আসক্তি বা প্রীতি সেই সকল বিষয়ই গুরুবাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক ভক্ত কৃষ্ণার্পণ করিবে। এ জন্য সে অষ্ট প্রহর নিজের জীবনটিকে সেবার কর্ম্মে লাগাইয়া রাখে, অর্দ্ধ নিমিষের নিমিত্তও বিষয় ব্যাপারে মন দেয় না। অন্নের দায়ে সে কখনও

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥২৯॥

ধনীর পদতলে শরণ নেয় না, বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষে সে অর্দ্ধ নিমেষ আয়ুস্কালও ব্যয় করে না। কেননা সে জানে লক্ষ মুদ্রার বিনিময়েও অর্দ্ধনিমেষ আয়ু পাওয়া যাইবে না। এরূপ অমূল্য পরমায়ুকে পরমার্থ লাভের নিমিত্ত প্রয়োগ করিয়া সে বিষয়ের উপর থুথুৎকার প্রদান করে। রাজা প্রজাসহিত সমগ্র রাজ্য বৈভব পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করে এবং বিষয়ে থুৎকার দিয়া পরমার্থ সাধন করে। পূর্ণ ভক্তির মাধুরী কি বলিয়া বর্ণনা করিবে? যথার্থ ভক্ত অর্দ্ধক্ষণও বৃথা যাইতে দেয় না। সমগ্র আয়ুস্কাল কৃষ্ণার্পণ করিয়া দেয়। এই ভাবে স্ত্রীপুত্র যে কেহ আছে সকলকেই সে ভগবৎসেবায় অর্পণ করে। পুত্রপত্নী আমার, এই মমত্ববুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করে না। স্ত্রী পুত্র গৃহ এবং নিজের দেহ বা সম্পত্তির মধ্যেও সেই পরমাত্মার পূর্ণ প্রকাশ দর্শন করিয়া সে সংকল্প ভিন্নই অর্থাৎ আমি অর্পণ করিতেছি এই ভাবনা ভিন্নই সহজভাবে ব্রহ্মার্পণ করিয়া থাকে ॥২৮॥

এই প্রকার স্ত্রী পুত্র গৃহ দেহ সম্পত্তি শুদ্ধ শ্রদ্ধায় আত্মার্পণ করিয়া সর্ব্বকাল যে ভজন নিরত হইয়া থাকে সেই ভক্ত হরির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আরও প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে অবস্থানকারী পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে যে নিজহিত সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব বলিয়া ভজন করে তাহার যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়স্থ নির্গুণ পরমাত্মার প্রতি দৃষ্টি স্থির না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বাত্মভাবে সে সগুণ শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া ভজন করে। ধ্যানের পর সেই মূর্ত্তি থাকে না বলিয়া প্রতিমা ভজনের নিমিত্ত চল ও অচল এই দুই প্রকার মূর্ত্তি গুরুর উপদেশ অনুসারে সমান ভাবিয়া ভজন করে। উপাসক নিজের ঘরে যে মূর্ত্তির পূজা করে তাহাকে চলমূর্ত্তি বুঝিবে। আর দ্বারকাদি ক্ষেত্রে পাণ্ডুরঙ্গাদি পুরাণ প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিকে স্থাবর বা অচল মূর্ত্তি বুঝিবে। সকল মূর্ত্তির মধ্যে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিবে। তাহারা পূর্ণরূপে পূজনীয়। সদা সর্ব্বদা তাহাদিগকে সকলের উপর পূজা করিবে। সেই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে শুদ্ধ সদাচার সম্পন্ন অর্থাৎ শ্রোত্রিয় বেদবেত্তা শ্রেষ্ঠ, তাহাদেরও মধ্যে বেদ শাস্ত্রার্থ প্রবীণ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পূজ্য। তাহাদের মধ্যে আবার ভাগবত অর্থাৎ

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥৩০॥

ভগবদ্‌ভক্ত, যিনি নিরন্তর ভাগবত ধর্ম্ম মধ্যে তৎপর হইয়া থাকেন, যিনি নিষ্কামভাবে ভগবদ্‌ভক্তি করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাহার পূর্ণ ভাব, যাহার হৃদয়স্থ শ্রীকৃষ্ণই আত্মা, শ্রীকৃষ্ণই যাহার অনন্যস্বামী, এই প্রকার যে পূর্ণভক্ত তিনিই যথার্থ পরম পূজ্য। সুর নর দেবগণ তাহার বন্দনা করে। সেই সদ্‌গুরু শ্রেষ্ঠ পূজ্যস্থান। শিষ্য তাহাকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে।

গুরু ও ব্রহ্ম দুই সমান ইহা বলিলে ঠিক বলা হয় না, কেননা গুরুবাক্যে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধি হয়। সমান বলিলেও মূলের এই ভিন্নত্ব নষ্ট হইয়া যায় না। দেবতার সমীপে যেরূপ ভাব রাখিবে সেইরূপ ভাব শ্রীগুরুতেও রাখিতে হইবে। গুরু ও দেবতার মধ্যে ভেদভাব রাখিও না। অতএব দেবতার পূজায় গুরুর সন্তোষ আর গুরুর পূজায় দেবতার সন্তোষ। নামে দুই বটে, আনন্দ স্বরূপতায় কিন্তু এক স্বরূপই। স্বর্ণ ও কঙ্কণ নামে দুই হইলেও স্বর্ণত্বে দুই অভিন্ন, এইভাবে গুরু ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। অতএব দেহ ধন মন প্রাণ সকল দিয়া সদ্‌গুরুর সেবায় লাগিয়া থাকিবে। নিষ্কপটভাবে আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া শ্রীগুরুচরণে আত্মার্পণ করিবে। এই ভাবে সাধু ও জ্ঞান সম্পন্ন শ্রোতাকে সদ্‌গুরুর মত মনে করিবে। তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া ভক্তিসংবাদ বর্ণনা করিয়া নিজের শ্রবণ সাধন ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া থাকিবে ॥২৯॥

ভক্তগণ পরস্পর কথানুবাদ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হন এবং গুহ্য জ্ঞানের সংবাদে পরস্পর প্রেমে মুগ্ধ হন। এই হরিকথার আসক্তিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সুখময়ের সংবাদ সমালোচনায় সুখের মাধুরী আস্বাদন করেন। সুখের লবমাত্র স্বাদে সকল দুঃখ পরাজিত হয়, ভক্তি সাম্রাজ্যের আবরণ মুক্ত হইয়া যায় এবং স্বানন্দ সাম্রাজ্যের সুখ লাভ করে। সদ্ভাবে অভেদ ভজন করিয়াও ভক্ত পূর্ণ স্বানন্দ লাভ করে, তাহাতে যে চিহ্ন দেখা যায় তাহা বলিতেছি, হে রাজন্ শ্রবণ করুন ॥৩০॥

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্ ।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥৩১॥

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ
হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥৩২॥

হরিকথার মহিমা কিরূপ এই প্রশ্নও যে ভক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করে এবং উহা বিচার করিয়া যে বর্ণনা করে তাহাদের উভয়ের বহু পুণ্য লাভ হয়। পাপের ঔষধ পাওয়া যায় না! যাহার কেবল নাম স্মরণেই সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় তিনি স্বয়ং অন্তরে উদয় হইলে পাপ আর কিরূপে দেখা দিতে পারে? সাধন ভক্তি হইতে পূর্ণ সপ্রেম ভক্তির উদয় হয়—উহাই ভক্তির নিজস্থিতি। হে জ্ঞানী রাজা, সেই ভক্তির স্থিতি বর্ণনা করি শ্রবণ করুন। সদ্‌ভাবসহ ভক্তি করিলে হৃদয়ে শ্রীহরি প্রকট হন। তাহাতে ভক্তের বাহ্য দেহের চিহ্ন পরিবর্ত্তন হয়। পরস্পর অধ্যাত্ম সংবাদ হইতে থাকিলে স্বরূপের অবরোধ হয়। তখন নেত্রে জল, অঙ্গে স্বেদ, প্রাণস্পন্দন কুণ্ঠিত হইতে থাকে। চিত্তও চৈতন্যের মিলন হইলে আনন্দে কণ্ঠ ভরিয়া উঠে এবং অঙ্গে অঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দেয়, দৃষ্টিও অর্ধ উন্মীলিত হইয়া নিস্পন্দ হয়। অচ্যুতের চিন্তায় প্রেমে মন গদ্‌গদ হইয়া যায়। কখনো অট্টহাস্য, কখনো রোদন, কখনো বিলাপ আর ঊর্দ্ধশ্বাস। আবার রোদনের মধ্যেও হর্ষের প্রকাশ, আবার হর্ষের মধ্যেও বিষাদ পরিতাপ। হয়তো আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত হাসিতেই থাকিল; কখনো উদ্‌ভট সুখের অনুভবে গদ্‌গদ ভাবাপন্ন হইল। আমার অহঙ্কারেই আমাকে মোহ মদে গ্রাস করিয়াছে, উহা আজ গুরু কৃপায় জ্ঞানের উদয়ে ছুটিয়া গেল বলিয়া সে পরমানন্দে দুলিতে থাকে। সংসারের আমি আমার ভাবনা মিটিল, সদ্‌গুরু বাক্যে আমি আত্মাকে দর্শন করিলাম, এই আনন্দে সে উল্লসিত হয়। সদ্‌গুরুবাক্য কত আশ্চর্য্যজনক, যাহার ফলে আমি আত্মানন্দ অনুভব করিতেছি। আশ্চর্য

আনন্দে সে উল্লসিত। সংসারের বাতাস হইতে গুরুবাক্য আমাকে রক্ষা করিয়াছে এই বলিয়া নির্লজ্জভাবে সে নৃত্য করে। মায়ের দোলা দেখিয়া যেমন বালক নানাভাবে নৃত্য করে সেইরূপ গুরুবাক্য মাধুর্যে আত্মানন্দে নিজ ভক্ত নৃত্য করেন। আত্মজ্ঞানের ফলে নৃত্যবিনোদের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎচরণের অনুভবানন্দ স্ফূর্ত্তি হয় এবং তাঁহার মহিমা গান করিতে থাকে। সেই ভক্ত-মুখে ভগবদ্‌গুণানুবাদ কীর্ত্তন ধ্বনি ত্রিজগৎ আনন্দসুখে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সুখের উদ্‌গার তোলে। সেই প্রেম সঙ্গীত ধ্বনি বন্ধ হইলে যেন উহা অধিক উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হয়, দ্বিতীয় আর কিছু থাকে না —আমার গান আমি শুনিব, আর কেহ নাই, আমিই গায়ক আমিই শ্রোতা, আমার গানে আমিই আছি, সারা জগতে আমি ছাড়া আর কিছু নাই— জগতে তখন এক ভিন্ন দ্বৈতের কথাও থাকে না। সদ্‌ভাবে ভগবৎসেবা পরিচর্যা করিতে করিতে কর্ম্মক্রিয়া আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। এই আমি বা সেই আমি ইত্যাদি বৃত্তিও তখন লয় হইয়া যায়। এই প্রকারে সপ্রেম ভক্তি সম্ভ্রম দ্বারা সাধনার শ্রম নিরসন হইয়া যায়। সংসারের দ্বৈত ভ্রমও নিঃশেষ মিটিয়া যায়, বাণীসহ ইন্দ্রিয়গুলিরও উপরম হয়। ইহার ফলে না অদ্বৈত না দ্বৈত, না সম্মুখ না পশ্চাৎ, যাহাতে সকল সুখ আত্মসুখে বিলীন হয় এরূপ একটি স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া শিষ্য অনুভবে মগ্ন থাকে। শিশু-লালন পালনের বেদনা তাহার মাতাই জানে, সেইরূপ শিষ্যের কিভাবে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে তাহার নিমিত্ত করুণার কথা এক সদ্‌গুরুই জানেন। বালকের অলংকরণ যেমন মাতাই জানেন, সদ্‌গুরুও সেইরূপ তাহার শিষ্যকে সুখে রাখিবার চাতুর্য্য পরিজ্ঞাত আছেন। যাহার সন্ধান ইন্দ্রিয়গণ জানে না মন বাণীর অগোচর বুদ্ধির অপরিমেয় সেই আত্মবস্তু। সেই পরম তত্ত্ব চক্ষুর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, বা হাতে দেওয়ার মত পদার্থ নয়, কিন্তু সদ্‌গুরু উহা শিষ্যের অনুভব গোচর করাইয়া দেন। শিষ্যকে প্রবোধ দান করিয়া অগাধ জ্ঞানমূর্ত্তি সদ্‌গুরু শিষ্যের আত্মানন্দে পরমানন্দ অনুভব করেন। শিষ্যের যেমন যেমন পরব্রহ্ম অনুভব হইতে থাকে সদ্‌গুরু তেমন তেমন তাহার ভ্রম নিরসন করিয়া দেন, উহাতে তাহার পরম সুখ সংভ্রম ও উল্লাস। নিজের সৈন্য শত্রু-চক্র পরাজিত করিলে রাজার যশের পতাকা উড্ডীন হয়, সেইরূপ শিষ্য পরমানন্দে মগ্ন হইলে গুরুর নিরাবিল সুখাবস্থা অনুভব। এই প্রকার শিষ্য

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥৩৩॥

শ্রীরাজোবাচ।

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥৩৪॥

বিষয়ে যে সদ্‌গুরুর অন্তরে সীমাহীন করুণা তাহারই নিকটে পূর্ব্ববর্ণিত ভাগবত ধর্ম্ম অনন্য শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষা করিবে ॥৩১-৩২॥

এই প্রকার ভাগবত ধর্ম্মস্থিতি সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করিয়া ভগবদ্‌ভক্তির অভ্যাস করিবে, তাহা হইলে মায়ার শক্তি আর বন্ধন করিতে পারিবে না। বেদশাস্ত্র পাঠ করিলেও মায়া যায় না। ব্রহ্মাদি দেবতারও দুস্তরা এই মায়া। ভগবৎপরায়ণ শ্রীহরিনাম মাত্র স্মরণ করিয়া সুখে এই মায়া পার হইয়া যায়। হরিনামের ধ্বনিতে মায়া পলাইয়া যায়, এবং হরিভক্তের সুখে মায়া পার হইবার পথ করিয়া দেয়। মায়া পরাৎপর শ্রীনারায়ণের, অতএব শ্রীনারায়ণের পদাশ্রয় করিলে অনায়াসে মায়া পার হওয়া যায়। এই নিমিত্ত ভজনের উপায় বলা হইয়াছে। মায়াপার যাইবার উপায় প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যায়. হে রাজন্, মায়া তরণের মুখ্য উপায় ভগবদ্‌ভক্তি, ইহা নিশ্চিত ভাবে জানিবে। ভক্তির নিকটেই নিত্যতৃপ্তি অবস্থান করে। ভক্তির কাছেই নিত্য মুক্তি বাস করে। ভক্তির সঙ্গেই ভগবৎপ্রাপ্তি। হরিভজনেই মায়া নিবৃত্তি। হরিনাম ভজনের স্রোতে মায়া ভাসিয়া যায়। ভক্ত অনায়াসে হরিভজন বলে মহামায়া পার হইয়া যায়। নারায়ণে ভক্তি করিয়া ভক্ত অনায়াসে পার হইয়া যায়—এজন্য নারায়ণের মুখ্য স্থিতি সম্বন্ধে রাজা (নিমি মহারাজ) স্বয়ং জিজ্ঞাসা করেন ॥৩৩॥

সর্ব্বভূতে ভগবদ্‌ভাব মায়া নিস্তারের মুখ্য উপায়। এই কথা শুনিয়া রাজার আনন্দ হইয়াছে, সেই আনন্দে পূর্ণ হৃদয় হইয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। নারায়ণে ভক্তি করিয়া উত্তম ভক্ত মায়ার পার হয়। সেই নারায়ণের স্বরূপ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্ম পরমাত্মা নারায়ণ এই পরম বস্তু এক তথাপি তাহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য রাজার প্রশ্ন।

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ।

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥৩৫॥

সর্ব্বত্র অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণরূপে তাহার অধিষ্ঠান বলিয়া এই স্বরূপের নাম নারায়ণ, এই কথা স্বয়ং বেদ বলেন। তোমার মত জ্ঞাননিধি মহাভাগ্যোদয়ে লাভ করিয়াছি। তোমার বচনামৃতে কায়মনোবাক্য শুদ্ধ হয় এবং অহংবুদ্ধি জাগে না। তোমার বাক্যে স্বানন্দ স্ফূর্ত্তি পূর্ণ হইয়া উচ্ছ্বলিত হয়, চিত্ত বৃত্তির লালসা জাগ্রত করে এবং অতৃপ্ত শ্রবণ আরও শুনিতে ইচ্ছা করে। রাজার এই শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন শ্রবণে প্রবুদ্ধের অনুজ পিপ্পলায়ন যোগীন্দ্র নিজানন্দে বলিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

যাহা হইতে সৃষ্টির আরম্ভ, স্থিতিশীলতা ও প্রলয়ের প্রলয়কারিণী শক্তির আবির্ভাব—এরূপ যে ত্রিলোকের মুখ্য কারণ, যাহার পর জগতের আর কোনো কারণ নাই, যিনি নিজের সত্ত্বায় সত্ত্বাবান এবং হেতুরহিত হেতু সদা সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশ তাহাকে নিশ্চয় নারায়ণ বলিয়া জানিবে। সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন ত্রিকালেই যেমন আকাশ নির্লিপ্ত সেই প্রকার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সর্ব্বাবস্থায় পরমাত্মা নারায়ণকে অলিপ্ত বলিয়া জানিবে। উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের অন্ত কে দেখে এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চিতভাবে বলা যায়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় ব্যাপিয়া সমাধিরও পর যাহাকে সাক্ষীরূপে স্ফূর্ত্তি হয় তাহাকে নিশ্চিতভাবে নারায়ণ বলিয়া জানিবে। জাগ্রতে জ্ঞানাভিমান, স্বপ্নের মিথ্যা ভান, সুষুপ্তির পূর্ণ সাক্ষী, নারায়ণ ভিন্ন আর কেহ নয়। এই ভাবে পরমাত্মা পরমজ্যোতি হৃদয়স্থ আত্মা ত্রিলোকে নারায়ণ নামে পরিচিত, হে রাজন্, ইহা অবধারণ করুন। এই ভাবে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তির কথা বলিতে গেলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অগম্য বলিয়াই মনে হয়। যাহাতে অনায়াসে ব্রহ্মবস্তু অধিগত হইতে পারে তাহার সহজ উপায় বর্ণনা করিতেছি, ব ণ করুন। পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা তোমার হৃদয়েই আছেন। তাহার সহিত

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়ানি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥৩৬॥

যুক্ত থাকিয়াই মন বুদ্ধি প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞান হয়। তাহারই আলোকে নয়ন দর্শন করে। রসনা তাহার স্বাদেই স্বাদ গ্রহণ করে। শ্রবণ তাহার শক্তিতেই শব্দ জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হয়। তাহার অহংকারে অহংভাব। তাহার মনেই মনন? তাহার চিত্তেই চিন্তাসম্ভব। বুদ্ধির বুঝাপড়া ব্রহ্ম অববোধে। তাহার যোগে জড়দেহ সচেতন। তিনিই কাহাকে মৃদু আর কাহাকেও কঠিন করেন। তাহার চরণেই গমন পদচারণা। তাহার সত্তায় করের ক্রিয়া গ্রহণ। তাহা হইতে প্রাণের বিচরণা এবং নিমেষ বা উন্মেষ স্ফূর্ত্তি। তাহারই আনন্দলেশ সংস্পর্শে প্রাণীমাত্র উপস্থদ্বারে সুখ ভোগ করে। ত্রিলোকের যিনি চালক যিনি নিজানন্দে হৃদয়ে অবস্থান করেন তাহাকেই নারায়ণ বলা হয়। তিনিই পরমাত্মা। যাহার অনুগ্রহে মন বুদ্ধি প্রাণ ইন্দ্রিয় সকলে বিচরণ করে সে এই ইন্দ্রিয়গণের অধীন হইবে ইহা কল্পান্তেও সম্ভব নয়। তখন স্বরূপ জানিয়া আমি পরিজ্ঞাতা হইলাম এরূপ ভাব থাকে না। জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বও জ্ঞান স্বরূপে লয় পায়, জ্ঞাতা আর থাকে না। জানা অজানা সকল ভাব দূর হইয়া কেবল সদ্‌ভাবের উদয়ে স্বয়ং ব্রহ্মভাবই লাভ হয় ॥৩৫॥

সাধক মনে বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, ক্ষীর সাগর, পরিকল্পনা করিতে পারে কিন্তু আত্মার ধারণা করা মনের সামর্থ্যের অতীত। যে মন নিজের শক্তিতে ত্রিভুবন কল্পনা করিতে পারে সেও আত্মস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব আত্মাকে অগম্য বস্তু বলিয়াই জানিবে। যে মন বুদ্ধিরই অগোচর সে তো বাক্যের অনেক দূরে। অতএব পরাৎপর পরব্রহ্ম বস্তু শব্দের গোচর হয় না। আকাশকে বন্ধন করিতে গেলে যেমন চারিদিকে থাকিয়া বন্ধন অসম্ভব করে, সেইরূপ শব্দ ও অর্থদ্বারা পরব্রহ্মকে বুঝাইতে গেলেও শব্দার্থ ধর্ম্মাতীত ব্রহ্ম তাহার বাহিরেই থাকিয়া যায়। প্রাণের যে ক্রিয়াশক্তি চলে উহা দ্বারাও পরব্রহ্মের অবধারণ হয় না। ইন্দ্রিয় আর

কোথায় লাগে? চঞ্চল সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হইলেই উহা দ্বারা যেরূপ সূর্য্য মণ্ডল ধরা যায় না সেইরূপ পরমাত্মার শক্তিতে ক্রিয়াশীল হইলেও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা পরমাত্মাকে ধরা যায় না। মনের যে আদি মন, বুদ্ধির জ্ঞান বুদ্ধি, যে নয়নের আদি নয়ন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঘ্রাণগ্রহণ শক্তি, যে রসনায় রসনা, যে ত্বকের নিজস্ব ত্বক্, জীবনের যিনি জীব সেই স্বয়ং ব্রহ্ম। যে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা সে ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বিষয় হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধির দৃষ্টি পোঁছায় না সেখানে মন আর কি ভাবে মনন করে? শ্রবণ, নয়ন ও ঘ্রাণযোগে বিষয় সংযোগে কিভাবে তাহাকে মিলিবে? যেখানে প্রাণশক্তি চলে না, বাণী লজ্জায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সেখানে কোন্ কাজে লাগিবে? অগ্নি ভিন্নই অনেক জ্বালা ক্ষণে ক্ষণে অনুভূত হয় আবার সেই জ্বালা হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয় তথাপি সেখানে অগ্নির প্রকাশ নাই। অথবা সূর্য্যভিন্নই অসংখ্য সূর্য্যকান্ত মণির জ্যোতি প্রকাশিত হয় কিন্তু সেই প্রকাশে সূর্য্যকে দেখা যায় না। যেমন সমুদ্র ভিন্নই অগণিত তরঙ্গ দেখা যায় কিন্তু সমুদ্রকে পূর্ণরূপে দেখা যায় না। সেই প্রকার ব্রহ্ম ভিন্নই অনেক ইন্দ্রিয় অনেক ভাবে প্রকাশিত হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে জীব ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে না। কদলীবৃক্ষ ভিন্নই কদলীর উৎপত্তি, মধুর রস ভিন্নই ইক্ষুর উৎপত্তি, সেই প্রকার ব্রহ্ম ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ জানিবে—তবে ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে না।

এখানে আশংকা করা হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারে যদি ব্রহ্ম-জ্ঞান না হয় তবে জীবের ভববন্ধন কোনো কালে ছুটিবার সম্ভাবনা থাকে না, আর জন্মমৃত্যু ও বরাবর চলিতে থাকিবে।

শব্দ হইতেই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় এরূপ শ্রুতিবাক্যের যুক্তিও মিথ্যা হইয়া যায় এরূপ সিদ্ধান্ত, হে রাজন্, আপনি স্বীকার করেন। সেই তাৎপর্য্য সাবধানে শ্রবণ করুন। শব্দও নিজে (বিদ্যাবৃত্তিকে উৎপন্ন করিয়া) লয় পায়, জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া যায়।

পূর্বোক্ত শ্লোকার্দ্ধ যথা—"শব্দোঽপি বোধকনিষেধ তয়াত্মমূলমর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ।"

জীবের সংসার বন্ধন মোচনের নিমিত্ত বেদ উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছে।

অন্য সকল বিষয় বিচারের পর ব্রহ্মতত্ত্বই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। শ্রুতি 'নেতি নেতি' শব্দ দ্বারা অতদ্ ব্যাবৃত্তি নিষেধবোধ জাগ্রত করেন অর্থাৎ ইহা নয়, উহা নয়, যাহা তুমি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্ধারণ কর উহা ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম তোমার বাক্যবিচারের বিষয় হয় না, এইভাবে অনাত্ম পদার্থ নিষেধ মুখে বলেন। সাক্ষাৎ বেদবাক্যে শব্দদ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করেন না। পরব্রহ্ম শব্দের বাচ্য নয়। শব্দে যাহার সঙ্কেত করে মাত্র তাহাকে পরব্রহ্ম রূপ জানিবে। শ্রুতি 'নেতি নেতি' এই বাক্যে ব্রহ্ম বিষয়ে শব্দের যোগ্যতা নিষেধ করিয়াছে। শব্দ নিঃশব্দ হইয়া যাহার সঙ্কেত করে উহাই পর ব্রহ্ম। শব্দ নিজেকে নিষিদ্ধ করিয়া যাহার জ্ঞানের উদয় করায় সেই তত্ত্বে যাহার বুদ্ধি সমরস লাভ করে সে ত্রিবিধ প্রকারে বিশুদ্ধ পর ব্রহ্ম লাভ করে। সকলের নিষেধের অবধি এই তত্ত্বে। শব্দ নিজের সকল শক্তি (বাচ্য, লক্ষণা ও ব্যঙ্গ) লয় করিয়া জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটায়। তখন শব্দ হইতেই অপরোক্ষানুভব এই কথা তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়। বাক্য নিঃশেষ হইয়া নিবৃত্ত হয়, মন বুদ্ধি তাহাকে পায় না, নিষেধের অবধি এখানেই, উহাই পরব্রহ্ম। যে বাক্যকে পরিচালিত করে অথচ বাক্য যাহাকে বলিতে পারে না। যাহার শক্তিতে মন বুদ্ধি জ্ঞান যুক্ত হয় কিন্তু মন বুদ্ধি যাহাকে জানে না। যাহা দ্বারা নয়ন দর্শন করে কিন্তু যাহাকে নয়ন দর্শন করিতে পারে না। যাহাতে শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় চেতনা লাভ করে কিন্তু যাহার ধ্বনি শুনিতে পারে না। গন্ধানুভব হয় না। এই প্রকারে সকলকার জ্ঞান যিনি অথচ কেহ যাহাকে জানিতে পারে না। যাহাকে জানিবার মত আর দ্বিতীয় কেহ নাই এইরূপ যে স্বয়ং বেদ্য অর্থাৎ আপনিই আপনার জ্ঞাতা জ্ঞেয়, যাহাকে জানিবার দ্বিতীয় নাই তাহাতে শব্দ প্রবেশ করিবার অবকাশ নাই। যাহা কৃশ বা মোটা নয়, বক্র বা গোলাকার নয়, যে সূক্ষ্ম বা স্থূল নয়, কেবল যে বস্তু নির্ব্বিকার। যাহার রূপ বা গুণ নাই, কোনো আশ্রম বা বর্ণ নাই, যাহার মৃত্যু বা জন্ম নাই, যে হাল্কা বা ভারী নয়, রোগা বা পুষ্ট নয়, পূর্ণ বা শূন্য নয়, এরূপ নিঃশেষ সর্ব্বধর্ম্মরহিত। যে হ্রস্ব বা দীর্ঘ নয়, যে বড় বা ছোট নয়, যাহাকে বিচার করিতে বসিলে সকল বিচার নিঃশেষিত হইয়া যায়। যাহার আদি অন্ত নাই, যাহার মধ্যস্থিতি নাই, যাহাকে গুণবান্ বা গুণাতীত কিছুই বলা যায় না, যিনি অচ্যুত অনন্ত অদ্বয়। তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে বসিয়া

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥৩৭॥

বেদ কত পরিশ্রম করিয়াছে কত বিচার বিতর্কের পর লজ্জায় নেতি নেতি বাদ প্রচার করিয়াছে। বেদ কি তাহা হইলে তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইয়াই পশ্চাৎপদ হইয়াছে? তাহা নয়। তবে কি না বেদ তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াও উপযুক্ত শব্দে বর্ণনায় অসমর্থ বলিয়াই মৌন ধারণ করিয়া বসিয়াছে এবং নিঃশব্দে তটস্থ রহিয়াছে। বেদ মৌন হওয়ার ফলে অন্য শাস্ত্রও ভাবাকুল হইয়াছে, তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ মতবাদ বিতণ্ডা প্রসারিত হইয়াছে। শব্দান্তী ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ শব্দজ্ঞানের উদয়, এই লক্ষণ বেদে পূর্ণরূপে দেখানো হইয়াছে। শব্দ দ্বারাই শব্দ নিষেধ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় মৌনভাব ধারণ করিয়াছে বেদ। শাস্ত্রের রাজা বেদ মৌন ধারণ করিলে অন্যান্য শাস্ত্র ভাবাকুল হইয়া শব্দ অরণ্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া সিদ্ধান্ত সমাধান করিয়া উঠিতে পারে না। সকল শব্দ বিচারের পার যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি উহাই দর্শন শাস্ত্রেও দেখা যায়। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যেও আপনা আপনি বুঝা যাইতে থাকে এবং ত্রিজগতেও সেই একতত্ত্বই প্রতিভাত হয়। ব্রহ্ম এক অদ্বৈত সত্ত্বা এই প্রকার তাৎপর্য্য অনুভব হয়। অতএব ত্রিলোকে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়, তখন কে আর বক্তা আর কে শ্রোতা? যাহার বাসনায় বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, অহংকারের গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে, দেহের সীমায় প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইয়াছে, তাহার ঐক্য সৃষ্টি হইয়াছে। অনুভব বিষয়ে এই মধুর সংবাদ বলিতে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হইয়া পিপ্পলায়ন ব্রহ্মৈক্যরূপে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

ব্রহ্ম ও আত্মা এক এই অনুভবে প্রপঞ্চে সৎ ও অসৎ সকল সৃষ্টি ব্রহ্মরূপে দর্শন হয়। আকাশকে অবলম্বন করিয়া যেমন নীলিমা-ভান অবস্থান করে সেইরূপ ব্রহ্মে সম্পূর্ণ মায়া আনন্দে বাস করে। তাহার কার্য্য বড়ই অদ্ভুত, সে নপুংসককেও পুরুষ করিয়াছে। তাহার পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রভাব অগাধ।

নপুংসকেরও কাম উদ্রেক করিয়া, অনামাকেও নাম দিয়া, নিষ্কর্ম্মাকেও কর্ম্ম-পরায়ণ করে। সে নিঃসঙ্গের সঙ্গিনী হইয়াছে, স্পর্শ বিনাই গর্ভিণী হইয়াছে। প্রধান বা মহৎতত্ত্বের গর্ভে ত্রিগুণের বিকার যুক্ত সন্তান প্রসব করিয়াছে। এই বিলক্ষণ স্বভাব স্ত্রীলোক নিজের বিদ্যা ও অবিদ্যা স্বভাবে জীব ও শিবের ভেদ ভোগ করাইয়া জ্ঞান ও অজ্ঞানের গ্রামে বাস করে। নিরাকার সোনার মধ্যে যেমন সাকার অলংকার, সূত্রের মধ্যে যেমন বস্ত্র, ভিত্তির উপর যেমন চিত্র সেই প্রকার নিরাকার ব্রহ্মে সাকার মায়ার সৃষ্টি পরিদৃষ্ট হয়। মাটির পুতুল করিয়া নানা নামে সেগুলি পূজা করিলেও যেমন তাহাদের সকলের মধ্যে মাটি ভিন্ন আর কিছু থাকে না, সেইরূপ মায়া জগতের বিভিন্নরূপে ব্রহ্ম-বস্তুতে প্রতিভাত হইলেও কোথাও ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন আর কিছু নয়। ঘৃত পরমাণু যেমন ঘৃত হইতে পৃথক্ নয়, সেইরূপ মায়াশক্তির সৃষ্ট অনেক পদার্থ হইলেও উহা ব্রহ্ম ভিন্ন নয়। ব্রহ্ম পূর্ব্বেও এক পরে আর অনেক হবেন কি করিয়া? মায়াযোগ পরিপাক কথা বিশেষ ভাবে পিপ্পলায়ন বলেন। মূল মুখ্য ব্রহ্ম ওঁকার সেই একই তিন প্রকার হইলেন। অকার, উকার, মকার-সত্ত্ব রজ তমো গুণত্রয়াত্মক। গুণ তিনটি সমান সমান থাকা অবস্থার নাম প্রধান। উহাই ক্রিয়াশক্তির সূত্ররূপে জানিবে। উহা হইতে যে জ্ঞানের বিস্তার তাহার নাম মহৎতত্ত্ব। অহং ব্রহ্মই পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। সেখানে অহম্ হইল দেহাকৃতি দেহাভিমানে নিশ্চিতভাবে জীব বলিয়া আখ্যাত। 'ক্রিয়া' বলিতে দশবিধ ইন্দ্রিয় ব্যাপার, 'জ্ঞান' শব্দে দেবতার অধিষ্ঠান। 'অর্থ' বলিতে ভোগ্য বিষয়, ফল হইল সুখ দুঃখ। তিন গুণ, পঞ্চভূত, রূপরসাদি ভোগ্য বিষয়, চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়, জীব সুখ দুঃখ ভোক্তা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও কর্ম্মাচরণ এই সকলই পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। চিনি দিয়া যদি কাঁঠাল তৈরী করা যায় উহা কাটিয়া দেখ উপরের বল্কল হইতে আরম্ভ করিয়া বীজ পর্য্যন্ত সকলই কেবল চিনি, সেই প্রকার জগতের আকার অবিকৃত পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়। জগৎ বিশ্ব, প্রপঞ্চ এইগুলি নাম, বস্তু কিন্তু নিষ্কল পরব্রহ্ম। ইহাই উপনিষদের উত্তম তাৎপর্য্য, বেদান্তের পরম পরমার্থ তত্ত্ব। জগদাকারে ব্রহ্মই। জগৎ বিকারশীল অতএব জগতের সঙ্গে ব্রহ্মও বিকার প্রাপ্ত, হে রাজন্, এরূপ ভাবনা করিলে যথার্থ তত্ত্বলাভ হইবে না ॥৩৭॥

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধি মাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ॥৩৮॥

ব্রহ্মের পিতা মাতা নাই অতএব জন্মের কথা উঠে না। আত্মা এক-দেশস্থিত পদার্থ হইলে তাহার জননী জঠরে জন্ম হইতে পারিত। আত্মতত্ত্ব ব্যতিরিক্ত তিল পরিমাণ স্থানও শূন্য নাই। এই ভাবে পূর্ণতা দর্শন করিলে জন্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জন্মের পূর্ব্বে বালকের অনস্তিত্ব আর জন্মের পর তাহার অস্তিত্ব এই অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব ভাষা আত্মাবিষয়ে দৃষ্টি-গোচর হয় না। অতএব পূর্ব্বে ইহা ছিল না এখন আছে এরূপ অস্তিত্বের কথা কোনোকালে আত্মা সম্বন্ধে চলে না, উহা নিত্য নিরন্তর আছে। বালক দেহ লইয়া জন্মের পর প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আত্মার সেরূপ জন্ম নাই বলিয়া বৃদ্ধিও তাহার নাই। যাহার বৃদ্ধি নাই তাহার বিপরিণামও নাই। বাল্য, তারুণ্য বৃদ্ধাবস্থা আত্মার হয় না। যে আমি বাল্যে ছোট্ট সেই আমি তারুণ্যে স্থূল আবার বৃদ্ধাবস্থার খিটখিটে জীর্ণ শীর্ণ এইরূপ ত্রিকালদ্রষ্টা পরমাত্মা। দ্রষ্টা সাক্ষী সকল অবস্থার অতীত, তাহার কখনও কোনো অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয় না। দেহী আত্মা এরূপ অবস্থারহিত তাহাকেই পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিবে। সকল অবস্থার অতীত অবিকারী পূর্ণ আত্মার ক্ষীণতা নাই, তাহার জন্ম ও মৃত্যুও নাই। যে অবিকারী পূর্ণ, যাহার জন্ম মৃত্যু নাই সেই আত্মা কিরূপ এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—সে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান স্বরূপ। পুনরায় যদি শংকা হয় যে ঘটজ্ঞানে পটজ্ঞান বিনাশ পায় অতএব জ্ঞানতো ক্ষণিক, তাহা হয় না, কেননা বিষয় গ্রহণের ইন্দ্রিয় বৃত্তি মাত্র সেখানে বিনষ্ট হয়, জ্ঞান অবিনশ্বর উহা থাকিয়া যায়। এই বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টান্ত, যেরূপ প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গেলে দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে প্রাণ কিন্তু নিরবস্থ যেমন পূর্ব্বে তেমনি মৃত্যুর পরে। দেহাবস্থা প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। দেহান্তে সে চলিয়া যায়। আত্মা প্রাণেরও চেতয়িতা, সেই আত্মাতে দেহাবস্থা নাই। প্রাণের দৃষ্টান্তে পরব্রহ্মকে ভালভাবে দেহও ইন্দ্রিয় অতীত বলিয়া ধ্যান করিব। শ্লোকার্থ আরও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন ॥৩৮॥

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমপি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতি র্নঃ ॥৩৯॥

অণ্ডজ স্বেদজ জারজ উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার অবস্থায় প্রাণ সহজভাবে আত্মার যোগে অবস্থান করে। প্রাণের যোগে আত্মার অবস্থানকে জীব বলে। দেহাবস্থা প্রাণকেই বাধিত করিতে পারে না, আত্মার উপর আর সে কিরূপে প্রভুত্ব করিবে? দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে থাকিয়াও আত্মা দেহাবস্থায় অলিপ্ত। ইহা কি ভাবে সম্ভবে এই শংকার সমাধানে দৃষ্টান্ত বলিতেছি। আত্মা জাগ্রত অবস্থায় দেহাভিমান থাকে, তাহাকে সেই বিকারযুক্ত মনে হয় কিন্তু সেই দেহ ও ইন্দ্রিয় ত্যাগ করিয়া আত্মা পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রুত বিষয়ের অনুধ্যান করিয়া স্বপ্নাবস্থায় থাকে। তখন দেহ বা ইন্দ্রিয় তাহার নাই, এই অবস্থায় লিঙ্গদেহ বলিয়া জানিবে। শুধু আত্মাই এই স্বপ্নাবস্থায় জাগৃতির অভিমান ও সংকল্প অনুসারে অবস্থান করে। স্বপ্নের উপরের অবস্থা যাহাতে দেহ ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের অভিমান পর্য্যন্ত লীন হইয়া যায়, সেই সর্ব্ববিকারবিহীন সুষুপ্তিকালে পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকে। দেহেন্দ্রিয়ের অভিমান লয় পাইলে কোনো বিষয় স্ফূর্ত্তি হয় না, তখন সকলই শূন্য হইয়া যায়, যদি আত্মা চিদ্‌ঘনের সত্তা স্বীকার করা না হয়। সুষুপ্তিতে আত্মা না থাকিলে সুখের স্মৃতি কেমন করিয়া হইত? অতএব যাহাকে আশ্রয় করিয়া সুখস্মৃতি অবস্থান করে উহা সর্ব্বথা শূন্য হইতে পারে না। হে রাজন্, যে জাগ্রতাবস্থায় জাগ্রত সে-ই স্বপ্নদ্রষ্টা আবার সুষুপ্তিতে সুখ-ভোক্তা, এই তিন অবস্থায় যে সাক্ষীস্বরূপ—অবস্থাত্রয়ের পূর্ণ সাক্ষী শূন্য হইতে পারে না—সেই পরমাত্মা পূর্ণ চিদ্‌ঘনস্বরূপ। সুষুপ্তি যদি ব্রহ্মানুভব হইত তাহা হইলে পুনরায় সংসার দর্শন হইত না। সেই অবস্থায় অবিদ্যায় অহং লীন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সংসার ভ্রম হয়। অবিদ্যা অহংকার বিনষ্ট হইলে জগতের রূপে ব্রহ্মদর্শন হইত এবং জন্মমৃত্যুর ঠিকানা মুছিয়া যাইত, জীব, ব্রহ্মবিষয়ে সমরস লাভ করিত। হেতু প্রমাণ দৃষ্টান্ত প্রমেয় প্রমাতা প্রভৃতি উপাধিরহিত উদিত পরমাত্মা পরব্রহ্ম নিশ্চিত পরমানন্দ

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্‌গুণ কর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্‌যথামলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৪০॥

স্বরূপ। উহার পর আর সুখ নাই, আর কোনো অধিক আনন্দ নাই। জগতে সর্ব্বত্র সেই পরমানন্দ অনুভব স্বানন্দবোধে সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে নিজ মায়াকে নিরসন পূর্ব্বক কি ভাবে এই অনুভব লাভ হয় যদি বিচার করিয়া বলিতে হয়, তবে বলি—হে রাজন্, নিষ্কাম ভাবে যদুবর্য্য শ্রীকৃষ্ণের ভজন করুন ॥৩৯॥

অবশ্যই নির্ব্বিকার স্বরূপ প্রাপ্তি হইবে এই প্রকার মনের ভাবনা রাখিয়া অধিকতর প্রীতির সহিত অবিশ্রান্ত ভগবদ্‌ভক্তি করিবে। পুত্র ও বিত্ত প্রাপ্তির কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক লৌকিক লজ্জাকে জয় করিয়া পদ্মনাভ ভজনে মজিয়া নির্লজ্জভাবে নৃত্য করিবে। পুত্র বিত্ত লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিচরণের ভজনে ক্ষণে ক্ষণে চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যায়। রজ ও তমোগুণের কর্ম্মোদ্ভূত যে মালিন্য হৃদয়ে অবস্থান করে ভক্তি প্রেমজল ক্ষালনে সেইগুলি ধৌত হইয়া যায়। যেমন যেমন প্রেমভক্তি বৃদ্ধি পায় তেমন তেমন বিরক্তি উদয় হয় এবং আপনা আপনি বিষয়াসক্তি বিরাম লাভ করে এবং চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইয়া যায়। চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইলে সর্ব্বভূতে পরমাত্মদর্শনে অনন্য প্রীতিসহ ভজন চলিতে থাকে, ইহা উদার "ভক্তির চতুর্থী দশা"। এই ভক্তি অত্যন্ত উদার। ভক্তের অহংকার দলিত করিয়া সুর নর স্ত্রী শূদ্র সকলকে উদ্ধার করিয়া প্রতি জীবকে আনন্দময় করে। এই ভক্তি করতলগত হইলে ভবভয়ের নিঃশেষ শান্তি হয়। ভক্তের পায়ে চারি প্রকার মুক্তি আসিয়া মিলিত হয়। হরিভক্তি এরূপ উদার।

চক্ষুর দোষ থাকিলে সর্ব্বকাল পূর্ব্বদিকে সমুদিত থাকিলেও সূর্য্যকে দেখা যায় না, অন্য সকল সামগ্রীর কথাতো দূরে, কিন্তু সেই দোষ পূর্ণরূপে দূর হইলে সূর্য্যমণ্ডল এবং অন্যান্য সকল সামগ্রীই পরিস্কার দেখা যায়, সেই

শ্রীরাজোবাচ।

কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষো যেন সংস্কৃতঃ।
বিধুয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্ ॥৪১॥

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥৪২॥

প্রকার আত্মাতো নিজের হৃদয়েই অবস্থান করেন, তথাপি চিত্তবৃত্তি মলিন থাকিলে বাসনা দোষে দূষিত হইলে পরব্রহ্ম প্রকাশ অনুভব হয় না। তবে ভগবদ্‌ভক্তি করিলে চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হয়, তখন নিজ ভজন বলে ভক্তনির্ব্বিকার স্বরূপ লাভ করেন। হে রাজন্, পরমবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত জগতে ভগবদ্‌-ভক্তির কথা বলিতে হইবে তাই আমি তোমার প্রতি যথারীতি ভক্তির কথা উপদেশ করিলাম। দৃষ্টির দোষ দূর হইলে প্রকাশময় সূর্য্যের দর্শন, সেইরূপ কল্পনালোপ হইলে শুদ্ধপরব্রহ্ম অনুভব। যাহার মন যথার্থবস্তু নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া সাম্যভাবে থাকে সেই ব্যক্তি দেহে অবস্থান করিলেও তাহাকে ভব বন্ধন স্পর্শ করে না। এই প্রকারে মুক্তকণ্ঠে পিপ্পলায়ন ঘোষণা করিলে উহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত সুখী হইয়া পুনরায় কর্ম্মবন্ধন যাহাতে ছিন্ন হয় এরূপ প্রশ্ন করেন। কর্ম্মযোগের লক্ষণ পূর্ণরূপে শুনিবার জন্য রাজা আদরপূর্ব্বক প্রশ্ন করিলেন ॥৪০॥

রাজা শ্রদ্ধা সম্পন্ন অতি বিনীতভাবে প্রশ্ন করেন যাহাতে কর্ম্ম বন্ধন খণ্ডন হয়। সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মযোগ উপদেশ করুন। বলুন, কোন কর্ম্মে বন্ধন যায় এবং আপনিই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। মানুষ কি ভাবে পুরুষোত্তম ভগবানকে লাভ করে সেই কর্ম্মকথা সুন্দরভাবে আমাকে উপদেশ করুন ॥৪১॥

পুরাকালে এইরূপ প্রশ্ন সনকাদি মুনিগণ পিতা ব্রহ্মার সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন নাই কেন? আমার এই আশংকা দূর করুন। রাজার প্রশ্ন অতি পবিত্র। তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত হর্ষভরে আবির্হোত্র যোগেন্দ্র কর্ম্মবৈচিত্র্য নিরূপণ করেন ॥৪২॥

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ।

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৪৩॥

কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্ম প্রভৃতির রহস্য জ্ঞান সহজ নয়। উহাদের বিবেচনা মহা মহা স্মৃতিকারগণও শ্রেণীবিভাগ করিয়া করেন নাই। যাহারা প্রতিসৃষ্টি করিতেও সমর্থ এরূপ ঋষিগণও কর্ম্মাকর্ম্ম বিভাগ করিতে যাইয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। সমুদ্রকেও যাহারা অঞ্জলি করিয়া পান করিতে সমর্থ তাহারাও কর্ম্মসমুদ্রে হাবুডুবু খান। অগণিত মুনি ঋষি নিজ নিজ মতাভিমানে কর্ম্ম-মীমাংসায় হিম্‌সিম্ খাইয়া যান। কর্ম্মাকর্ম্ম বিভাগ জ্ঞানে স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মাই ভ্রামিতমন অপরের কথা আর কর্ম্মবিবেচনায় কোথায় লাগে?

কর্ম্ম বেদ মূলক। বেদ স্বয়ং নারায়ণ। কাজেই কর্ম্মবিজ্ঞানময় বেদস্বরূপ নারায়ণকে বিবেচনা করিতে শ্রুতি শাস্ত্র মৌন। একেরই তিনটি ভেদ কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। তাহাদের বিভাগ সাবধানে অবধারণ করুন। একই চিনি শ্বেত, মৃদু ও মধুর এই তিন ভাবে বিবেচনা করা যায়। কর্ম্মঠ মানুষ এই প্রকারই এক কর্ম্মকে তিন প্রকারে বিবেচনা করেন। মধুরতাকে ভিন্ন করিয়া বিবেচনা করিলেও উহার মধ্যে মৃদুতা ও শ্বেততা থাকেই। আবার শ্বেততাকে ভিন্ন করিলেও উহার মধ্যে মৃদুতা মধুরতা থাকে। সেইরূপ কর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলেও উহার মধ্যে অকর্ম্ম এবং কর্ম্ম অকর্ম্মের মধ্যে বিকর্ম্মকেও দেখা যাইবে। মুখ্যতঃ প্রথমে যাহা উৎপন্ন হয় উহাকে কর্ম্ম বলা যায়। বিহিত অবিহিত যত ক্রিয়া উহাদিগের নাম বিকর্ম্ম। অকর্ম্মের মধ্যেও যে আত্মসত্তায় অবস্থান হেতু কর্ম্মকে দেখে এবং বিকর্ম্মের মধ্যেও যে তাহারই রহস্য দেখে সে গুরুকৃপায় তৎকালে নিষ্কর্ম্মতা লাভ করে। একটি কর্ম্মের পর আর একটি, এমন করিয়া কর্ম্ম কেবল বাড়িয়া গেলে তাহাকে বিকর্ম্ম বলা যায়। যে কর্ম্মে পূর্ণরূপে প্রবেশ করা যায় না, কর্ম্মের গতি বদ্ধ হইয়া যায় তাহাকে অকর্ম্ম বলা যায়। এই প্রকার অগম্য কর্ম্মের সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বলিয়া সনকাদির সমীপে ব্রহ্মা উহার সমাধান করেন নাই। অধিকারী না হইলে কে এই রহস্য প্রকাশ করিবে। কর্ম্মের জ্ঞান অতীব দুর্ব্বোধ্য ॥৪৩॥

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্ ।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥৪৪॥

নাচরেদ্‌যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥৪৫॥

নিশ্চিত ভাবে রোগ দূর করিবার জন্য পিতা বালককে হাতে মিষ্টি দিয়া প্রলুব্ধ করিয়া ঔষধ খাইতে দেন, সেইরূপ বেদের পরোক্ষবাদ, উহাতে নির্ব্বোধ লোক প্রলুব্ধ হইয়া কর্ম্মই কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবে এই প্রকার ভাবিয়া বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। বেদ যে স্বর্গাদি ফলের কথা বলিয়াছে উহা প্রবৃত্তির লোভের নিমিত্ত, উহাকেই বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া সাধারণ লোক মনে করে। পায়ের লোহার শিকল ছেদনের নিমিত্ত অস্ত্র আনিয়া উহা যদি কেহ বিক্রয় করিয়া খাইয়া ফেলে তবে আর শিকলের বন্ধন ছুটিবে কেমন করিয়া? সেইরূপ যে কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবে সেই কর্ম্মদ্বারা বিষয় ভোগ করিলে উহা দ্বারা ভববন্ধন ছুটে না, জন্ম মৃত্যুও নিবৃত্ত হয় না।

আমি স্বর্গফল ভোগে বিরক্ত, আমি বেদোক্ত কর্ম্মও করিব না, এরূপ যাহার বিপরীত জ্ঞান হয়, তাহারও অতি অনর্থ উপস্থিত হয় ॥৪৪॥

আমি জিতেন্দ্রিয় এরূপ অভিমানে যে বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করে না তাহার পরমার্থ লাভ হয় না বরং অনর্থই হয়। বহু শাস্ত্রবেত্তা হইয়াও সে যদি বেদোক্ত কর্ম্মবিমুখ হয় তাহার শাস্ত্রজ্ঞতা অভিমানে সে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত বলিয়া বুঝিবে। যে বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করে না ত্যক্তকর্ম্ম হইয়া নিষ্কর্ম্ম বলিয়া মনে করে তাহার অত্যন্ত ভ্রম, সে অভিমানে আবদ্ধ হয়। বিষয় ভোগ নিগ্রহ করিয়াও বেদোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে নিজের পায়ে নিজের কুঠারাঘাত করা হয়, নিজেই নরকগামী হয়। কারণ বেদ হইল পরমার্থের মূল। বেদোক্ত কর্ম্ম না করিয়া যে কর্ম্মই করা হউক না কেন উহাই অধঃপতনের নিমিত্ত হয়। যে চক্ষু দিয়া দেখিবে উহাই যদি কাড়িয়া লওয়া যায় তাহা হইলে কি দিয়া দেখিবে, নিজেকেই নিজে সে দেখিতে পায় না, অপর পদার্থ আর দেখিবে কি? সেইরূপ বেদোক্ত কর্ত্তব্য না করিয়া যাহা

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥৪৬॥

কিছু পরমার্থ বলিয়া মনে করা যায় উহাতেই গৃহে অনর্থের আমন্ত্রণ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে আচরণ অনর্থের প্রবাহকে বহন করিয়া জন্ম মৃত্যুর পথেই লইয়া যায়। তাহাতে নানা প্রকার যোনিতে গর্ভ যাতনা ভোগ করিয়া কল্পান্তেও ছাড় পায় না। জন্ম-জন্ম জন্মগ্রহণ করিয়াও জন্ম শেষ হয় না, আর বার বার মৃত্যুতেও মৃত্যু শেষ হয় না। বেদবিহিত কর্ম্ম না করিলে এই প্রকার দুঃসহ দুঃখ ভোগ হয়। মূল শ্লোকে "বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ" এই কথার মধ্যে পূর্ণরূপে অধর্ম্ম রহিয়াছে। এই অধর্ম্ম অকর্ম্ম নয় কি? কিন্তু যে অবস্থায় কর্ম্ম বন্ধন লাগে না তাহারই নাম মুখ্য অকর্ম্ম বা নিষ্কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিষ্কর্ম্ম লক্ষণ, উহাতেই সাধু পরম মুক্তি লাভ করে। শুদ্ধ অকর্ম্ম অবস্থা হইলে নিষ্কর্ম্মসিদ্ধি হয়। এই মুখ্য অকর্ম্মের কর্ম্ম ধারণ করিলে মুক্তিশ্রেষ্ঠও পদতলে লুণ্ঠিত হয় ॥৪৫॥

দাসী স্বামীর আজ্ঞা পালন করে, প্রজাগণ রাজমুদ্রা মান্য করে, সেইরূপ বেদের নির্দ্দেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মাচরণে মানুষ নিষ্কাম হয়। আমি একজন কর্ম্মকর্ত্তা এরূপ অহংকার যে মনে উঠিতে দেয় না, এবং স্বভাববশে যে পরমেশ্বর শ্রীঅনন্তে কর্ম্ম সমর্পণ করে, এইভাবে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ হইলে সেই কর্ম্ম নির্দ্ধর্ম্ম এবং তাহারই নাম পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। বেদ কর্ম্মফলের কথা বলিয়াছে কিন্তু যাহার বাসনা নিষ্কাম নির্ম্মল তাহার বেদোক্ত কর্ম্মফল স্বপ্নেও দর্শনের বিষয় হয় না। কর্ম্মফলের কথায় তাহার আসক্তি থাকে না। স্পর্শ-মণির বিনিময়ে কোন্ নির্ব্বোধ ব্যক্তি পান খাওয়ার জন্য শুপারি চাহিতে যাইবে? কর্ম্মের নিত্য ফল হইল নিষ্কামতা, উহাতেই সকল ফলের আশা নিঃশেষ হয়। চন্দন সর্ব্ব অঙ্গেই সুগন্ধে সফল, তাহার আবার ফলের সন্ধান কে করে? জলের মৎস্যকে ধরিবার জন্য অল্প আমিষের প্রয়োজন, উহাদ্বারা রুচি উৎপাদন করিয়া তাহাকে জল হইতে উপরে তোলা হয়, সেইরূপ কর্ম্মের ফলের কথা বেদ বলিয়াছে। ফলের আশায় স্বধর্ম্মাচরণস্বরূপ বেদোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে উহা হইতেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়। ইহাই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্ম্মব্রহ্মরূপত্ব হেতু সর্ব্বদা সফল। তবে ফল ভোগের ইচ্ছা করিলে

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥৪৭॥

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥৪৮॥

সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মকুশল লোক কর্ম্মফলের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে। এই রীতিতে বৈদিক কর্ম্ম আচরণ করিতে থাকিলে উহার ফলে নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয়। তবে আরও এক সুলভ উপায় তোমাকে বলি, শ্রবণ কর ॥৪৬॥

হে রাজন্, যাহার যোগে বাসনার জাল ছিন্ন হয়, অহংকারের গ্রন্থি খুলিয়া যায় জীবের মধ্যে পরমাত্মার প্রকাশ হয়, সেই সুন্দর তান্ত্রিক বিধান বলিতেছি, শুন। হে রাজাধিরাজ, যে তান্ত্রিক মহাপূজার যোগে ভগবানের সন্তোষ হয় সেই তান্ত্রিক বিধান, বৈদিক মন্ত্র ও তান্ত্রিক তন্ত্র, এই দুয়ের মিশ্রণে যে পূজা উহা অত্যন্ত পবিত্র। উহা মানুষকে নিষ্কাম করে, অতি উত্তম পূজার প্রকার বৈদিক অথবা তান্ত্রিক উহা গুরুমার্গে সিদ্ধিদায়ক। ইহার জন্য সদ্গুরু দেখিয়া তাহার শরণাগত হইবে ॥৪৭॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন কার্য আচার্য্য বিচার করিয়া উপদেশ করেন। নিজের মতে ভজন পথে চলিলে অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। একটি পথ পাইলে গন্তব্য স্থানে চলা সিদ্ধ হয়, আর পথ ছাড়া ভ্রমণ করিলে উহা বৃথাই হয়। সেই প্রকার গুরু ভিন্ন অহংকারের বশে মানুষ যাহা করে তাহাতে ভ্রান্ত হয়। গুরু ও ব্রহ্ম এক, এইরূপ ভাবনা আবশ্যক। ভাবের সহিত তাহার সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিলে তাহার অনুগ্রহ অনুধ্যান করিতে পারিবে। নিজের অধিকার অনুসারে তিনি যে মূর্ত্তি ও মন্ত্র উপদেশ করেন, উহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইবে। গুরুদেবের মুখে বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র শিক্ষা করিয়া পুরুষোত্তমের মহাপূজা অভ্যাস করিবে। ইষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার উপদেশ অনুসারে নিয়মিত ভজন পূজা করিবার কথা আরও বিশদ ভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৪৮॥

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সন্ন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥৪৯॥

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্ ॥৫০॥

যথাবিধি সন্ধ্যা ও স্নান করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয়। আচমন করিয়া সাধক নিজেই হরিরূপ হইয়া যায়। এই তত্ত্ব না বুঝিয়া কেহ কেহ তন্ত্রমার্গকে অজ্ঞানপূর্ণ বলিয়া থাকে। কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ন্যাস করিয়া সাধক নিজেই হরিরূপ হন, ইহা না জানিয়া কেহ বলে আগম মার্গ অজ্ঞানের পথ। আগমোক্ত সন্ধ্যা স্নানের পর সাধক মূর্ত্তির সম্মুখে কুশাসন মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রাসন পাতিয়া বসিবে। রেচক পূর্ব্বক কুম্ভক দ্বারা প্রাণ বায়ু সংযম করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। ইহা দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইবে। শরীরের পঞ্চ মহাভূত একটির পর একটি বিলয় করিয়া ভূত শুদ্ধি পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা পিণ্ড শোধন মূল মন্ত্রে ন্যাস দ্বারা প্রবোধন করিবে। এই সকল গুরুর দীক্ষা-বিধিমত করিতে হয়। হৃদয়, কবচ, শিখা, শির, নেত্র, ও অস্ত্রায় ফট্ প্রভৃতি বিধান যাহা আগমে উক্ত হইয়াছে সেই অনুসারে ন্যাস করিবে। ইহার পর মূলমন্ত্র দীক্ষা, দিগ্‌বন্ধনাদি ও রক্ষা প্রভৃতি মূর্ত্তি পূজার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, হে রাজন্, সেইগুলি অবধারণ করুন ॥৪৯॥

পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে সকল দ্রব্যের শুদ্ধি বিধান করিতে হয়। দ্রব্যশুদ্ধি ভূমি লেপন ও মার্জ্জন করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পদার্থ শুদ্ধিতেই মুখ্য শোধন হয়। সংমার্জ্জনাদি ভূমি শুদ্ধির সাধন। আত্মশুদ্ধি চিত্তের অচঞ্চল ভাব। মূর্ত্তির নির্ম্মাল্য অপসারণ, চন্দনাদি অনুলেপন, মার্জ্জন, মূর্ত্তি শুদ্ধি। পূজার দ্রব্য একত্র করিয়া উহা শঙ্খ জলে প্রোক্ষণ করিয়া নিজের আসনে একাগ্র স্থির চিত্তে বসিবে। যাহার ধ্যানে সম্পূর্ণ রূপ দর্শন হয় না সেই দেবতার প্রতিমা মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান ভাবনা করিয়া আগমোক্ত বিধানে লব্ধোপচারে পূজা করিবে। চেষ্টা দ্বারা কি না হয়? একবার মূর্ত্তি ধ্যানের মধ্যে পাওয়া গেলে বাহ্য উপচার সম্প্রদান কথা ছাড়িয়া ধ্যান দৃষ্টিতে মানস উপচারেই পূজা করিবে।

পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ ॥৫১॥

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাংতাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥৫২॥

গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎস্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্ ॥৫৩॥

যাহার হৃদয়ে ধ্যানে রূপটি প্রকাশ হয়, আর বাহ্য পূজা সাবধানতার সহিত করা হয়, তাহার দুই পূজাই যথা নিয়মে করা প্রয়োজন ॥৫০॥

পূজার সকল সামগ্রী নিকটে রাখিয়া যথাশাস্ত্র মূর্ত্তির ন্যাস করিবে। যেমন নিজের অঙ্গে তেমনি মূর্ত্তির অঙ্গেও ন্যাস করিবে। মূল মন্ত্রেই মূর্ত্তির ন্যাস করিবে। আগমোক্ত গুরু দীক্ষা অনুসারে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ন্যাস করিলে সেই ন্যাসের প্রভাবে সাধক হৃষীকেশত্ব লাভ করে। মুখ্য উদ্দেশ্য মনে দৃঢ় করিয়া রাখিবে। হৃদয়ে অনুসন্ধান দৃঢ়ভাবে রাখিয়া অন্তরে ধ্যানের মূর্ত্তিকে আবার বাহিরে প্রতিমাকে মূলমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিবে ॥৫১॥

অতিশয় সুন্দর কর চরণ সহিত মনোহর শ্যামসুন্দর শ্রীরঙ্গ সহাস্যবদন নিজ ধ্যানে চিন্তা কর। চতুর্ভুজে শংখ চক্র গদা পদ্ম সুনন্দাদি পার্ষদ সঙ্গে সকল আয়ুধ সহিত চিন্তা করিবে। যথারীতি মধুপর্ক, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, পুরুষসূক্ত মন্ত্রে নির্মল জলে স্নান, মুকুট, কুণ্ডল, কটিতে মেখলা, স্বর্ণোজ্জ্বল পীত বসন, পাদ পর্য্যন্ত বিলম্বিত সুন্দর বনমালা, কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় কৌস্তভ মণি, চরণ পদ্মে সুকোমল উর্দ্ধরেখা, ধ্বজ, বজ্র প্রভৃতি চিহ্ন, বাঁকমল, নূপুর প্রভৃতি চরণের অলঙ্কারে মধুর সিঞ্জন ধ্বনি চিন্তা করিবে ॥৫২॥

শুদ্ধ শ্যামবর্ণ ললাটে পীতবর্ণ কেশরের তিলক রেখা তাহাতে আবার উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কুঙ্কুম রাগে রঞ্জিত অক্ষত কেশবন্ধ পুষ্প গুচ্ছ, তাহার উপর মধুকরের শ্রেণী, গলায় কমল ও তুলসীর মালা আর শ্যামল অঙ্গে চন্দনের চিহ্ন, এরূপ ধ্যান করিবে। ধুপ, দীপ, উপহার. তাম্বুল, সকর্পূর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদান করিয়া জয় জয়কার করিয়া নিরঞ্জন করিবে। বেদোক্ত মন্ত্রে

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষমাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্ ॥৫৪॥

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

স্তব স্তুতি ও পুরাণোক্ত স্তোত্র অথবা নিজের প্রাকৃত ভাষায় প্রার্থনা নাম কীর্ত্তন গদ্য পদ্য মিশ্রিত করিয়া স্তব করিবে কেননা অধোক্ষজ ভগবান্ স্তব পাঠে সন্তুষ্ট হন, ইহাই ভাবনা করিবে এবং অত্যন্ত প্রেমের সহিত গরুড় ধ্বজকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার প্রণাম করিবে ॥৫৩॥

দ্বৈতভাবে ভজন করিলেই স্থূল বুদ্ধি মনে করা হয়। ভজন মধ্যে তন্ময় হইয়া যাওয়া চাই, উহাতেই ভজনের সিদ্ধি, ইহাই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। মূর্ত্তি ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকা এবং ঐক্য ভাবে সকল বৃত্তি নিশ্চল হইয়া যাওয়া তাহারই নাম মুখ্য ভক্তি। এই ভাবে পূজা করিয়া উঠিলে পর পুনরায় শ্রীহরিকে নমস্কার করিবে। এই প্রকার পূজা সমাপ্ত করিয়া শেষ প্রসাদ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যেয় মূর্ত্তিকে নিজের হৃদয় মন্দিরে লইয়া যাইবে। এই প্রকারে ধ্যান মূর্ত্তিকে হৃদয়ে শয়ান করানোই দেবতার উদ্বাসন। হৃদয়ে পর্য্যঙ্কে দেবতাকে শয়ন করাইলেই মানস পূজার বিধি বিধানের সমাপ্তি হইল। প্রতিমার বিসর্জ্জন হইলেও তাহার অনুসন্ধান কখনও ছাড়িবে না। সদা সর্ব্বদা শ্রীহরির অখণ্ড স্মরণ করিতে থাকিবে। হে রাজন্, ইহারই নাম আগম বিধি। বুদ্ধিমান লোক ত্রিশুদ্ধি সম্পাদক এই আগম বিধিকে পরমাত্মসিদ্ধি দায়ক জানিবেন। আগমোক্ত বিধানে প্রতিমার কথাই প্রধান নয়, তবে যাহার শ্রদ্ধা যে বিষয়ে অধিক তিনি সেই বিধান অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারেন ॥৫৪॥

হে রাজন্, পূজা একদেশী নয়। বহু স্থানে তাঁহার পূজা হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে ভগবৎপ্রাপ্তি যাহাতে শীঘ্র হয় তাহা বলিতেছি। যথা

সময়ে যথা রীতি জলে অথবা সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীহরিকে ধ্যানপূর্ব্বক পূর্ণাঙ্গ পূজা করা যায়। কমলাপতিকে অগ্নির তেজে তাঁহার স্বরূপের প্রকাশ ভাবনা করিয়া পূজা করা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য অতিথি কিন্তু শ্রীভগবানের স্বরূপ, ইহা ভাবিয়া পূজা করিলে অতি শীঘ্র অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে। বিশ্বদেব বলির পর গৃহস্থ যখন ভোজনের জন্য অগ্রসর হইবেন সেই সময় যে কেহ যে কোনো শ্রেণীর আগমন করুক তাহাকে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে পূজা করিলে সেই গৃহস্থের পূর্ণ প্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বে কোনো সংবাদ নাই বিশ্বদেব পূজার পর যদি কেহ অতিথি আগমন করেন তাহাকে ব্রহ্মভাবে পূজা করিলে ভুক্তি ও মুক্তি সেই গৃহস্থের দাসী হইয়া থাকেন। ভাগ্যবশে সেই সময় যদি কোনো শুদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিথি হন তাহাকে শ্রদ্ধায় পূজা করিলে সেই গৃহে নারায়ণ আনন্দে বাস করেন। হে রাজন্, বৈশ্বদেবের পর অতিথি সেবায় ভুক্তি মুক্তি, আর বিমুখ করিলে সকলই বিনষ্ট হয়। তাহার পূজায় সুখ ও পরমানন্দ অতিথির মধ্যে আর ভগবন্ মূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয় না। স্বরূপেই অতিথি নারায়ণ, তাহার পূজায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি। অতিথিকে যাহা অর্পিত হয় উহা ভগবানের মুখেই অর্পিত হয়। এজন্য অত্যন্ত আদর করিয়া অতিথিকে ব্রহ্মরূপে পূজা করিবে। যে যে পূজা স্থান বলা হইল উহাতে নিজের শ্রদ্ধাকেই প্রমাণ বলিয়া জানিবে। হে রাজন্, শ্রদ্ধা ভিন্ন কখনও পূর্ণ প্রাপ্তি হইতে পারে না। নিজের শ্রদ্ধার স্থান হৃদয়, সেই হৃদয়ে বিধিমত পূজা করিলেই শ্রদ্ধা নিজের সম্পূর্ণ প্রাপ্তি ঘোষণা করিবে। দেহ চালক ঈশ্বর হৃদয়ে আছেন। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া ভজন করিলে অনায়াসে আত্ম প্রাপ্তি হইতে পারে। নিজে যাহা সেবন কর উহা ভগবানেরই সেবন এরূপ ভাবনায় পরমাত্মাকে সহজে পাওয়া যাইতে পারে। দেহের অহংতা ত্যাগ করিয়া সকল ভোগের একমাত্র ভোক্তা ভগবান্ এরূপ দৃঢ় ভাবনা করিতে পারিলে পরমার্থের অপরোক্ষ সিদ্ধি লাভ হয়।

দেহ তো জড় মূঢ় অচেতন, সকল ভোগের ভোক্তা পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর। দেহাভিমান বৃদ্ধি পাইয়া অজ্ঞানী লোক অনেক দুঃখ ভোগ করে।

হে রাজন্, অতএব দেহে অহংতা ত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ ভগবান্‌কে শরণ গ্রহণ করিয়া পূর্ণ পরমার্থ লাভ করিবে। অহংতা মমতা নিঃশেষে ত্যাগ করা, ইহারই নাম হৃদয়স্থ ভগবানের শরণ গ্রহণ, তাহাতেই সহজ পূর্ণ পরব্রহ্ম

অনুভব, সেখানে মিথ্যা দেহাভিমান থাকে না। হে রাজন্, এই-ই কর্ম্ম এই কর্ম্মেই কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হয় এবং পূর্ণ সমাধান লাভ হয়। এই প্রধান লক্ষণ শুনিয়া রাজার নিশ্চয় সমাধান লাভ হওয়াতে পূর্ণ পরমানন্দ হইল।

রাজার শ্রবণেচ্ছা যেমন পূর্ণ হইতে লাগিল কথার মাধুর্য্যও তাহার নিকটে সেই ভাবে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। অতিশয় উৎকণ্ঠায় কথার বিশেষ মধুরতা বৃদ্ধি হইল। রাজা পরমানন্দে তৃপ্ত হইয়া আত্মবোধে সুখে মগ্ন হইয়া স্বানন্দে লালসান্বিত হইয়া পুনরায় আদর পূর্ব্বক প্রশ্ন করেন। পাছে বিশ্রাম করিতে গেলে মুনিগণ উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, এই নিমিত্ত চমৎকার ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। স্বানন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয় সমূহ আত্মানন্দ সুখে ডুবিয়া আছে, রাজা মনে মনে তৃপ্ত হইয়া আছেন তথাপি প্রশ্ন করেন।

এই প্রশ্ন শ্রীহরির অবতার সম্বন্ধে। সে কথা অতি সুন্দর মনোহর। প্রেমপূর্ণ সিদ্ধান্ত রসনার তৃপ্তি জনক।

সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অতিশয় রসময় কথা। সাধুগণের উপানহধারী জনার্দ্দনের কিঙ্কর একা আমি, সাধুগণ কৃপার সাগর। শ্রীজনার্দ্দন বরদমূর্ত্তি। তাহার কৃপায় সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্য প্রচুর। উহার পরিমাপ করিলেন একনাথের গুরু জনার্দ্দন। নিজের জ্ঞানের পাত্র ভরিয়া লইয়া উহাতে শ্রবণ-সুখের পাত্র পূর্ণ করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ।

যানি যানীহ কর্ম্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ ॥১॥

ওঁকার স্বরূপ শ্রীগুরু পরমকল্যাণ শিবশিবাকে নমস্কার করি। প্রণামে জীবের জীবত্ব দূর হইয়া গেলে দেহের আর দেহভাব কিরূপে থাকিবে? হে দেবতা, তোমার কৃতিত্ব অদ্ভুত, তুমি দেহভাব দূর করাইয়া তাহাকে তোমার সেবায় লগ্ন করিয়া রাখ। শঙ্খাসুরকে (পঞ্চজন নামক অসুর) তাহার জীবভাব ছাড়াইয়া তাহার দেহ শঙ্খটিকে পাঞ্চজন্যরূপে তুমি করে ধারণ করিয়াছ। সেইরূপ আমার দেহভাব দূর করিয়া আমার দেহকে সেবায় নিযুক্ত কর। পাঞ্চজন্য শঙ্খে যে মধুর ধ্বনি নির্গত হয় উহা বাদকের চাতুর্য্যে, তেমনি যে যে কথা আমি বলি উহা তুমি বল বলিয়াই শোভা পায়। অতএব আমার শরীরে চলা বলা সকলই তোমার সঙ্গবশে, সকল কর্ম্মেই তোমার সত্তা। আমার দেহে অহংতা উহা তোমার নিজের, তোমার প্রাণ প্রেরণা আমার প্রাণক্রিয়া। চক্ষু যাহা কিছু দেখে উহা তোমার জ্ঞানের উদয়ে। কর্ণ যাহা শুনে সেই সকলই তোমার শ্রুতি। রসনা যাহা চাখে উহা তোমার মুখের স্বাদ গ্রহণ। বুদ্ধির জ্ঞানও তোমার বেদকত্ব। মন যে মননে অতি চপল উহা তোমারই আঙ্গিক বল। বিচারে বিবেক বল অতি উজ্জ্বল, উহাও তোমার। বাণী যাহা বলে তাহার বাচকতা তোমার। বোধ যে অনুভব প্রবোধ আনিয়া দেয় উহাতে তুমিই বর্ত্তমান। জাগৃতি তোমার হর্ষে, স্বপ্ন তুমিই দেখ, সুষুপ্তির সুখানুভব তোমার পূর্ণ সন্তোষ। আমি যে বিষয় ভোগ করি উহার ভোক্তৃত্ব তোমার। এই জগতে আমার স্থিতি তোমারই সংযোগে। আমার মধ্যে সূত্রের মূল স্তম্ভ রাখিয়া তুমি সূত্রধাররূপে সূত্র তৈরী করিয়া বিচিত্র সৃষ্টির জাল বুনিতেছ। এই প্রকার চিদ্‌ঘন শ্রীজনার্দ্দন সকল জগৎকে চিন্ময় করিয়াছ। জগতের জীবন কৃপালু তুমি, তোমার শ্রীচরণে আমার প্রণাম। অনন্তর আমার মধ্যে তুমি ক্রিয়াশীল হইয়া

চালকস্বরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেছ, তাহাতে "আমি কবিত্বকর্ত্তা হইয়াছি" এই প্রকার বোধ জড়বুদ্ধির কার্য্য। একনাথ শ্রীজনার্দ্দনের সঙ্গে একতা লাভ করিল, অথবা শ্রীজনার্দ্দন একনাথের সঙ্গে এক হইয়া গেলেন ? এক জনার্দ্দনই দুই পৃথক্ নাম লইল, যেমন কনক ভূষণের মধ্যে পূর্ণরূপে থাকিয়াই ভূষণরূপে পৃথক্ নামের হয়। সেইভাবেই একনাথ ও জনার্দ্দনের ঐক্য ভাবই পরিজ্ঞাত হয়। এই প্রকার বিনীত বাণী শ্রবণে সদ্‌গুরু জনার্দ্দন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সিদ্ধান্ত বর্ণনায় এরূপ তুলনা করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কর্পূর অগ্নি সংযোগে তাহার কর্পূরত্ব হারাইয়া ফেলে। সেই প্রকার সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করিয়া সৎশিষ্য তাহার নিজের সত্ত্বা হারাইয়া ভেদভাবের সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলে।

দেবর্ষি নারদ আত্মজ্ঞানের আকর শ্রীভাগবত হইতে উহা বসুদেবের প্রতি ইতিহাসের মাধ্যমে উপদেশ করেন। এই ইতিহাস কথার মধ্যে যে তাৎপর্য্য উহা পরমার্থ। উহা শ্রবণে শ্রোতার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই কথা শুনিয়া সাধু শ্রোতার সমীপে নতুন নতুন বলিয়া অনুভব হয়। সদ্‌গুরুর স্তবের মধ্যে অভেদভাবের বর্ণনা অতিশয় সুষ্ঠুরূপে করা হইয়াছে। সৎ গুরুর মহিমা কীর্ত্তন ব্রহ্মানন্দের খনি। প্রেমের সহিত উহার বর্ণনায় সজ্জনের হৃদয় বিগলিত হয়। দেশ ভাষায় এই পরমার্থের আকর উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। উহা শুধু বাণী নয়, স্পর্শমণি ; ইহার শ্রোত্র স্পর্শ মাত্র জীব দশা পালটিয়া যায় অর্থাৎ তাহার আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ইহাতে অনুপম অগাধ ভাগবত কথার সংগতির সহিত সুসিদ্ধান্তিত অর্থাববোধ লাভ হয়। সাধুগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের চরণ শিরে বন্দনা করি এবং কথা নিরূপণ করি, আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এই তৃতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে তান্ত্রিক ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং মূর্ত্তির অর্চ্চনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। ইহাতে রাজার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে— ভগবান্ তো এক হইয়াও ত্রিলোকে তাঁহার কত অবতার, মূর্ত্তি ও জন্ম কর্ম্ম নানা প্রকার ইহা কিরূপ তাহাতে তিনি প্রশ্ন করেন।

মুনীশ্বরগণের অগাধ জ্ঞান তাহাতে আবার রসাল নিরূপণ, রাজার মন স্বভাবত আকৃষ্ট, তাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তিনি বলেন দেবাধিদেব শ্রীহরি,

শ্রীদ্রুমিল উবাচ।

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিল শক্তিধাম্নঃ ॥২॥

তিনি স্বেচ্ছায় কিরূপ জন্মগ্রহণ করেন? যদি বলেন, তাহার জন্মই নাই তবে আর কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কেন? দেবতা অরূপ অনাম, তাহার জন্ম কর্ম্ম থাকিতে পারে না। তদুত্তরে বলি—সেই অজন্মা জন্মধারণ পূর্ব্বক এবং অকর্ম্মা কর্ম্ম সাধন করিয়া, বিদেহ হইয়াও দেহ ধারণে সংসারে স্বধর্ম্ম পালন করেন, সেই অবতারের স্থিতি জন্ম অভিব্যক্তি অবতার মূর্ত্তি কত প্রকার, কৃপাপূর্ব্বক উহা আমাকে উপদেশ করুন। অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান বা প্রস্তুত সর্ব্ব অবতারের কথা যথাযথ ভাবে বলিবেন। শ্রীহরির চরিত্র সম্বলিত অবতার গুণাবলী প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রশ্ন শুনিয়া তাহার উত্তর দান করিয়া দ্রুমিল যোগীন্দ্র বলেন—

যাঁহার লীলাশক্তি অপরিমিত, যাঁহার নখাগ্রে অনন্ত শক্তি, এজন্য যাঁহাকে অনন্ত বলা হয়, তাঁহার সমস্ত গুণ বর্ণনার শক্তি কার? অনন্তের গুণসমৃদ্ধি যে বলিবে মনে করে সে বালবুদ্ধি। পিপীলিকা আকাশের বিস্তার পরিমাপ করিতে অসমর্থ। সাগরে কত লবণ আছে কে পরিমাণ করিবে? সেই প্রকার অনন্তের অনন্তগুণ নিজের সামর্থ্য অনুসারে বর্ণনা হয়। বৃষ্টির ধারার সংখ্যা গণনা, পৃথিবীর দুর্ব্বাঙ্কুর গণনার মত উহা দুষ্কর। কতবার নিমেষ ও উন্মেষ হয় তাহা গণনা অসাধ্য বা অসম্ভব নয়। পৃথিবীর পরিমাণ কালে কালে গণনা করা যাইতে পারে কিন্তু ভগবানের গুণ গণনা করা সম্ভব নয়। বেদ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। তাঁহার একটি নামের মহিমা বর্ণন করিতে বেদের বাণী ফুরাইয়া যায়। সমগ্ররূপে তাহার গুণ গণনা করিতে অনন্ত শেষ নাগেরও মুখে ব্যথা হইয়া যায়। অতএব অনন্তের অনন্ত গুণ কেহ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নয়। তথাপি তাহার অবতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি ॥২॥

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ
　　　　পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান
　　　　মবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥৩॥

যৎকায় এষ ভুবনত্রয় সন্নিবেশো
　　　　যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা
　　　　সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্তা ॥৪॥

অবতারগণ মধ্যে প্রথমত পুরুষাবতার সম্বন্ধে কথা যোগী দ্রুমিল বর্ণনা করেন। হে রাজন্, উহা শ্রবণ করুন। শ্রীনারায়ণ নিজ শক্তিতে পঞ্চ মহাভূত যথা নিয়মে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মাণ্ডের নাম বিরাজপুর বা বিরাট্। উহাতে পরমেশ্বর প্রবেশ পূর্ব্বক লীলা করেন বলিয়াই তিনি পুরুষ নামে আখ্যাত। পুরুষোত্তমের অংশ এই বিরাট পুরুষ প্রথম অবতার। তাহারই অংশযোগে প্রকৃতি নানাপ্রকার জীব সৃষ্টি বা প্রসব করেন, এজন্য তিনি পুরুস এই নামে পরিচিত। তিনি অকর্তা হইয়াও আত্মযোগে চিচ্ছক্তি প্রভাবে জগতের স্ফূর্তি করান। তাহারই গুণ ও কীর্ত্তি পরের দুই শ্লোক ॥৩॥

ত্রিলোকে যাহারা আছে সকলেই তাহার (বিরাট পুরুষের) শরীরের অন্তর্ভূক্ত। তাহারই যোগে স্থানে স্থানে দেহীগণ দেহ ধারণ করিয়া নানা ভাবে আছে। ব্রহ্মাদি শরীরধারী সকলেই তাহার জ্ঞান কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সাধন করে। তিনিই জগতের নয়নের নয়ন, ঘ্রাণের ঘ্রাণ, শ্রবণের শ্রবণ, রসনার রসনা, করের কর, পদের পদ, বাণীর বাণী, এইভাবে বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় সকলেরই কারণ স্বরূপে অবস্থান করেন। জীবের জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞানের অংশ। সেই জ্ঞানঘন স্বভাব বিরাট পুরুষের আর অপর জ্ঞানদাতা নাই। তাঁহারই প্রাণের স্পন্দনে বিশ্বপ্রাণ প্রবাহ প্রবাহিত হয়। বল তেজ বা বিশ্বের সকল ক্রিয়া তাহারই। সত্ত্ব রজ তমোময় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল আদিকর্ত্তা ভগবানকে পুরুষাবতার

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে
বিষ্ণু স্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য
. ইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥৫॥

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নরঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার ধর্ম্ম
যোঽদ্যাপি চাস্ত ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥৬॥

বলিয়া জানিবে। ইহার পর সত্ত্বাদি গুণময় সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা গুণাবতার কথা বলিতেছি ॥৪॥

আদিকল্পে রজগুণের রাজসিকীশক্তি সৃষ্টির নিমিত্ত ধারণ করিয়া স্রষ্টা শতধৃতী ব্রহ্মা নামে পরিচিত হন। ব্রহ্মারূপে রজোগুণে সৃষ্টি করেন, আবার স্বধর্ম্মস্থিতিশীল সত্ত্বগুণে সৃষ্ট জগৎ পালনের নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণু, দ্বিজধর্ম্ম প্রতি-পালনের নিমিত্ত যজ্ঞভুক্, শ্রীবিষ্ণু কালে কালে ধর্ম্মাচরণের দোষ দর্শন করিয়া নানারূপ অবতার প্রকাশ করেন। সৃষ্টির প্রান্তে তামসী শক্তি তমোগুণে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কল্পান্তে রুদ্র নাম ধারণ করেন তিনি নিজেই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি কৃষক তিনিই ক্ষেত্রকর্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, শস্যোৎপাটন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। এইভাবে উৎপত্তিকালে ব্রহ্মা, স্থিতিকালে বিষ্ণু ও প্রলয়-কালে রুদ্র সেই পুরুষোত্তমেরই নাম। এজন্যই তিনি আদিকর্ত্তা। তাহারই কথা শ্রুতিতে বিঘোষিত। দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতির কর্ত্তব্যকর্ম্মে যে সামর্থ্য প্রভৃতি উহাও তাহারই মহিমা। বিচার করিলে দেখা যায় যে, তিনি ভিন্ন আর কাহারও অনুমাত্রও কর্ত্তৃত্ব নাই। যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আভাস তিনিই অনায়াসে আদিকর্ত্তা ও নিজের অংশেই পুরুষাবতার। অতি বিচিত্র পরম পবিত্র শ্রীনারায়ণের অবতার কথা অলৌকিক ॥৫॥

যিনি ত্রিলোকে জন্মরহিত তিনি পুনরায় ধর্ম্মনামক ঋষির ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি নামে দক্ষকন্যাকে নিজের জননী করিয়াছেন। মূর্ত্তিমাতার উদরে নর নারায়ণ

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি
কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত সগণং স বদর্য্যুপাখ্যম্ ।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দ বাতৈঃ
স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥৭॥

অবতার প্রকাশিত হন। স্বরূপতঃ এক হইলেও দুইরূপে ধর্ম্মের ঘরে ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন। তিনি নারদ প্রভৃতিকে নৈষ্কর্ম্য লক্ষণ ধর্ম নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিলেন। কোন্ দেশে তিনি নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বলি। তিনি বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করেন। সেখানে নারদ সনকাদি মুনিগণ অদ্যাপি সেবায় আছেন। সাক্ষাৎভাবে সেখানে সাধকের দর্শন গোচর হইয়াও স্বরূপনিষ্ঠা অলক্ষ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি উপদেশ করেন। ইহা দ্বারা স্বরূপের জ্ঞান ঋষিগণ লাভ করেন এবং সেই বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করেন। যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় না উহাও বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে তাহার অনুগ্রহে আলোচনা কালে অনুভবের বিষয় হয়। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ঋষি বহু হইয়াছেন। তাহারা নারায়ণের অবতার। সেই অবতারের চরিত্র অত্যন্ত বিচিত্র। হে রাজন্, আপনি তাহা শ্রবণ করুন ॥৬॥

এই প্রকার নারায়ণ ঋষির প্রতাপ দর্শন করিয়া তাঁহার তপনিষ্ঠতার দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রের হৃদয়কম্প উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন আমার নিষ্পাপ স্বর্গ অনায়াসেই তাহার সুলভ হইল। স্বর্গ হারাইলাম। এই ভাবিয়া তিনি কামদেব ও অপ্সরাগণকে ঋষির তপস্যাক্ষেত্রে পাঠাইলেন। কামদেবের সঙ্গে অপ্সরাগণ তাহাদের দ্বিতীয় বান্ধব বসন্ত ঋতু, তপস্যাভঙ্গকারী ক্রোধও সেখানে চলিল। বহুকাল তীর্থে থাকিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ক্ষমাগুণ হৃদয়ে উৎপন্ন হয় না। ক্রোধ তপস্যাকে নাশ করিয়া ফেলে। ক্রোধের মত তপস্বীর আর শত্রু নাই। ইহাদিগকে একটির পর একটি বদরিকা আশ্রমে যেখানে নারায়ণ তপস্যা করিতেছিলেন সেখানে পাঠান হইল। তাহারা একে একে নিজেদের পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিল। বনটিকে বসন্ত ঋতু সাজাইয়া ফেলিল। কোকিলের কুহু তানে দিক্‌বিদিক্ মুখরিত হইল। সুগন্ধ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। নানা ফুলের পরাগ ছড়াইতে লাগিল।

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ
প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময় এজমানান্‌।
মাভৈর্বিভো মদন মারুত দেববধ্বো
গৃহ্লীত নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্‌ ॥৮॥

ভ্রমর ঝঙ্কারে গুঞ্জন উঠিল। অপ্সরাগণ শৃঙ্গার রসাত্মক গান গাহিতে আরম্ভ করিল। হাব ভাব নৃত্যভঙ্গিতে তাহাদের কাম বিকার প্রকটিত হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকগণের ঐরূপ চেষ্টাতেও নারায়ণের মনের মূলে কামিনীচেষ্টা জনিত কাম বাধা উপস্থিত হইল না। ক্রোধ তাহার পরাক্রম দেখাইতে সমর্থ হইল না। তাহাকে ছাড়িয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল বলিয়া ম্লানমুখে বিমুখ হইল। কামিনীগণের কটাক্ষ বাণ নারায়ণ ঋষিকে বার বার বিদ্ধ করিলেও তাহাকে অনুমাত্রও চঞ্চল করিতে পারিল না। নিজ সন্তোষে নির্দ্বন্দ্ব নারায়ণ ঋষি আকাশের মত নির্লিপ্ত রহিলেন। শূন্য আকাশে অস্ত্র ছাড়িলে উহা ব্যর্থই হয়। অগ্নিমুখ সর্প নিজের বলদৃপ্ত হইয়া অগ্নির শিখা গিলিতে গেলে যে অবস্থা হয় (অর্থাৎ সে জ্বলিয়া মরে) সেরূপ ঋষি নারায়ণের দৃষ্টিতে কামিনীগণের কাম তৃষ্ণা ধ্বংস হইল। নারায়ণের মহিমা বুঝিয়া কামদেব নিজের সামর্থ্য উপলব্ধি পূর্ব্বক ঋষির প্রতি নিজের নিন্দ্য কর্ম্মে লজ্জিত হইলেন। কাম পরাজিত হইয়া অধোমুখ হইলেন। তাহার শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে—ইহা নারায়ণ ঋষি বুঝিলেন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা—তাহাকে কামদেব ছলনা করিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে জানিলে ইহা তিনি করিতেন না। তিনি ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন, কি জানি নারায়ণ ঋষি তাহাকে কি অভিশাপ দিবেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া তিনি ম্লানমুখে রহিলেন। কৃপামূর্ত্তি নারায়ণ অভিনব শান্তিপূর্ণ হৃদয় অনুমাত্রও তাঁহার চিত্তে ক্রোধের ছাপ নাই। তিনি কামদেবের এইরূপে অবস্থিতি দর্শন করিয়া কৃপায় উদ্বুদ্ধ হইলেন ॥৭॥

ইন্দ্র অপরাধ করিয়াছে। নারায়ণ ঋষির কিন্তু ক্রোধ নাই। কি অগাধ শান্ত মূর্ত্তি নারায়ণ। বিরুদ্ধ কামের প্রতিও তাঁহার ক্রোধ নাই। ইন্দ্রের সহিত তাহাদিগকে তিনি শাপ দিলেন না। এই ব্যবহার নারায়ণের সমীপে

অতি তুচ্ছ। তিনি অপকারীর প্রতিও ক্রুদ্ধ হইলেন না। তাহাকে ক্রোধ স্পর্শও করিল না। তিনি অপকারীকে উপকার করিয়া পরমার্থ প্রদান করিলেন। অপকারীর উপকার করা পরম শান্তির পরিচায়ক। লোকের প্রতি এই আচরণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নারায়ণ ঋষি নিজ শান্তস্থিতির পরিচয় প্রদান করিলেন। পরমার্থের প্রধানতম পরিচয় পরম শান্তি। এই পরম শান্তির পরিচয় লোকের প্রতি আচরণে প্রকাশিত হইল। ভয়ভীত কাম ক্রোধ আশঙ্কিত অপ্সরাগণ। তাহাদিগকে অভয় দানে নারায়ণ বলিলেন—অয়ে! কাম বসন্ত প্রভৃতি প্রভুগণ! তোমরা কৃপা করিয়া এই আশ্রম ভূমিকে পদস্পর্শ দানে পবিত্র করিলে। তোমাদের এই আগমনকে আমি অবশ্যই পূজা করিব। আমার একটি অনুষ্ঠান আছে। আমার দেওয়া উপহার অঙ্গীকার করুন। অহো! অপ্সরাগণ দেবস্ত্রীগণ। আপনারা নির্ভয় হউন। সকলেই আপনারা আমার পূজ্য! আশ্রমে অতিথি আসিলে যে না পূজা করিবে তাহার সকল পুণ্য সম্পদ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবে আশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হয়। অতএব তোমরা যদি পূজা গ্রহণ না কর—কোন উপহার গ্রহণ না করিয়াই ফিরিয়া যাও—তাহা হইলে আশ্রম ধর্ম্মশূন্য হইবে। অতএব কৃপা করিয়া পূজা গ্রহণ কর। আশ্রমে সমাগত অতিথি সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য। অতিথিকে যে পূজা করে তাহার আশ্রমের মহিমা শঙ্করও বর্ণনা করেন। অতিথি ক্রুদ্ধ হইলে যে তাহার পায়ে পড়ে, বিমুখ হইলে যে তাহার বন্দনা করে এবং আনন্দ দেয় সে আত্মানন্দে সুখী হয়। বৈবাহিক ক্রুদ্ধ হইলে কন্যাকে ধরিয়া রাখিতে নাই। অতিথি ক্রুদ্ধ হইলে ধর্ম্ম তাহার সঙ্গে যায়। পূর্ব্বাপর যত অনুষ্ঠিত পুণ্য সকলই নষ্ট হইয়া যায়। আশ্রমে অতিথিকে ঈশ্বর ভাবনায় যে পূজা করিবে তাহার আশ্রম বৈকুণ্ঠ, সেখানে বৈকুণ্ঠপতি নিত্য অবস্থান করেন। নারায়ণ ঋষি তাহাদিগকে এই প্রকার বলিলেন। তাহার হৃদয়ে অগাধ শান্তি—সেখানে গর্ব্বের স্থান-মাত্র নাই। অতি অপূর্ব্ব তাহার এই শান্তির অনুভব। হে রাজন্, শুনুন। তিনি দেবাদিদেবের স্বরূপ লাভ করিয়াছেন। যাহার নিমিত্ত দেবতা মনুষ্যগণ নিত্য নৃত্য করে, তপস্বী তপস্যা ছাড়ে, সেই কাম-ক্রোধকে অভয় প্রদান করিয়া নারায়ণ ঋষি আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥৮॥

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ
সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥৯॥

নারায়ণ ঋষি এই ভাবে বলিলে-কামাদি ও অপ্সরাগণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। নির্ব্বিকার পূর্ণক্ষমামূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া কাম ক্রোধ বসন্ত আদি সকলে মিলিত হইয়া তাহার মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ চক্রবর্ত্তী বিদেহরাজ! আপনি সার্ব্বভৌম ভূপতি। কামাদি অপ্সরাগণ সকলেই ভক্তিভরে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীনারায়ণ সন্তুষ্ট হইলে তাহার পূর্ণ কৃপা হয়। এইভাবে পরমার্থ বুদ্ধিতে তাহার স্তব আরম্ভ করিলেন। হে দেবাদিদেব! আপনার জয় জয়কার হউক। আপনার মত অবিকৃতভাব দেবতা মানব কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। কামের দ্বারা আহত হইয়া ব্রহ্মা কন্যা শতরূপার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। ঋষি পরাশরই বা কি করিলেন? দিবাভাগে দুর্গন্ধ শরীর মৎস্যগন্ধাকে ভোগ করিলেন। যাহাকে যোগীগণ শিরে ধারণ করিয়া বন্দনা করেন, তাপসগণের মধ্যে সেই ধূর্জ্জটী শিব মোহিনীর পশ্চাদ্‌ধাবন করিলেন—তাহার বিকার পরিলক্ষিত হইল। বিষ্ণু বিষয় প্রাপ্তির জন্য বৃন্দার মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন। অহল্যার কথা পুরাণে প্রসিদ্ধই আছে। দেবর্ষি নারদেরও কোন সময় ষাট্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আমার প্রতাপ সহ্য করে জগতে এইরূপ কেহ নাই। ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মারুতি। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকে ছাড়া আমি সকলকে আহত করিয়াছি। চন্দ্রকে কলঙ্কিত করিলাম। ইন্দ্রের অঙ্গে ক্ষত হইল। শঙ্করের আদরের কুমার কার্ত্তিকের পরাজয় হইল। আমি মন্মথ দেব ও দানব কেহ আমাকে সহ্য করিতে পারে না। মানুষ যতই জ্ঞানী হউক কেমন করিয়া সহ্য করিবে? আমাকে শঙ্কর জব্দ করিয়াছেন। সেই জন্য আমার নাম হইল অনঙ্গ। আপনার মত এমন আশ্চর্য্যজনক ধৈর্য্য ত্রিভুবনে আমি আর কাহারও দেখি নাই। আমার মত প্রভাবশালী কামকে আপনি পরাজিত করিলেন। শান্তি পথে কল্যাণ উদয় হইল। একক যশঃ আপনি লাভ

করিলেন। আপনার শান্তি শক্তির স্বভাবে আমাকে জয় করিলেন। কামকে জয় করিয়া ক্রোধের উপশম করিলেন। বাসনার সম্ভ্রম চিরদিনের জন্ম আপনি নিভ্রম (নিরসন) করিলেন। হে নারায়ণ! কোনও শ্রেষ্ঠ তপস্বী আপনার ন্যায় নিষ্ঠায় সাধনা করিতে পারিবে না। আপনি স্বানুভবের আঙ্গিনা প্রকাশ করিয়া শান্তির অভ্যুদয় করিলেন। পূর্ব্বে অনেক তপস্বীর কথা বলা হইয়াছে। তাহারা কাম ক্রোধকে জয় করিয়াছেন মনে করিলেও তাহাদিগকে আমরা ছলনা করিয়াছি। তবে শুনুন—কপিলের মত তপস্বী তাহাকে ছলনার ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সগর বংশ ধ্বংসের নিমিত্ত শাপ দিয়াছেন, দেবর্ষি নারদের ক্রোধ হইয়াছিল। নল কুবেরকে বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। গৌতম অহল্যাকে অভিশপ্ত করিয়া বনবাসী শিলা করিয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বদা লোকের বিঘ্ন দূর করেন তাহাকেও ক্রোধ ছলনা করিয়া'ছল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে অভিশাপ দেন। দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বরীষকে শাপ দিলেন। দেবতারও ক্রোধে গর্ভবাস স্বীকার করিতে হইল। ক্রোধ এইরূপে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে ছলনা করিয়াছে। প্রতি-সৃষ্টি করিতে সমর্থ এমন ঋষিগণও কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়াছেন। ইন্দ্রের সম্পত্তি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। ক্রোধের মহিমা পুরাণে প্রসিদ্ধই আছে। অপরের কথা আর কি বলিব, ক্রোধ শঙ্করকেও ছলনা করিয়াছে। বীরভদ্র দ্বারা যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত দক্ষ প্রজাপতির শিরশ্ছেদ ঘটাইলেন। আমি কাম যেখানে যেখানে যাই—ক্রোধ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে। হে নারায়ণ! আপনি কাম এবং ক্রোধকে একান্তভাবে বিনষ্ট করিলেন। আপনার এই সামর্থ্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। এইরূপ ধৈর্য্য অপরের নাই। শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ আপনার চরণ সেবন করেন। হে দেবাদিদেব! শান্তিলাভের ইচ্ছায় যাহারা নিত্য আপনার সেবা করেন, তাহারা আপনার নাম স্মরণেই কাম ক্রোধাদি স্বভাবকে অনায়াসেই জয় করেন। যে পরিমাণে কাম সসম্মানে ইচ্ছা পূরণ করে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্রোধ তাহাকে আদর করেন। কাম অতৃপ্ত হইলে ক্রোধ তাহাকে অভিশপ্ত করে। এই প্রকারে শাপ প্রদান ও অনুগ্রহ প্রকাশে সমর্থ পুরুষ কাম ক্রোধ মুক্ত হইয়াও নূতনভাবে কাম ক্রোধকে আপনি জয় করেন—ইহা বড়ই কৌতুকের বিষয়। তবু কোন অভিমান নাই অহংকার নাই। তাহাকে লঘুও করনে না উপেক্ষাও করেন না। লাঙ্গল ভূমির বুকে ক্ষত

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্ধ্নি ॥১০॥

করে—দুঃখ দেয়; কিন্তু সে ধান্য দান করিয়া সুখী করে। সেই প্রকার অপকার করিলেও যে উপকার করে সে মুক্তির মাথার মুকুট। হে কৃপামূর্ত্তি! আপনার নির্ব্বিকার শান্তি, ইহা নূতন কথা নয়। স্বরূপের স্থিতি নিশ্চয় রূপে আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। তিনি নির্গুণ নিরূপম মায়াতীত পূর্ণব্রহ্ম। আপনার স্বভাব স্মরণে সকাম পুরুষকে কামনা স্পর্শ করিতে পারে না। যে নিত্য আপনার নাম স্মরণ করে তাহার কামনা নিষ্কামরূপে পরিণত হয়—ক্রোধ শান্ত হইয়া যায়—মোহের পরম প্রবোধ হয়। যাহারা ধীর বীর, আত্মার শান্তিতে যাহারা পরমানন্দে নিত্য তৃপ্ত এইরূপ অগণিত ভক্তশ্রেণী আপনার চরণে লগ্ন হইয়া থাকে। আপনাকে নমস্কার করিলে মহাসিদ্ধির সামগ্রী পূর্ণ হয়। ফলে একান্ত অবসর পাইয়া পরমাত্মা পরাৎপর আপনাকে লাভ করে। আপনার সেবকের সমীপে বিঘ্ন আসিয়া অসহায় হইয়া পড়ে। আপনার শক্তির সম্মুখে সকলেই দুর্ব্বল ॥৯॥

হে নারায়ণ! আমাদের স্বভাব তপস্বীর বিঘ্ন উৎপাদন করা—তাহাদের উপদ্রব করা—তপ ভঙ্গ করা ইহা আশ্চর্য্য নয়। হৃদয়ে কামকে গোপন রাখিয়া বাহিরে জপ তপ ভক্তির ভাব দেখাইয়া যাহারা প্রবঞ্চকরূপে অবস্থান করে তাহাদের সমীপে জোড় বিঘ্ন উপস্থিত করি। তবে সেই বিঘ্ন করিবার শক্তি তোমার ভক্তগণের সমীপে চলে না, কারণ তুমি ভক্তাভিমানী ভক্তের রক্ষক তাই বিঘ্ন সব সময় পরাঙ্মুখ হয়। আমার ভক্তের বিঘ্ন কোথা হইতে আসিবে? এইরূপ যদি বল, হে দেবাধিদেব! তবে বলি শুন, তোমার কি অভিপ্রায় তাহা তুমিই জান। আত্মপদ প্রাপ্তির জন্য স্বর্গের সুখে পদাঘাত করিয়া যাহারা নিষ্কাম বুদ্ধিতে তোমার ভজন করে তাহাদের উপরও, হে প্রভু, নানাপ্রকার বিঘ্নপাত হইতে দেখা যায়। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভাবেন "আমাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পরম পদলাভ করিবে" ইহা হইতে পারে না। অতএব নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করিব। আমাদিগকে যজ্ঞভাগ না দিয়া

পূর্ণানন্দের অধিকারী হইবে, এই আক্রোশে তাহারা অনেক বিঘ্ন উৎপাদন করেন। ভজন ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বিঘ্নের ছলে দেবতাগণ ধাবিত হন কিন্তু ভক্ত বিঘ্নদ্বারা পরাভূত হন না। তুমি, হে হৃষীকেশ, তাহাদের রক্ষক। সকাম কল্পনা ছাড়িয়া যাহারা তোমার চরণে নিরত হইয়া থাকে তাহাদিগকে, হে নারায়ণ, তুমি অষ্টপ্রহরই রক্ষা করিয়া থাক। ভক্ত কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ভীত আর্ত্তভাবে প্রার্থনা করে "হে ভগবন্, শীঘ্র এস, দেখিয়া যাও তোমার ভক্তের দুরবস্থা"। তুমিও প্রার্থনা শুনিয়া ছুটিয়া আস, কখনও নিষ্ঠুর হও না। ভক্তের কাছে যেন বিঘ্ন না যাইতে পারে এই ভাবে ভক্তের চতুর্দ্দিকে থাকিয়া তাহাকে সদা রক্ষা কর। বিঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়া ভক্তকে ছলনা করিতে আসিলে ভক্ত সেই বিঘ্নের মধ্যে, হে ভগবান, তোমারই স্বরূপ দর্শন করেন। এজন্য সে তাহার সমীপে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে না। হরিভক্তকে কামনা ছলনা করিলে সে কামনার মধ্যেও শ্রীহরিকে দর্শন করে অতএব বিঘ্ন তাহার নির্ব্বিঘ্ন হইয়া যায়। ভক্তের স্বপ্নেও ভয় নাই। বিঘ্ন বিরোধ সৃষ্টি করিলে সেই বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যেও ভক্ত গোবিন্দকে দর্শন করেন। বিরোধ তাহার সমীপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আনয়ন করে। আত্মানন্দ দান করে। তোমার চরণেই যাহার ভাব বিঘ্ন তাহার সমীপে পরমার্থ প্রকাশ করে। ভাববলে, হে সর্ব্বসমর্থ প্রভু, তুমি নিজভক্তকে নিরন্তর সাহায্য কর। তুমি রক্ষক তাই ভক্তগণ সকল বিঘ্ন জয় করেন এবং ইন্দ্রপদকে তুচ্ছ করিয়া তোমার কৃপায় পরমার্থ লাভ করেন। হে ভগবন্, তুমি যাহাদিগকে রক্ষা কর তাহাদেরও বিঘ্ন অনুসরণ করে। তবে অসহায় সকাম ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কি বলা যায়? তবে, হে জনকরাজ, তাহাদের কথা শুনুন। মনে বিষয় ভোগের কামনা লইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে নানা প্রকার উপহারসহ পূজা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান যাহারা করেন তাহাদের প্রায়শঃ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। যাজ্ঞিকগণের রাজা ইন্দ্র, সকাম যাজ্ঞিকগণ দেবতাদের প্রজা—প্রজার প্রদত্ত বলি ও পূজা লইয়া দেবতারা বিঘ্ন করেন না। যদি বলা যায় কামাদি তাহাকে বিড়ম্বিত করিতে পারে, তদুত্তরে বলা যায় যে তাহা করিবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ সেই সকল সকাম সাধকের কখনও নিষ্কাম ভাবের জন্য তাগিদ নাই। তাহারা স্বাভাবিক ভাবেই কামনার বশীভূত হইয়া থাকে। তাহারা যে সকাম কর্ম্মই করে। অতএব যাহারা কামনার বশ

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্নান্‌
অস্মানপারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো-
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥১১॥

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্বিভুঃ ॥১২॥

হয়, তাহারা তপশ্চর্যার ফল খরচ করিয়া তাহার বিনিময়ে ভোগলাভ করে। যাহারা ক্রোধের বশ হয়, তাহাদের তপস্যা আচরণ বৃথাই হইয়া থাকে ॥১০॥

প্রাণায়ামে নিজের পঞ্চপ্রাণ সংযত করিয়া বাত বর্ষা শীত উষ্ণ সর্ব্বপ্রকার অবস্থা সহ্য করিয়া যে অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকে, জিহ্বা শিশ্ন প্রভৃতিকে সংযত করিয়া যে নিষ্কাম অভিমানী নিজের মনকে পরাজিত করিয়াছে ব'লয়া মনে করে, সে উন্মাদ। কেন না, দেখা যায় অতি অল্প অপমানেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া যায়, অভিশাপ দিয়া বসে এবং নিজের নিষ্ঠাও তপস্যা সম্পৎকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। সকাম ব্যক্তি তপস্যানুষ্ঠান করিয়া কাম সঙ্গে স্রক্‌ চন্দনাদি ভোগ করে, অপ্সরা সঙ্গে স্বর্গে অমৃত পান করে কিন্তু সেই ভোগের মধ্যেও কামকে উপেক্ষা করিয়া ক্রোধের বশ হয়। তাহারা নিজের তপস্যার অগ্নিতে জল ঢালিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। অপার সাগর পার হইবার সামর্থ্য ধারণ করিয়াও গোষ্পদ জলে ডুবিয়া যাওয়ার মত কাম জয় করিয়াও ক্রোধে ডুবিয়া যাওয়া বড়ই অনুতাপের বিষয়। কামের যে অপূর্ণ কামবৃত্তি উহা হইতেও ক্রোধের দৃঢ়তা অধিক। কাম ও ক্রোধ অভক্তকে পরাজিত করে, হরিভক্তের উপর তাহাদের প্রভাব চলে না। হে ভগবন্‌, তোমার ভক্তের প্রতি কাম ক্রোধের বন্ধন খাটে না। তুমি যে ভক্তের প্রাণপতি নারায়ণ, তোমার আমাকে কাম কি প্রকারে বন্ধন করিবে? তোমার মহিমা না জানিয়া আমি নিজের ধর্ম্মের গৌরব করি। হে কৃপালু পুরুষোত্তম, নিত্যই তোমার সমীপে ক্ষমা আছে ॥১১॥

অপকারীর উপকার করার নামই নির্ব্বিকার শান্তভাব। সেই শান্ত-ভাবের পরিপাক দশায় নিজের বিঘ্নকারীদিগকে শ্রীনারায়ণ দান দিলেন।

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ ॥১৩॥

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব ।
আসামেকতমাং বৃঙ্‌ধ্ব সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্ ॥১৪॥

কামাদি নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহার স্তুতি করিলেন। তখন অপ্সরাগণ অকস্মাৎ অতিশয় অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। নানা প্রকার আশ্চর্য্য সুন্দর অলংকার পরিচ্ছদে ভূষিতা পরম সুন্দরী নারীগণ নারায়ণের সেবার নিমিত্ত অত্যন্ত তৎপরতার সহিত আদর ভরে অগ্রসর হইলেন। নারায়ণের লীলা কি চমৎকার, কি প্রকারে এইরূপ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করিলেন তাহা জানা যায় না। সেই সুন্দরীদিগের সমীপে স্বর্গের অপ্সরাদিগের দিব্যালোক খদ্যোতের প্রভার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া রহিল ॥১২॥

এই রমণীগণের দৃষ্টিপাত মাত্র কাম মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল। বসন্তের লাল ঝরতে শুরু করিল, সে অত্যন্ত লুব্ধ হইল। ক্রোধের দৃষ্টি তটস্থ হইয়া রহিল। ভ্রমর গুঞ্জন ভুলিয়া গেল। কোকিল পঞ্চম তান বিস্মৃত হইল। প্রাণ স্পন্দন ভুলিল। দেবানুচরগণ আত্ম বিস্মৃত হইল। তাহাদের রূপের সমীপে অপ্সরাগণকে দাসী বলিয়া মনে হইল। তাহাদের অত্যন্ত লজ্জা হইল। তাহারা মলিন হইয়া রহিল। সুন্দরীদিগের অঙ্গসম্ভূত সুগন্ধি-বাতাসে বসন্ত ভুলিয়া গেল। মলয়ানিল ভ্রান্ত হইল। সেই নারায়ণের বিদ্যার কথা কে বলিবে? তিনি নিজের যোগমায়া দ্বারা নিজেই ভুলিয়া থাকেন। আপনাকে ভুলাইবার শক্তি তাহাকে তিনি দিয়াছেন। সুন্দরীর মধ্যে প্রধান রম্ভা তিলোত্তমা। সমুদ্র মন্থনে শ্রীলক্ষ্মী উদ্ভূত হইয়া সেই সুন্দরীগণকে পরাজিত করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বজয়া লক্ষ্মী হইতেও অধিক সৌন্দর্য্যধারিণী আজিকার সৃষ্টি সুন্দরী নারী। পরম উত্তম তাহার রূপ ॥১৩॥

অতীব আশ্চর্য্য, তাহাদিগকে দেখিয়া কামাদি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের জ্ঞান সঞ্চার হইলে শ্রীনারায়ণ হাসিয়া তাহাদিগকে বলেন। আমি তোমাদিগকে অবশ্য সম্মান প্রদান করিব। ইন্দ্রের সন্তোষের নিমিত্ত তোমাদিগকে আমি উপহার দিব। ইহাদের মধ্য হইতে তোমাদের পছন্দমত

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্ব্বশীমপ্সরঃ শ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥১৫॥

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃন্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
উচূর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥১৬॥

একজনকে অঙ্গীকার কর। যাহাদের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত অধিক তাহাতে তোমরা অপমান বোধ করিতে পার, এজন্য তোমাদের সমান সুন্দরী একজনকে গ্রহণ কর। যদি বল ইহাদের মধ্যে কেহই অল্প সুন্দরী নয়, সকলেই সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, আমাদের সমান কাহাকেও দেখি না। তবে কেমন করিয়া কাহাকে গ্রহণ করিব? তদুত্তরে বলি—সকলেই যদি সৌন্দর্য্যে অধিক, কেহ যদি তোমাদের মত না হয়, তবে একজনকে বরণ করিয়া লও, সে তোমাদের স্বর্গের ভূষণ হইয়া থাকিবে। নারায়ণের এরূপ বাক্য শুনিয়া অপ্সরাগণ হর্ষের সহিত নারায়ণকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার পূর্ব্বক তাহার বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন ॥১৪॥

শ্রীনারায়ণের বচন শুনিয়া তাঁহার চরণ কমলে মস্তক রাখিয়া উর্ব্বশী প্রণাম করিলেন। কামাদি দেখেন, নারায়ণের উরুদেশ স্পর্শ করিয়া উর্ব্বশী এই নামে স্বর্গাঙ্গনাগণ মধ্যে প্রসিদ্ধ হইলেন। সেই দেবদূতগণ সকলে স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন এবং ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া অদ্ভুত নারায়ণ শক্তির কথা বলিলেন। নারায়ণের অতি পবিত্র চরিত্র তাহারা বর্ণনা করিলে সুরবর ইন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইলেন। উর্ব্বশীকে দেখিয়া ইন্দ্র দিবারাত্রি ভুলিয়া রহিলেন। বর্ষের পর বর্ষ অতিবাহিত হইলেও সভার বাহিরে আর তাহার যাওয়া হইল না।

এই হইল প্রথমাবতার নারায়ণের কথা। হে রাজন্, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। ছলনা বঞ্চনা বা বিঘ্নকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার পূজায় স্বরূপ দর্শন যে ভাবে নারায়ণ করিলেন উহারই নাম 'পূর্ণানুভব'।

আশঙ্কা করা যায়, যাহারা ভাবের সহিত ভক্তি করে তাহাদিগকেও বিঘ্নদ্বারা ইন্দ্র বাধা সৃষ্টি করে, তবে চৈতন্যঘন শ্রীনারায়ণ তাহাদের বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দেন। কিন্তু সাধারণ অবোধজন যদি ভক্তি করে এবং এরূপ

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং
দত্তঃ কুমার ঋষভো ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥১৭॥

বিঘ্ন যদি তাহাদের বাধা দেয় তবেতো আর তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। তদুত্তরে আশঙ্কা দূর করিয়া বলা যায় যে যাহার ভ্রূকুটিমাত্র ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বজীব নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই ভগবানকে যাহারা ভজন করে সেই ভক্তগণকে কোনো বিঘ্ন আসিয়া পরাভূত করিতে পারে না। যাহার অনুগ্রহে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সেই নারায়ণের ভক্তের বিঘ্ন করিবে কে? হরি নিজ ভক্তকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কামদেব পর্যন্ত যাহারা জীবসকলকে ছলনা করে, তাহাদিগেরও নিয়ন্তা চালক শ্রীনারায়ণ, কাজেই ভক্তগণকে বিঘ্ন স্পর্শ করে না। যাহাতে বিঘ্ন অভিভূত না করিতে পারে সেজন্য তাহারা নিত্য নারায়ণকে স্মরণ করে। ভক্ত সংরক্ষণ হরিনামে সকল বিপদ কাটিয়া যায়। নিজের ভক্তের সহায়তায় ভগবান্ নানা অবতার রূপ ধারণ করেন তাহাদের চরিত্র অতিশয় বিচিত্র বলিয়া জানিবে ॥১৫।১৬॥

ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি পিতার সমীপে প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নোত্তর প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ হংসাবতারে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন। নিত্য হরিনাম স্মরণ করিলে মহাবাধা দূর হয় এবং উত্তরোত্তর অবতার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার উদয় হয়। যাহার নামে কৃতান্ত পলায়ন করে, জন্মমরণ ভয় দূর হয়, সেই অবতার শ্রীদত্তাবতার মূর্ত্তিমান পরব্রহ্ম। যাহারা সর্বতোভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, স্বপ্নেও যাহাদের কোনো বিকার হয় নাই, এজন্য সনকাদিকে কুমার অবতার বলা হয়। আরও এই 'নব যোগেন্দ্র' আমাদের যিনি পিতা সেই ঋষভদেব নারায়ণের তত্ত্বজ্ঞানী ভগবানের অবতার। নাম রূপে সংপূর্ণ অবতার নারায়ণের অবতারী জগতের প্রতিপালক শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশে অবতীর্ণ। সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মধুকৈটভ নির্দলন মধুসূদন নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই হয়গ্রীব নাম ধারণ করেন। শংখাসুরকে বধ করিয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত বেদ উদ্ধার করিয়া তিনি ব্রহ্মাকে অর্পণ করেন। তিনি বেদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিবে ॥১৭॥

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রোড়ে হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাম্।
কৌর্ম্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে
গ্রাহাৎ প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তম্ ॥১৮॥

সংস্তুন্বতোঽব্ধিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ
শক্রঞ্চ বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা
জঘ্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে ॥১৯॥

তাহারই মৎস্যাবতারে প্রলয়কালের মহাসাগরের জলে মনুসহ সকল জীব ও বীজ ওষধী রক্ষা করেন। ক্ষীরসাগর মন্থনকালে তিনিই কমঠ (কূর্ম) অবতার প্রকাশ করিয়া নিজ পৃষ্ঠে মন্দর ধারণ পূর্ব্বক মন্থনের ফল অমৃত দেবতাদের অর্পণ করেন। শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যাক্ষ প্রভাবে রসাতল গত পৃথ্বীকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে পূর্ণ ভক্তি উপদেশে অভিনব শান্তি দান করিয়াছেন সেই কৃপা মূর্ত্তি ভগবান্। আর্তত্রাণের নিমিত্ত অত্যন্তচঞ্চল গতিতে বৈকুণ্ঠ হইতে গরুড়ের পৃষ্ঠে উড়িয়া যাইয়া গজেন্দ্রকে গ্রাহের বন্ধন হইতে মুক্ত করেন হরি ॥১৮॥

এক সময় অকালে প্রলয়ের জলপ্রবাহ মার্কণ্ডেয় মুনিকে ডুবাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বটপত্রশায়ী বাল গোপাল রূপে তাহাকে রক্ষা করিলেন। এক ঋষি শালগ্রাম পূজা করিতেছিলেন। তখন নল নামক বানর আসিয়া তাহার বানর স্বভাব সুলভ চঞ্চলতায় সেই শিলা সমুদ্রের জলে ছুঁড়িয়া ফেলিলে ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন তোমার হাতে শিলা জলে ডুবিবে না। তখন দেখা গেল শালগ্রাম শিলা জলে ভাসিতে লাগিল। সমুদ্রের তরঙ্গে শিলা তীরের দিকে আসিলে ঋষি উহা জল হইতে তুলিয়া লইলেন। সেই সময় ভগবান্‌কে আর্তিহরণ এই নামে ঋষি স্তব করেন। ভগবান্‌ও সেইভাবে অবতীর্ণ হইয়া অর্চ্চনাকারী ঋষিকে উদ্ধার করিলেন। বজ্রাঘাতে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপে মগ্ন। শ্রীঅনন্ত তাহার এই অবস্থা

দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং
যাচ্ঞাচ্ছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ ॥২০॥

দেখিয়া তাহাকে অন্ধতম হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া তাহার পাপ চারভাগে বিভক্ত করিয়া ভূমি, জল, স্ত্রী প্রভৃতিকে দিলেন, কৃপালু ভগবানের এই কৃপা প্রদর্শনে ইন্দ্র পাপমুক্ত হইল। মুর নামক দৈত্য অমরপুর অধিকার করিয়া অন্তঃপুর হইতে দেব পত্নীগণকে হরণ করে। শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া মুরকে বধ করেন এবং মুরারি নাম ধারণ করেন। দেবপত্নীদের মুক্ত করিয়া দেবতাগণকে অর্পণ তাঁর লীলা। অসুরশ্রেষ্ঠ, বিদ্বেষীগণের অগ্রগণ্য, হরিনাম শুনিলেই যাহার অত্যন্ত ক্ষোভের আগুণ জ্বলিতে থাকে, যে ক্রোধের সমুদ্র, অবিচারের খনি, যে হরি স্মরণকারী পুত্রের বিরোধী, গর্ব্বভরে উন্মাদ, সেই হিরণ্যকশিপুকে নখাস্ত্রে নিধন করিয়া নিজ ভক্তের সহায় সাধুগণের অভয়দাতা নরসিংহ আবির্ভূত ॥১৯॥

সমুদ্র মন্থন সময়ে ক্ষীর সাগরের তটে দেবতা ও অসুরের অমৃত পাওয়ার আশায় মণ্ডলী মধ্যে তাহাদিগকে অমৃত বণ্টনের নিমিত্ত মোহিনী অবতার। অসুরগণকে মদ্য ও অন্যান্য খাদ্য প্রদান করিয়া দেবতাগণকে অমৃত পান করাইলে তুমি। চুরি করিয়া রাহু অমৃত পান করে বলিয়া তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া তাহার কবন্ধের উপর তর্ক জুড়িয়া দিলে তুমি নিজেই। দেবতাদের সহায়তার নিমিত্ত নারায়ণ কুশকে দলন করিয়া লবণাসুরকে মর্দ্দন করিয়া নিজে কুমার রূপে অবতীর্ণ হইলে। এইরূপে মন্বন্তরের পর মন্বন্তর নিজ ভক্তের সহায়তায় সুরকার্য সাধনের নিমিত্ত শ্রীহরি নানা অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগতের জীবন শ্রীহরি সুরকার্যে কুব্জদেহ বামন হইয়া যাচকরূপে দেবতাগণকে অপমান হইতে উদ্ধার করিলেন। দানে অপরাজেয় বলি। দেবতাগণ তাহার সহিত বিরোধ করিতে পারেন না। কিন্তু ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিকে ছলনা পূর্ব্বক তিনি পরাজয় করিলেন। তথাপি ভক্তি বলে বলি বলবান্, কাজেই পরিশেষে শ্রীহরিকে দ্বারপাল করিয়া

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাং ত্রিঃসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ ॥২১॥

রাখিলেন। শ্রীহরি ভক্তের প্রাণের পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই তাহার দাস্য করিতে বাধ্য হইলেন। বলিকে ছলনা করিতে ভগবান ত্রিবিক্রম সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিলেন এবং এই ভাবে দেবতাদের হৃতরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে সুখী করিলেন ॥২০॥

অনন্তর পরমোত্তম দেবাধিদেব নিজেই পরশুরাম হইলেন। নিজের প্রতাপে এই অবতারে ক্ষত্রিয়ের বল খর্ব করিয়া দিলেন। গো-ব্রাহ্মণের সহায়ক পরশুরাম সহস্রবাহু অর্জ্জুনের সংহারী, তাহার সহস্রবাহু ছেদন করিলেন। জমদগ্নির ক্রোধাগ্নি পরশুরামকে প্রজ্বলিত করিয়াছিল। হৈহয়কুল ধ্বংস করিয়া পৃথিবী হইতে ক্ষত্রিয় নিশ্চিহ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তিনি। একুশবার বীররস প্রয়োগে ক্ষত্রিয়গণের জন্মমৃত্যু রোগকে তিনি শান্ত করেন (অর্থাৎ ভগবানের অবতার পরশুরামের হস্তে নিহত হওয়ার ফলে তাহারা মুক্তিলাভ করেন)। অবতারগণের গুণের মধ্যে মূলপীঠ বীরবৃত্তি অতি উদ্ভটরূপে দেখা গিয়াছে, অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিবরিষ্ঠ শ্রীরাম। রামনামে পাপ পলাইয়া যায়। নামাঙ্কিত শরীর হইলে যমও তাহাকে বন্দনা করে। গণিকার পাপও সমূল বিনষ্ট হয় শ্রীরাম নামে। নামের প্রভাবে কলিকাল কম্পিত হয়। যমদূতেরা নামের প্রভাবে নিরস্ত হয়, তাহাদের ভিক্ষা মিলে না। রামনাম কীর্ত্তনে জন্ম-মৃত্যু ভয় দূর হয়। নামের গুণে দৈব দুর্বিপাক আর থাকে না। নবগ্রহের বন্ধন ছিন্ন হয়। ত্রিলোকে রামরাজ্যের ধ্বজা উড্ডীন হইয়া থাকে এই নামের মহিমায়। নামের শক্তিতে সমুদ্রে শিলা ভাসিয়া থাকে। বানরেরা রাক্ষসগণকে নিহত করে। সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত লংকাপুরী শরণাগত বিভীষণকে দান করা হয় এই নামের গুণে। মূর্ত্তিমান প্রতাপ, যাহার মহিমায় অনায়াসে সেতুবন্ধন, চরণ স্পর্শে শিলা উদ্ধারণ। যিনি নিজ ভক্তের সমীপে

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা
জাতঃ করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্
শূদ্রান্ কলৌ ক্ষিতিভুজোন্যহনিষ্যদন্তে ॥২২॥

পরম প্রেমী, সেই মূর্ত্তিমান অবতার অদ্যাপি সেই ভাবেই আছেন। ত্রেতাযুগের এই সংবাদ দ্রুমিল যোগেন্দ্র বিদেহরাজকে উপদেশ করেন। এই জন্যই যে ব্যক্তি নিত্য শ্রীরাম রাম এই নাম জপ করেন, তিনি সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মবন্ধন মুক্ত। হঠাৎ যাহার কানে রাম নাম স্পর্শ হয়, সে ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া যায়। রাম নামের এই প্রকার মহিমা। জগতের উদ্ধারেই নামের মহিমা বিস্তার। যে নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, রাম চরিত্র বর্ণনা করে তাহার ধন্য ধন্য পড়িয়া যায় ॥২১॥

অনন্তর, হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণাবতার কথা যাহা অতি অদ্ভুত ও বিচিত্র তাহাই বলিতেছি। যিনি পরম পরাৎপর যিনি অজ অক্ষর বেদ অগোচর সেই পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ। যাহাতে নামের উপাধি স্পর্শ করে না, যিনি রূপের অতীত, ব্রহ্মত্বও যাহার অঙ্গে সহ্য হয় না, এরূপ অবতার শ্রীকৃষ্ণ। যিনি বর্ণাশ্রমের অভিমান স্পর্শশূন্য, ঈশ্বরত্ব যাহার মোটে সহ্য হয় না, যিনি জন্মরহিত অব্যয়, স্বানন্দমগ্ন সেই আত্মলীল অবতার শ্রীকৃষ্ণ। এই প্রকার গুণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলের অতীত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি স্বয়ং জগন্নাথ স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ। কলধ্বনিময় জল কল্লোল বা প্রবাহের চঞ্চলতায় শুদ্ধ জল ভিন্ন আর কিছু নাই। কিন্তু উহাকে যখন মলিন বা ঘোলা কর্দমাক্ত দেখায় উহা শুধু বসুধা মৃত্তিকারই বিকার। রাশীকৃত শর্করা খণ্ড হইতে মিষ্ট স্বাদ পৃথক্ করিয়া লইলেও অবশিষ্ট যাহা থাকে উহা শর্করারই অবশেষ। সেইরূপ যদুবংশে স্বাংশ সহিত পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ তাহার আলোক প্রভা ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ জন্মাবধি বাল্যেই শ্রীকৃষ্ণ অভিনব লীলা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতারও বিস্ময় হয় দেবাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ এরূপ লীলা করেন। বনের আগুণ উদরস্থ করিলেন, পর্বত অঙ্গুলির অগ্রে ধারণ করিলেন, পূতনার

বিষমাখা স্তন তাহার প্রাণের সহিত চুষিয়া খাইলেন। বৎসহরণ ব্যপদেশে ব্রহ্মাকে বিস্মিত করিয়া বৎস ও বৎসপালক রূপে সমগ্র ব্রজ ভরিয়া তিনি এক অদ্বিতীয় রূপে রহিলেন। অঘাসুরের বিক্রম বিনষ্ট করিলেন। কালিয় নাগের কুটিলতার শেষ করিলেন। যমলোকে যাইয়া অবরুদ্ধ গুরুপুত্রকে আনয়ন করিলেন। অসংখ্য রাজন্যবর্গ পৃথিবীর ভারস্বরূপ, তাহাদিগকে নিহত করিলেন। কাহাকেও যুদ্ধে লিপ্ত করিয়া অপর কাহাকেও স্বহস্তে আবার কাহাকেও অন্য শত্রুদ্বারা ধ্বংস করিলেন। কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ সৃষ্টি করিয়া অনেককে বধ করিলেন। অগ্রপূজা গ্রহণের অছিলায়ও শিশুপালকে বধ করিলেন। অধর্মের শাসন ও ধর্মের মহিমা বৃদ্ধি করিলেন। এই সকল অবতার লীলাকৌতুক, হে রাজন্, অবশ্যই আপনি অবগত আছেন। দিনের পর দিন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ নব নব লীলা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সুখের পাত্র ভক্ত উহাতে পরম পবিত্রতা লাভ করেন। সাধুগণের আনন্দ বর্দ্ধক নিত্য নবরূপে আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ লীলা, হে রাজন্, আপনার শুদ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করুন।

তাহার বুদ্ধাবতার। দৃঢ়ভাবে মৌনব্রত ধারণ করিলেন তিনি। কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা কেহ আর করিতে পারিল না। তিনি তটস্থ ভাবে মহাবাদ খুব উচ্চ স্তরের কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সাধারণ মানুষের মহামোহ উপস্থিত হইল। এরূপ মোহের ফলে কর্ম্মঠ কর্ম্ম করিতে লাগিল, অপরে কর্ম্মভ্রষ্ট হইল। আত্মহিত কিসে হয় সে পথ বুঝিতে অসমর্থ হইল। তাহারা বেদকে মিথ্যা মনে করিয়া বেদবিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করার ফলে মহামোহে পড়িল। মোহ সকলকে ছলনা করিয়া জ্ঞানাভিমানী করিল। তাহারা বৈদিক সকল কর্ম্মকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং কর্ম্ম অনুষ্ঠান মূর্খের কার্য বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিল।

এই প্রকারে মোহ পরিব্যাপ্ত হইলে পূর্ণ কলির প্রবৃত্তি হইল এবং নীচেরা শাসনকর্তা হইল, চোরের মত প্রজার ধন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। আচারহীন অতি নীচ লোক শাসনভার পাইয়া মহাপাপাচরণ করিতে লাগিল জাতিবর্ণ ধর্ম্ম হইতে সকলকে ভ্রষ্ট করিল। অপরাধ ভিন্নও ভাল লোককে ধরিয়া দণ্ড দিতে প্রবৃত্ত হইল। ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তিকে ছল চক্রে ফেলিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিল। দুর্ব্বলের বল রাজা। সেই রাজাই যদি প্রজাকে লুণ্ঠন করে, এরূপ অধর্ম্ম হইলে গরুড়ধ্বজ ভগবান্ তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

এবং বিধানি কর্ম্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মাচরণে ধর্ম্মাচরণ বাধা প্রাপ্ত হইলে শ্রীনারায়ণ 'কল্কি' অবতার প্রকাশ করেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে দুষ্ট শাসকগণকে নিহত করিয়া মহামোহের মূলোচ্ছেদ করেন। তাহাতে ধর্ম্মের নবপ্রভাত প্রকাশিত হয়—সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বেদোক্ত কর্ম্মের প্রবর্তন হয়। স্বধর্ম্মাচরণে জনগণ প্রবৃত্ত হয় ॥২২॥

তাঁহার নাম অনন্ত, জন্ম অনন্ত, অবতার অনন্ত, অনন্ত চরিত্র, অনন্ত কর্ম, পরমোত্তম অনন্ত হরিকীর্তি। ভগবানের মহিমা অগাধ। তাঁহার জন্ম কর্মের পার পাওয়া যায় না। তাঁহার মহিমা অনুষ্টপ্‌ ছন্দে অল্প কথায়, হে, রাজন্‌, তোমার সমীপে বর্ণনা করিলাম।

এই প্রকার অবতার লীলা ও নাম বিচিত্র কর্মের বিস্তার কথা শ্রবণে রাজার মন শান্ত হইল। অবতার রূপে সগুণ মহিমা কিন্তু সেই লীলা সকলই গুণাতীতের গুণ। স্বয়ং ভগবান সেই গুণ জাতি কর্মআচরণ করিয়া জীবের নিকট উহা প্রকাশ করেন। ধন্য সেই হরিগুণ, ভগবদ্‌ভক্ত সেই গুণাবলী কীর্তন করে। শ্রোতা শ্রবণেন্দ্রিয়ে উহা গ্রহণ করে। তাহাতে বক্তা স্বানন্দ সুখ লাভ করে। ফলে আপনা আপনি স্বতঃস্ফূর্তরূপে সাহিত্যরসে গ্রন্থের মধ্যে প্রসাদগুণের বৃদ্ধি হইতে থাকে। গ্রন্থ সাহিত্য গৌরবে রসাল হয়।

চন্দ্রকিরণ যেরূপ চকোরের মুখরতা সৃষ্টি করে সেইরূপ সাধুগণের কৃপা জনার্দনের একার বাণীকে ফুটাইয়াছে। সূর্য্যকিরণ স্পর্শে যেরূপ কমল কলিকা স্বয়ং বিকসিত হয় সেইরূপ সাধুগণের কৃপা সূর্যকিরণে তাৎপর্য সহ এই গ্রন্থকে বিকসিত করিয়াছে। তাহাদের কৃপায় শ্রীভাগবতের তত্ত্বকথা অনন্তর পঞ্চমাধ্যায়ের অন্তর্গতরূপে শ্রোতৃবৃন্দ মনোযোগের সহিত অবধান করুন।

রাজা মধুর প্রশ্ন করিয়াছেন। উহা শুনিলে মনের আশা পূর্ণ হয়। সাধকের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় এবং ধর্মাধর্মের সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে ভজনকামী ভক্তের ভজন কথা অত্যন্ত রসাল। উহা শুনিলে অধর্মের গ্রন্থি খুলিয়া যায়, উত্তম সিদ্ধান্তে সাধুগণের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, জনার্দনের কৃপায় একনাথ তাহা বর্ণনা করিতেছে। আবিষ্ট জন যেমন না বুঝিয়া কথা বলিয়া যায়, তেমন করিয়াই একার মধ্য দিয়াই জনার্দন কবিতা রচনা করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

উদার সদ্‌গুরুদেব তোমাকে নমস্কার। তুমি যেমন উদার আবার অত্যন্ত কৃপণও। তোমার কৃপা প্রার্থনা করিলে দ্বৈতভাব হরণ কর। এমন কি দ্বিতীয় সঙ্গী স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করাও। তোমার মিলনে তুমি সাধককে আত্মসাৎ কর। প্রার্থনীয় সকল বস্তুকে ঐক্যসূত্রে বন্ধন পূর্ব্বক তুমি সর্ব্বময় হইয়া যাও। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নেও দ্বৈত ভাব থাকে না কোনোমতে তোমার প্রাপ্তি হইলে তুমিই সংসারের সকল সম্পদ হও। তোমার প্রসন্নতায় জীবভাব বিনষ্ট হয়। প্রার্থীর সর্ব্বস্ব তুমি লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে এই ধরণীতে নির্লজ্জের মত নাচাইয়া থাক। এই তোমার নির্বাণ স্থিতি। তুমি যে উদার এই কীর্ত্তি কি ভাবে হয় ইহা যদি বল তবে চমৎকার কথা শুন। পূর্ব্বে উদার বলিয়া যাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করা হইয়াছে সেই তুমি সকলকে আত্মসদৃশ করিয়া থাক। আর সেই ঔদার্যগুণে তাহারা তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করে। ষড়গুণ ঐশ্বর্য বৈভবসহ তুমি প্রার্থীকে দান করিয়াছ। এরূপ দাতা আর কেহ নাই। আত্মদানের ফলে তুমি দাসের অধীন হও। তাহার ছন্দেই তুমি নৃত্য কর। বলি দৈত্যরাজ সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে, ফলে তুমি তাহার অধীন হইয়া দ্বারপাল স্বরূপে দ্বার রক্ষা কর। যুধিষ্ঠির অগ্রপূজা দিয়াছে তুমি তাহার সেবা করিয়াছ। সকল সংকটে রক্ষা করিয়া নিজের হাতে তাহাদের উচ্ছিষ্ট নিজের গায়ে মাখিয়াছ। অম্বরীষ তোমাকে আদর করিয়াছেন তাহার গর্ভবাস নিজে অঙ্গীকার পূর্ব্বক মুক্তি দিয়াছ। ব্রজের গোপী তোমাকে পালন করিয়াছে বলিয়া তাহাদের গোধন সম্পদ রক্ষা করিয়াছ। ভক্তকে স্ব স্বরূপ-দানের ক্ষমতা এক তোমারই আছে। তোমার উদারতা ধনী দরিদ্র সকলের প্রতি। সমভাবে প্রেমে অবশ তুমি। তোমাকে লাভের নিমিত্ত যোগী গিরিকন্দরে বাস করে। কেহ ভোগ পরাঙ্মুখ আর কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বিরক্ত। কেহ তোমার অন্বেষণে পরিব্রাজক কেহ উৎকণ্ঠিত পাগল, তবু স্বপ্নেও তোমার দর্শন পায় না।

সাধুর চরণে প্রীতি ভক্তির ফলে অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন হইলেও তুমি সুলভ। সাধুর চরণানুরাগে রঙ্গীন হইলে পরমাত্মার দর্শন সহজ হয়। সর্ব্বত্র অবস্থিত

শ্রীরাজোবাচ।

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্ত কামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥১॥

ভগবান্ অনন্তরূপে অবতীর্ণ সাধু মূর্ত্তি—শ্রীহরিরই বিভিন্ন রূপ। সাধুর কৃপালাভের নিমিত্ত যত্নবান হইতে হইবে। জ্ঞানলাভের কথা দূরে, গ্রন্থের তাৎপর্য প্রকাশের নিমিত্তও আমি সাধুর শরণাগত। তাহাদের কৃপা দৃষ্টি আমার নেত্রাঞ্জন। সেই কৃপায় শ্রীজনার্দনের প্রকাশ। শ্রীজনার্দনের সেবায় গুরুমূর্ত্তিকে নিজস্বভাবে আমার জীবভাব দূর করিয়া দিয়াছেন। ভজনীয়, ভজনকারী ও ভজন এই তিনের চিন্ময়তা দেখাইয়া তিনি জগতের জীবে—জন জনার্দনে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। অভেদ ভাবনায় ভক্তি ক্রমে মধুরতার অনুভব হয়। ভক্তের প্রতি প্রীতিও বৃদ্ধি হয়। ভক্তের প্রেমে ভগবান্ সর্ব্বস্ব দান করেন। এই ভক্তি পরম উপাদেয়, শ্রীগোবিন্দের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীধর স্বয়ং তিনি ভবসাগর পার করেন। প্রশ্ন ওঠে—ভক্তের ভার তিনি গ্রহণ করেন তবে অভক্তেয় ভার কি অপর কেহ বহন করেন? উত্তরে বলা যায়—ভক্তের অহংভাব থাকে না এজন্য ভগবান্ তাহাকে অঙ্গীকার করেন অভক্তের দেহভিমান থাকে বলিয়া তাহার বদ্ধভাব অনুসন্ধান। ভক্ত অভিমান শূন্য। দেহভিমানী ভক্ত নয়। ভক্তকে প্রভু রক্ষা করেন তাহার কেশও কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্তকে নির্ভয় করিয়া ভগবান্ আত্মানন্দ দান করেন। অতএব নিরভিমানে ভক্তি পথে বিচরণকারী বিঘ্নের মাথায় পা রাখিয়া ভগবৎ চরণে মিলিত হয়। রাজা বলেন—ভক্তের গতি শুনিলাম অভক্তের কি গতি? সেই কথা বিচার করিয়া অভক্তের লক্ষণ ও গতি নিরূপণ পূর্ব্বক বিভিন্ন যুগে শ্রীহরির উপাসনা পূজাবিধান পঞ্চমাধ্যায় বর্ণিত হয়। চতুর্থ অধ্যায় অবতার চরিত্র ও পুরুষার্থ জিজ্ঞাসা হইয়াছে। রাজা সেইজন্য অভক্তের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করেন—হে মুনিবর, যাহারা ভগবদ্‌ভজনবিমুখ এরূপ অভক্ত মানুষের গতি কি? যাহারা কামনায় উন্মত্ত, ক্রোধে প্রদীপ্ত, লোভে প্রলুব্ধ, যাহারা সংসার প্রপঞ্চে মগ্নচিত্ত, যাহারা গর্বিত অহংকারীর চূড়ামণি, যাহারা বিকারের প্রবাহে ভাসমান, যাহাদের মনে কেবলই বিকল্প ভাবনা,

শ্রীচমস উবাচ।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥২॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৩॥

যাহারা সদ্‌বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক মহামোহের প্রাবল্যে অবস্থান করিয়া ছলনায় অতিশয় পটু, প্রলোভন যাহাদের অতি প্রবল, যাহারা দিবসের আলো দেখে না, রাত্রির অন্ধকারেই যাহাদের দিবসের ন্যায় গতাগতি এই ভাবে পরমার্থ সম্বন্ধে যাহারা অজ্ঞ অথচ প্রপঞ্চ বিষয়ে যাহারা অতিশয় বিজ্ঞ, যাহারা আত্মহিত জানে না, জ্ঞান বিক্রয় করিয়া যাহারা কামনার পোষণ করে, এইরূপ যাহারা অভক্ত তাহাদের গতি নিশ্চয় পূর্ব্বক আমাকে বলুন।

আপনার মত সদ্‌বুদ্ধি জ্ঞানের সাগর আমার ভাগ্যে লাভ হইয়াছে। অতএব ত্রিলোকের শোধক আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন। রাজা আক্ষেপের সহিত অভক্তের গতিবিন্যাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে চমস মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলেন— ॥১॥

এই জগতের যিনি জনক তিনিই একমাত্র মুখ্য গুরু। যে অবিবেকী তাহাকে ভজন না করে তাহার ত্রিভুবনে আর গতি নাই। মহাপুরুষ হইতে চারিটি আশ্রম ও বর্ণের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি স্থান, হে রাজন্, শুনুন—মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র বর্ণের উৎপত্তি। মূলতঃ তিনটি গুণ হইতে বর্ণের পার্থক্য। তিন গুণে কি ভাবে চারিটি বর্ণ হয় তাহা বলিতেছি। সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজমিশ্র ক্ষত্রিয়, রজোগুণে বৈশ্য ও তমোগুণে শূদ্রের জন্ম। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণকে দ্বিজ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহাদের গায়ত্রী পাঠ বেদাধ্যয়ন আছে। শূদ্র সংস্কার রহিত। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য তিন বর্ণেরই আছে। চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম কেবল ব্রাহ্মণের। গার্হস্থ্য পুরুষের চরণ, ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার হৃদয়, বক্ষঃস্থল বানপ্রস্থ আশ্রম, আর সন্ন্যাস শিরোমণি ॥২॥

আহা, যাহারা ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্মলাভ করিয়াও দেবাধিদেব পরম

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥৪॥

পুরুষের ভজন করে না তাহারা উত্তমদেহ লাভ করিয়াও অধঃপতিত হয়। পূর্ব্ব মীমাংসা উত্তর মীমাংসা দুই শাস্ত্র নানাভাবে স্বরূপ বিচারপর, সেই সকল বিচারে চাতুর্য্য লাভ করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানে অতিশয় উন্মত্ত হওয়ার ফলে কেহকেহ ভজনে বিমুখ হয়। আবার একান্ত অজ্ঞানী স্বপ্নেও পরমার্থ তত্ত্বানুশীলন করে না—তত্ত্ববিচার বিরহিত হইয়া জগন্নাথ-ভজন-বিমুখ হইয়া যায়।

বস্তুর মধুরতা না জানিয়া তিক্তকেই মধুর বলিয়া গ্রহণের ন্যায় হরিভক্তির মধুরতা না জানিয়া সাধারণ জীব বিষয় সুখকেই যথার্থ সুখ বলিয়া প্রলুব্ধ হয়।

বেদশাস্ত্র আলোচনার ফলে যিনি জ্ঞানলাভ করিয়া পাণ্ডিত্যের গর্বে গর্বিত হন এবং ভক্তির পথকে অবহেলা করেন, তাহাকে অতিশয় উন্মাদ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জ্বরের মুখে দুধও তিক্ত বিষের মত অনুভব হয়, সেইরূপ পাণ্ডিত্যের গর্বে হরিভজন বিমুখতা আসে। জ্ঞানাভিমানী হরিভক্তি বিমুখ হইয়া উত্তমবর্ণ হইয়াও অধঃপতিত হয়। বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে কি হয়, শ্রীহরিচরণে বিমুখ হইলে, তাহাহইতে ভগবদ্‌ভজনে প্রেমিক শ্বপচ চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। আমি মুক্ত এই অভিমানে ভগবদ্‌ভজনে যে বিমুখ সে অধঃপতিত হইয়া জন্মমরণ দ্বারে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া ভজন না করিলে বিষম অধোগতি হয়, অজ্ঞানে ডুবিয়া যায়, ইহাই জানিবে ॥৫॥

একই পিতার একটি জ্ঞানী ও একটি অজ্ঞানী পুত্র। জ্ঞানবান পুত্র পিতাকে অপমান করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়, আর অবোধ বালক-পুত্র পিতার কাঁধে চড়ে, পদাঘাতও করে কিন্তু তাহাতে তাহার দোষ ধরা হয় না, জ্ঞানীপুত্রই দোষের ভাগী হয়। জ্ঞানলাভ করিয়াও যে ভজন ত্যাগ করে, সে মহাদোষের ভাগী হয়। সাধুকৃপায় অজ্ঞানী অবোধ জন তরিয়া যায়। সাধুর প্রতি বিশ্বাসেই অজ্ঞানী শুদ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানাভিমানীর উহা ভাব বিরুদ্ধ হয়, এজন্য বুদ্ধিমানকেই দোষ আশ্রয় করে। অজ্ঞানী বিশ্বাস করিয়া সাধুদের বন্দনা করে, জ্ঞানাভিমানী দোষ ধরিয়া নিন্দা করে। ইহাতে সে অত্যন্ত দোষের পাত্র হয়। সাধুকে বিশ্বাস

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ চ হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্ ।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায় বাদিনঃ ॥৫॥

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধামূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ।
বদন্তি চাটুকা মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥৬॥

করিয়া অজ্ঞানার অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, আর জ্ঞানাভিমানার বিকল্প বুদ্ধির উদয়ে কখনও বিশ্বাস লাভ করিতে পারে না, তাহার অধঃপাত হয়। এই প্রকার তর্কাতর্কির ফলে অহংকার বৃদ্ধি হয়। অভিমানের মত এরূপ অমঙ্গল ত্রিভুবনে আর কিছু নয়। অভিমানে পরমেশ্বরানুভব বাধা প্রাপ্ত হয়, দেহবুদ্ধি প্রবল হয় সুর নর সকলের বাধা সৃষ্টি করে। এই হেতু যাহারা জ্ঞানবিহীন এবং জ্ঞানে অভিমানও নাই, তাহারাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে, তাহাদের প্রতি সাধু সজ্জনের কৃপাও হয়। যাহাদের হীন বা নীচ বর্ণ বলা হয়, স্ত্রী শূদ্র অথবা যাহাদের শাস্ত্রাদি শ্রবণ নাই, বেদপাঠ নাই তাহাদেরই সদ্ভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারা কি আর হীন থাকে? তাহারাই সাধুগণের কৃপার পাত্র হইয়া থাকে এবং বিশ্বাসের পূর্ণ অধিকারী হয়। আপনাদের ন্যায় কৃপামূর্ত্তি কৃপালু সাধুসন্তের অনুগ্রহেই তাহারা তরিয়া যায়। অজ্ঞানী এইভাবে উদ্ধার লাভ করে কিন্তু জ্ঞানাভিমান যাহাদের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াছে, ব্রহ্মার পদ পাইলেও তাহাদের উদ্ধার নাই। ইহাদের অবস্থা মুনি বলিতেছেন ॥৪॥

নীচবর্ণজাত অজ্ঞানী লোক সাধুচরণাশ্রয় করিয়া ভক্তিভরে নিজের বিশ্বাস পূর্ণ করিয়া লয় এবং জন্মমরণ সমস্যা মিটাইয়া ফেলে। দ্বিজকুলে জাত ব্যক্তি আমরা স্বভাবতই শ্রীহরিচরণে অধিকারী বেদজ্ঞান সম্পন্ন এই ভাবিয়া জন্মাভিমানে অতিশয় গর্ব অনুভব করে। জন্মজনিত অভিমান, কর্মের অভিমান অল্পবেদের জ্ঞানও তাহাদের বেদাভিমান বৃদ্ধি করে। যাহাদের উপনয়ন হইয়াছে, গায়ত্রী সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে, হরিভজনে রুচি হইয়াছে, শ্রীহরির পদান্তিকে মিলিত এরূপ যে ব্রাহ্মণ তাহারও বেদবাদে জ্ঞানাভিমান উদয় হইলে সেই গর্ব্বে মোহে পতিত হয়। তাহাদের বিশদ বিবরণ বলিতেছি ॥৫॥

কোনো বিধি বিধান মন্ত্র তন্ত্র না মানিয়াও কিছু সংখ্যক লোক অজ্ঞানে মোহিত হইয়াও নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিমান করে। সাপুরের বিদ্যা না

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥৭॥

থাকিলেও সে যেরূপ অনেক বিদ্যার বড়াই করে, ঠিক সেই প্রকার দাম্ভিক নিজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য অনেক ভড়ং করিয়া নিজের আসন ও পূজার দাবী করে। সূর্যকিরণে পতঙ্গের পাখার নানাবর্ণ বৈচিত্র্যের মত স্ফটিকে মাণিক্যের জ্যোতির মত ক্ষণিক পদার্থে অভিমান করিয়া মূর্খ জ্ঞানাভিমান করে। নিজের খুশী মত কাজ করে, কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ সে গ্রহণ করে না, আর লৌকিক প্রতিষ্ঠায় স্ফীত গর্বিত, মিথ্যা মধুর চাটুকারের মত শ্রুতি বাক্যে সুখী হয়। কিন্তু ইহলোক পরলোকে কোনো ভোগে তাহার সুখ হয় না। অপ্সরার ভোগের লালসা স্বর্গসুখের লালসা তাহাকে লুব্ধ করে। ইহাতে সে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সে নিজের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার যাগযজ্ঞের সমারম্ভ করে। মদ্যপ ব্যক্তি যেমন মদিরাকেই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করে, সেইরূপ প্রশংসাপূর্ণ শ্রুতি মধুর কর্ম্মফল প্ররোচক বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, দেহাসক্তি বৃদ্ধি পায়, ভোগ লিপ্সা পিশাচের মত পাইয়া বসে। আত্মার অধঃপতনকেই তখন সে মোহ বশে স্বর্গসুখ বলিয়া অভিহিত করে। ফললিপ্সু মূর্খ জীব এই ভাবে প্রবৃত্ত হয়। অনেক কষ্টে বহুদূর ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াও যেরূপ আপনা আপনি অধঃপতিত হয়, সেইরূপ অনেক প্রকার প্রচেষ্টা দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ করিয়াও জীবের পতন হয়। কর্ম্মের প্রতি যে পরিমাণে অভিনিবেশ হয়, কামনার লোভ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয়, দম্ভ ও ক্রোধ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায় ॥৬॥

তাহার কোনো বিচার বুদ্ধি রহিল না। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ ছাড়িয়া সে রজোগুণে কাম কামনার আকর্ষণে অত্যন্ত কামাসক্ত হইল। তাহার মনে উর্ব্বশীর সঙ্গ, স্বর্গসুখের মধুরতার আকর্ষণে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তন্ত্র মন্ত্রের দ্রব্যাদির শুদ্ধি বা অশুদ্ধির কথা অথবা যাগযজ্ঞের বিধি বিধানে সে আর মনোযোগী হয় না। দুর্বুদ্ধি তাহাকে অবিহিত আচারে প্রবৃত্ত করে। অভিলষিত ফল না পাওয়ার ফলে তাহার ক্রোধ ক্রমে বাড়িয়া যায়। তেঁতুলের সঙ্গে পচা ভাতের জল রান্না করিলে উহা যেরূপ বিস্বাদ হয় সেইরূপ তাহার কর্মফল অত্যন্ত বিস্বাদ হয়। সেই তিক্ত বস্তু যতই পাক করা হয়

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো
গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্ন বিধান দক্ষিণং
বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ ॥৮॥

তাহার তিক্ততা ক্রমে বাড়িয়া যায়, সেইভাবে কামনা বা আশা যত ভঙ্গ হয় ক্রোধও উত্তরোত্তর উগ্রতর হয়। ক্রোধ কাল সাপের মত, বিদ্বেষের নিঃশ্বাস, সর্ব্বদা ফোঁস ফোঁস করে, পূজ্যাপূজ্য বিচার রাখে না, সাধু নিন্দায় উন্মত্ত হয়। ক্রোধের বিক্রমস্থল এই প্রকার, সেখানে তমোগুণের চৌক অর্থাৎ চারি-দিকেই তমোগুণ। দম্ভের বেদী, তার উপর হিংসার স্তম্ভ। সেই স্থানে যাহারা যায়, তাহারা অভিচার ও যোগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বাহিরে নানা প্রকার মুদ্রার অভ্যাস করিয়া পাপ প্রবৃত্তিতে আসক্ত হয় এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়। স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপদে অধর্মের খনি উদ্‌ঘাটিত করে এবং নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহার ফলে পাপাচরণের ফসল করিয়া রাশি রাশি পাপ সংগ্রহ করে। সে অধম উত্তম বিচার না করিয়া সেই পাপরাশিকে অধর্মের তুলাদণ্ডে ওজন করে। অভিমানকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে জ্ঞানের অভিমান বৃদ্ধি পায়, সাধুজনের নিন্দা ও সজ্জনের প্রতি উপহাস করিবার, প্রবৃত্তি হয়, তাহাদের প্রতি দোষারোপ করে। জগতের সর্ব্বত্র দোষ দর্শন করিয়া সে কোনো ব্যক্তির যদি কোনো দোষ না দেখিতেও পায় তথাপি তাহাকে উপহাস করিয়া সুযোগমত তাহারও উপর দোষারোপ করে। অভিমান ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে পাপবুদ্ধির প্রসার হয়—সহজ কথায়ও সাধুনিন্দা তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। যাহারা শ্রীহরিকে প্রিয় বলিয়া জানেন এবং ভক্তি করেন, দুষ্টেরা তাহাদিগকে উপহাস করে এবং গুণেও দোষ দেখে। দ্বিজ হরিনাম করিতেছে তাহাও অধর্ম বলিয়া সে দোষ ধরে। উচ্চস্বরে কেহ নাম কীর্ত্তন করে, তাহাও মহাপাপ বলিয়া সে দোষ ধরে। এইভাবে যে হরিনামের নিন্দা করে, হরিকীর্ত্তনে দোষ ধরে, সে খল প্রকৃতি, সর্ব্বপ্রকারে অপবিত্র দুর্জ্জন বলিয়া জানিবে ॥৭॥

স্ত্রীকামনায় কামুক মৈথুন সুখে পরম সুখ মনে করে। মুগ্ধ মূর্খ অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া স্ত্রীর উপাসককে অতিশয় দুর্বুদ্ধি ভিন্ন আর কি বলা যায়?

ইহারা শব্দ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া নানা প্রকার স্ত্রী বিলাসই যে মনুষ্যজন্মের পরম সিদ্ধি ইহাই প্রচার করে। তাহাদের মতে ভোগ সুখই প্রত্যক্ষ সুখ, ইহা যাহারা ত্যাগ করে তাহারা অতি মূর্খ, বৈরাগ্য করিয়া সেই মূঢ়গণ জীবনে ঠকিয়া যায়। গৃহ ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যের উদ্ভট ভাবনায় নিজ কর্ম্ম দোষে দৈব কর্তৃক এরূপ লোক সর্ব্বহারার দুঃখ লাভ করে। গৃহস্থাশ্রমে কি দেবতা নাই ? কি জন্য বনে যাইতে হইবে ? বনে গেলেই যদি নিস্তার হইত তবে বনের হরিণ, শশক ব্যাঘ্র প্রভৃতি বনবাসী জন্তুও তরিয়া যাইত। আসন করিয়া ধ্যান করিলেই যদি দেবতার সাক্ষাৎ হইত তাহা হইলে বক শ্রেণী অনায়াসে অল্প সময়ে উদ্ধার হইয়া যাইত। একান্ত নির্জ্জনে থাকিয়া যদি শ্রীহরিদর্শন হইত তাহা হইলে গৃহের গর্ত্তে নির্জ্জনে অবস্থানকারী ইঁদুর আর চিঁ চিঁ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত না, সে-ও উদ্ধার হইয়া যাইত। দেবতা সর্ব্বজ্ঞ তাই তিনি পশুপক্ষী সকলকেই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেন। মানুষ পরমেশ্বরের সৃষ্টিকে বন্ধন মনে করিয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করিয়াছে। আনন্দের একটি প্রধান আয়তন জননেন্দ্রিয়। এই বেদবাক্য না মানিয়া অজ্ঞানী মানুষ ত্যাগের কথা বলিয়াছে। মৈথুনই পরম সুখ, উহা দেবতারই সৃষ্টি, বাতরাগ মানুষ উহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। পাগলেরাই কেবল সন্ন্যাসী হয়, আর তাহার ফলও পায়, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলে স্ত্রীর অভিশাপ লাগে, আর ভিক্ষার অন্নে তাহার উদর পূর্ত্তিও হয় না, হাতে দণ্ড ধারণ করে, মস্তক মুণ্ডন করে, আর গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে—স্ত্রীর অভিশাপে তাহার এত সব বিড়ম্বনা সহিতে হয়। দুহাতে মাটি লইয়া অনেক করিয়া শৌচ মার্জ্জনা করিতে হয় এবং তিন বেলা জলে ডুবিয়া স্নান করিতে হয়। স্ত্রীর অভিশাপ তাহাকে এই প্রকার শিক্ষা দেয়। পরিধানে কৌপীন, হাতে ভিক্ষার ঝুলি তাহার উপর দণ্ড হাতে স্ত্রীর অভিশাপে ভিক্ষা করিতে থাকে। স্ত্রী সুখের মত সুখ নাই, স্ত্রী ত্যাগের মত পাতক নাই—ইহা না বুঝিয়া নির্ব্বোধ লোক সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে। স্ত্রীসঙ্গ ভিন্ন অন্য সুখ উদ্বেগ, যাহাদের ভাগ্য ভাল তাহারাই স্ত্রীসঙ্গের সুখলাভ করে। অভিলষিত সুখ ভোগেই দেবতা প্রসন্ন হন, আর সুখত্যাগ করিয়া দুঃখভাগী হইলে দেবতা

ক্ষুব্ধ হন। স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগেই মোক্ষলাভ হয়, এরূপ কথা অমূলক। বেদান্ত-বাক্যে মুগ্ধ লোক নিরর্থক বৈরাগ্য পথে ধাবিত হয়।

এই প্রকার পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া ইহারা বলে—গোবিন্দ আমাদের কোনোদিন ত্যাগবুদ্ধি দিও না, কেননা ত্যাগ করার ফল ভিক্ষা করা, তাহা হইতে মরাও ভাল। মুক্তিকে কে দেখিয়াছে? দুঃখ ভোগটাই মানুষ দেখে। মুক্তি যদি দেখা যাইত তাহা হইলে উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইত। এই বলিয়া বৈরাগ্য ও ত্যাগকে তাহারা অলীক বলিয়াই বর্ণনা করে। এই ভাবে সর্ব্বদা ত্যাগের নিন্দা করিয়া ইহারা ভোগ লাভের নিমিত্তই সকলকে আশীর্ব্বাদ করে।

স্ত্রী-সুখ শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহারা স্ত্রৈণ হইয়া পড়ে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন অবস্থায়ই তাহারা স্ত্রী-চিন্তা করে।

সদ্‌গুরুর ভজন তাহাদের নাই। বৃদ্ধের পূজা নাই। অতিথির অন্ন তাহাদের কাছে নাই। সর্বস্ব স্ত্রীর অধীন। কোনো মতে স্ত্রীর দুঃখ না হয়, এই চিন্তায় সে কখনও স্ত্রীর বাক্য অন্যথা করে না। নিত্য স্ত্রীর অনুসন্ধান—স্ত্রীর উপাসনা। কুল দেবতা, কুল বৃত্তি, পিতামাতা গুরুভক্তি কিছু আর তার থাকে না। সকল সম্পৎ স্ত্রীর হাতে, নিজের সর্বস্ব তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহারই জন্য ধন উপার্জ্জন করে এবং দাম্ভিক ভাবে উদরান্নের সংগ্রহেই জীবন যাপন করে।

যজ্ঞদ্বারা সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়, এই বুদ্ধি তাহার মোটেও থাকে না, যদিও যজ্ঞে প্রবৃত্তি দেখা যায়—উহাতে হাতে যজ্ঞের রক্ষাসূত্র বাঁধিব, তাহাতে লোক সমাজে আমার প্রতিষ্ঠালাভ হইবে—লোকের মধ্যে অগ্র পূজা পাইব এরূপ দুর্বাসনা তাহার হৃদয়ে থাকে। এই সকল সঙ্কল্প করিয়া যাগযজ্ঞে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে অর্থ ব্যয় করে। বিধিবিধান মানে না, মন্ত্রোচ্চারণে আদর থাকে না—অন্ন সম্পাদন না করিয়াই অপক শস্যদ্বারা হবনে প্রবৃত্ত হয়। আমি পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি বলিয়া লোকের মধ্যে সে প্রচার করে এবং ইহাদ্বারা সে জীবিকার্জনেরও সুযোগ করিয়া লয়। নিজে বিধিবিধান জানে না বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসাও করে না পরন্তু দম্ভের সহিত অবৈধ পশু হননেও প্রবৃত্ত হয়। যজ্ঞের শেষ পুরোডাশ বা পশুমাংস প্রভৃতি ভোজন করিয়া উল্লাসের সহিত মনে করে আমি পবিত্র হইলাম, আমার সকল দোষ দূর হইয়া গেল।

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥৯॥

দেবতার আবাহন বিসর্জন প্রভৃতি তাহার সমীপে গৌণ। তাহাদের পূজা দক্ষিণাও সে বিবেচনা করে না। জ্ঞানের গর্বে সে সৎ পাত্রের অবজ্ঞা ও হেলা করে। কেবল উপজীবিকার জন্যই পশুহিংসা করিয়া সে আমি যাজ্ঞিক যজ্ঞকর্তা এই ভাবে প্রচার করে। কেবল জীবিকা নির্বাহের দুরাশায় মন অবৈধ হিংসায় কখনো কুণ্ঠিত হয় না ॥৮॥

এই প্রকার অবস্থায় সম্পত্তি লাভে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়, তাহার ফলে মদমত্ত হস্তীর মত সে চলে। নির্ধনের ধনপ্রাপ্তিতে যেরূপ অভিমান বৃদ্ধি হয় অথবা বানর মদিরা পাত্র পাইলে যেমন প্রমত্ত, সেই অবস্থায় সে দিন যাপন করে। সে মনে করে আমার মত আর জ্ঞানী কে আছে? এই সময় দৈবযোগে স্বর্ণ রত্ন মণিমুক্তা গজ অশ্ব যানবাহনের মালিক হইয়া সে ইন্দ্রের অধিক বলিয়া মনে করে। সে মনে ভাবে আমি যাগ যজ্ঞ করি এই আশায় ইন্দ্রাদি দেবতারাও আমার দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করে। তাহাদের ক্ষমতা হইতেও আমার ক্ষমতা বেশী।

শিষ্য বন্ধু বান্ধব আর যত সজ্জন বা পরিবারের যত লোক কেহই আমার মত সমর্থ নয়। কণ্টক বনের মত শিষ্যমণ্ডলীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সে ধনের গর্বে ধ্রুব মণ্ডলকেও পদতলে বলিয়া মনে করে।

বৃশ্চিকের বিষ অল্প কিন্তু বেদনাজ্বালা খুব বেশী। অজ্ঞানীরও বিদ্যা অল্প কিন্তু নিজের যোগ্যতার গর্ব অনেকখানি। সে অজ্ঞানের মধ্যেই জ্ঞানের গর্ব করে। জোনাকী অন্ধকারে নিজের আলোকের গর্ব করে। অল্প জানিয়াও দেবগুরু বৃহস্পতিকে গণনা করে না। ক্ষুদ্র মাছি গরুড়ের পৃষ্ঠে পা রাখিয়া বসে। দুচার পয়সা দান করিয়া খুব উদার দাতার অভিমান করে, যেন বলি মহারাজ। দাতা কর্ণকেও অজ্ঞানবশে সে অতি অল্পদাতা বলিয়া মনে করে। আমি নিজের অর্জিত বিত্ত সৎপাত্রে দান করি। কর্ণ প্রতিদিন এক ভার ৮০০০ তোলা স্বর্ণ লাভ করিতেন। তাই তিনি দাতা

কর্ণ হইয়াছিলেন। আমিও আমার কষ্ট উপার্জিত ধন দান করি। এই দান তো কম নয়, অতএব কর্ণের দানের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার কিছু বিশেষত্ব বলা যায় না। অজ্ঞানী অপরের অপকারেই নিরত থাকে, কখনো কাহারও কিছু উপকার করিলে সেই অভিমানে আত্মপ্রশংসায় সবটুকু পুণ্য ক্ষয় করে। এই ভাবে সে নিজের দাতৃত্ব প্রভৃতির গর্বে মুখর হইয়া মেঘের মত গর্জন করে। নিজের সৌন্দর্যের বড়াই করিয়া সে মদনকেও হারাইয়া দেয়। দেখ, আমার অঙ্গে অঙ্গে কত সৌন্দর্য—আমার সঙ্গে তুলনা করিবার মত আরতো কাহাকেও দেখা যায় না—এ ভাবের কথা সে বলে। সেই ব্যক্তি নিজেকে রাজহংসের অধিক সুন্দর মনে করে। সে গীতা হইতেও নিজেকে সুন্দর মনে করে। সবুজ বন জঙ্গল দেখিতে পাইলে মহিষ যেরূপ লোভে উন্মাদ হয়, সেইরূপ নিজের সৌন্দর্যে সে প্রমত্ত হয়। কোনো প্রকারে কিছু বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিলে সে নিজের তুলনায় পরশুরাম, শ্রীরাম বা বলরাম—তিন রামের পরাক্রমকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে করে। গোহরণ পর্বাধ্যায়ে উত্তরের শৌর্য প্রদর্শন যেরূপ একান্ত তুচ্ছ বিষয়, নির্জন বনে বনশূকরী যেরূপ আর কাহাকেও গণনার মধ্যে আনে না, নিজের মনে গর্জন করিয়া চলে এবং সামর্থ্যের গর্ব করে—সেই প্রকার তাহার অহংকার। সে অজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া ভাবে। নিজেকে কর্মকাণ্ডী যাজ্ঞিক বলিয়া অভিমান করে ও অনুগত লোকের উপর প্রভুত্ব করে। ধনী লোকের নিকটেও নিজের যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বড়াই করিয়া বলিয়া বেড়ায়। সংসারে যজ্ঞাদির সহায়তায় সমৃদ্ধির কথা যুক্তি দেখাইয়া সে বর্ণনা করে। এই মিথ্যা কর্মাচারের জ্ঞান বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাতৃত্ব গর্বে তাহার মন ভরিয়া রাখে। পেঁচা দিবালোকে ভীত, অন্ধকারেই তাহার ডাকাডাকি, তেমনই অজ্ঞলোকের সমীপেই তাহার আত্মপ্রশংসা খ্যাপন চলিতে থাকে।

ইহার উপর নানাপ্রকার দম্ভের উপাধিতে সে অতি গর্বিত উন্মত্ত হইয়া সদ্‌বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে এবং শ্রীহরিহর সহ সাধুদের নিন্দা করে। কামলা রোগ হইলে দৃষ্টিদোষে সব কিছুই পীতবর্ণ দেখা যায়। সেই ভাবে নিন্দা উপাধিযুক্ত হওয়ার ফলে অতিশয় গর্বিত ব্যক্তি প্রজ্ঞাময় নির্দোষকেও দোষ দেয় এবং শুদ্ধকেও মলিন ভাবে। যোগীশ্বরকে শ্রীশংকরের মত ব্যক্তিকেও সে নিন্দিত বলিয়া মনে করে।

ক্রোধে দাক্ষায়নী অগ্নিতে ঝাঁপ দিলেন, ফলে যাজ্ঞিক দক্ষ প্রজাপতির শিরচ্ছেদ করা হইল। শংকরতো মোহিনীকে পাইবার জন্য নগ্ন হইয়াই তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। বিষ্ণুতো চিরদিনের কপট। কাহাকেও তো শুদ্ধ দেখা যায় না। বৃন্দা ছিল পতিব্রতা, তাহাকে ব্যভিচারিণী করা হইল। ব্যভিচারী বিষ্ণু বৃন্দার কুঞ্জ বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করে। আর সেখানে জটাধারী সকল লোক আসিয়া মিলিত হয়। এই সকল লোককেই বা কি প্রকারে সাধু বলা যায়? সাধু মনে করিয়াছিলাম সনৎকুমার প্রভৃতিকে। উঁহাদেরও দেখি বৈকুণ্ঠদ্বারে, ভয়ঙ্কর ক্রোধ। দু একটা কথায় তাহারাও হরির কিংকর বীর জয় বিজয়কে অভিশাপ দিলেন। চতুরানন ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম কিন্তু উমাশঙ্করের মিলন দর্শনে তাহারও ধৈর্যচ্যুতি হইল। তিনিও হীন এবং নির্লজ্জ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। নারদ ব্রহ্মচারী কিন্তু তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্ত্রীলাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

* * * *

যে যুধিষ্ঠিরকে মূর্ত্তিমান ধর্ম বলা হয় তাহার রূপটি পরিপূর্ণ অধর্ম ছাড়া কি বলা যায়? কারণ বংশের সকলের বিনাশ মূলক যুদ্ধের সমর্থন সে করিয়াছে, অতএব ধর্ম হইয়াও সে পূর্ণ অধর্ম। ব্যাস জারজ সন্তান, তাহার কর্মেই পরাশর হীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরের দ্বেষ ও মাৎসর্যের জন্য নিন্দিত। দুর্বাসাকে সাধু বলিবে? তিনিতো অম্বরীষকে ছলনা করিতে গিয়া সাধুতার বেশ পরিচয় দিয়াছেন।

প্রহ্লাদ পিতৃদ্রোহী, তাহাকে সাধু বলিব কি প্রকারে? এই প্রকারে পুরাণের ব্যাখ্যা করিলে যাহাদের সাধু বলা হয় তাহাদিগকে আর সাধু বলিতে ইচ্ছা হয় না। মূলত বর্ত্তমানকাল পর্যন্ততো আমি কাহাকেও সাধু দেখিতে পাই না।

দেখা যায়, কোনো এক অদ্ভুত রকমের দল দেখিয়া একের পর এক তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আবার কোনো দল উদরান্ন সংগ্রহের জন্য নানারূপ চাতুর্যপূর্ণ বাক্যবিন্যাস করে, আবার কেহ আসন মুদ্রার অনুশীলন করে, কেহ বা বক ধ্যানী হইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ মনে প্রাণে সাধু মোটে নাই বলা যায়।

সর্ব্বেষু শশ্বৎ তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া ॥১০॥

খল প্রকৃতির ব্যক্তি নিজের বিবেচনায় উল্লিখিত দোষারোপ করিয়া সাধু নিন্দা করে। প্রকৃত সাধু যে আছে, তাহা কিছুতেই সে মনে ভাবে না। নাক কাটা লোকের হাতে দর্পণ দিলে সে যেমন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়, সাধুর নাম করিলেও তাহার সেইরূপ জ্বালার উদয় হয়। পরমেশ্বরের সত্তাই সে স্বীকার করে না। ঈশ্বর যদি কেহ থাকে—সে কিরূপ ?

চমস মুনি বলেন, হে, রাজন্, সেই ঈশ্বর কিরূপ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥৯॥

যিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান। কখনও যাহাকে ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না। যাহার সাম্য ভাবের বিচ্যুতি নাই। যিনি কখনো বেশী আর কখনো কম হন না। যিনি সকলের মধ্যেই আছেন অথচ কাহারও ধর্ম্ম যাহাতে সংক্রান্ত হয় না। দৃষ্টান্ত, জল পদ্ম পত্রে দাঁড়াইতে পারে না, জলে থাকিয়াও পদ্ম পত্র জল বুদ্‌বুদের সঙ্গদ্বারা অস্পৃষ্ট। সেই ভাবে তিনি সকল জীবের মধ্যে থাকিয়াও কোনো জৈব ধর্ম্মে লিপ্ত নন—দৃষ্টান্ত, অলিপ্ত আকাশ। তাহার মত এরূপ অলিপ্ত আর কেহ নয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া নিজের স্বরূপের অন্তর্গত করিয়া রাখিয়াও তিনি কর্ত্তৃত্বের অভিমান করেন না—সর্ব্বতোভাবে অলিপ্ত। এই জন্য বেদ চিরদিন তাহাকে অন্তার্যমী আখ্যা দিয়াছে। তিনি সকলের হৃদয় গ্রামে চেতনানুসারে দর্শনীয় হইয়া থাকেন। নিরন্তর পরমেশ্বরের ধ্যান করিলে, তাহার নাম মুখে উচ্চারণ অথবা গান করিলে অখণ্ড ধারায় মনের অভিলাষ বর্ষণ হয়। পরমেশ্বরের নাম যাহারা গান করেন তাহাদের সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। তিনি দৃষ্টি করিলে তাঁহার প্রসন্নতায় স্বানন্দ সৃষ্টি বর্ষণ হয়। তিনি এই প্রকার সুখদাতা, আবার তিনিই শাসক। তিনিই অন্তক যমেরও নিয়ন্তা। তাহার ভয়ে অকালে কালও কিছু করিতে পারে না। তাহার ভয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিত

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ—
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥১১॥

চলে, আকাশে বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহারই ভয়ে পৃথিবী জলের মধ্যে থাকিয়াও ডুবিয়া যায় না। তাহার আজ্ঞায় সূর্য দিনের আলো দেয়, সমুদ্র সীমা লঙ্ঘন করে না। বেদ সর্ব্বদা তাহার মহিমা গান করে, উপনিষদ ব্যাখ্যা করে তাহার পবিত্র কীর্তি, দুর্বুদ্ধি লোক কানে শুনিতে চাহে না। তাহার নাম স্মরণ মাত্র সকল দোষ দূর হইয়া যায়। কৃতান্ত তাহার চরণ বন্দনা করে। তিনি ভক্তের জন্মমরণ ভয় দূর করেন। তাঁহার মহিমা শ্রবণে মনের সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায় এবং পরব্রহ্মের স্বরূপতা লাভ হয়।

যে পবিত্র মূর্ত্তির কথা বেদ সর্ব্বদা বর্ণনা করে দুর্ভাগা লোক তাহা শ্রবণ না করিয়া কেবল মনের কামনার কথাই বলে। গৃহদ্বন্দ্বে ব্যস্ত থাকিলে যেমন ভেরীর ধ্বনি কানে পৌঁছায় না সেইরূপ বিষয় ব্যাপারের কথায় প্রমত্ত থাকার ফলে নির্ব্বোধ লোকের কানে শ্রীহরির গুণের কথা লাগে না। ইহার ফলে অতিশয় দুর্ভাগা অবিনীত মুর্খ লোক বিষয়ে অন্ধ হইয়া ধন সম্পদে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে ॥১০॥

বিষয় ভোগের বাসনার জন্য বেদের কোনো প্রেরণা বা উপদেশের প্রয়োজন পড়ে না, কেননা বিষয় বাসনা সকল লোকেরই স্বাভাবিক ভাবেই আছে। মাংস খাওয়া, মদ্যপান করা, স্ত্রীবিলাস প্রভৃতির জন্য সকল মানুষেরই সর্ব্বদা তীব্র বাসনা আছে। তাহার মধ্যে কোন্‌টি সেবনীয় কোনটি নয়, তাহা বিবেচনা করারও অবসর পাওয়া যায় না। বিষয় ভোগে আসক্তি হইলে উহা সর্ব্ব প্রকার অনর্থই করে। তুলায় আগুন লাগিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিও সবটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না—সেই প্রকার বিষয়ীর মনে সহসা বিবেকের উদয় হয় না। বড়িশের টোপে লালসা বশতঃ মৎস্য নিজের মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যায়। এক মুষ্টি ছোলার লোভে বানর ব্যাধের ফাঁদে বাঁধা পড়ে। দুধ পাইলেই হইল, ব্রাহ্মণের ঘর কি অস্পৃশ্যের ঘর তাহা মার্জ্জার কখনো বিচার

করে না। সেইরূপ বিষয় ভোগে উন্মাদ সেবনীয় বা সেবার অযোগ্য বস্তু সম্বন্ধে এই বিচার সে করিতে পারে না। এই বিষয় বাসনায় যোনি সংকর ঘটিবে বলিয়াই বেদ বর্ণাশ্রম বিভাগ প্রভৃতি করিয়া দিয়াছে।

অখণ্ড পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা ভাগ করা হইয়াছে। অনাবৃত মেঘের জল চারিদিকেই বর্ষিত হয়, প্রয়োজন বোধে উহা বৃহৎ জলাধারে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং উহা হইতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন খাতে পানীয়রূপে প্রবাহিত করা হয়। একই নাদের আকারে বায়ু বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে নানা প্রকার মধুর ধ্বনি সৃষ্টি করে। সেই প্রকার উচ্ছৃঙ্খল বিষয়ভোগ সম্বন্ধেও বেদ নানা প্রকার নিয়ম করিয়া ভোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেই নিয়মনের বেদাজ্ঞা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষ সংসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বিবাহ বিধানের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন জাতি বর্ণের স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইলে যৌন সুখের কিছু অন্যথা হইবে না কিন্তু উহাতে শুদ্ধ সংস্কার বিনষ্ট হইয়া শাস্ত্রানুসারে বর্ণসংকর হইবে। এইটি নিরোধের জন্যই বিবাহ ব্যবস্থা। সগোত্রে বিবাহ হইবে না। অন্য গোত্রে বিবাহ হওয়া প্রয়োজন, তাহাতেও আবার পিতা হইতে সপ্তম এবং মাতা হইতে পঞ্চম পুরুষে বিবাহ নিষিদ্ধ। তিন বেদ তিন বর্ণ মিশ্রণ না করিয়া যথাবিধি বেদ সমতা রক্ষা করিয়া স-বর্ণে বিবাহ বন্ধন স্বীকার করিবে বেদের এই বিধান। রজো দর্শনের পূর্বেই কন্যার পিতার সমীপে প্রস্তাব করিয়া বিধি বিধানে বিবাহের লগ্ন স্থির করা কর্তব্য। ধর্ম অর্থ ও কামাচরণ অপর কাহারও সহিত চলিবে না এরূপ শপথ গ্রহণ পূর্বক যথাবিধানে স্ত্রী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অগ্নিকে সাক্ষ্য রাখিয়া বরবধূর পাণিগ্রহণ হইবে। পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবে। নিজ পত্নীর প্রতিই পুরুষ অনুরক্ত থাকিবে, ইহাই বেদের বিধান। বেদ এইভাবে অপর সকল স্ত্রী সম্বন্ধে সাবধান থাকিয়া কেবল নিজের বিবাহিত পত্নীতে উপগত হইবার বিধান দিয়াছে। সে বিষয়েও দিবা ভাগে, রাত্রির প্রথম প্রহরে বা রাত্রি শেষে, স্ত্রীসঙ্গ ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেবল সন্তান লাভের নিমিত্ত ঋতুকালে স্ত্রীসেবন কর্তব্য। যে পুরুষ এই সকল নিয়ম মানিয়া চলে সে-ই পূর্ণ ব্রহ্মচারী। বেদ এই ভোগ ও নিবৃত্তির নিমিত্তই

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য
মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্ ॥১২॥

বিধান করিয়াছেন। পুত্ররূপে আত্মাকেই জানিবে। অতএব পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে আর স্ত্রীসঙ্গ না করাই বেদের উদ্দেশ্য। বেদ ধীরে ধীরে বিষয় ভোগ ত্যাগের উপদেশই করেছেন। আমিষ সেবন মাংসাহার সম্বন্ধেও সেই কথা। মাংস খাওয়ার লোভে বা স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় যাহারা পশু হিংসা করে তাহাদের অধঃপতন হয়। নিষ্কাম কর্ম্মী পশুহিংসা করিলে আর নিষ্কাম থাকে না। বেদের নিয়ম প্রধানতঃ সর্ব্বধর্ম্মের নীতি অহিংসা। যথেচ্ছ প্রতিদিন মাংস আহার না করিবার জন্যই নিয়মিত যজ্ঞাদিতে পুরোডাশ খাওয়ার বিধান দিয়া বেদ নিত্য মাংসাহারকে পরিমিত করিয়া বারণ করেছেন। সৌত্রামণি যাগ করিয়া তাহাতে মদ্যপানের ব্যবস্থা দিয়াছে, এরূপ যাহারা বলে, বেদের তাৎপর্য্য তাহাদের বোধের বিষয় হয় নাই বলিতে হয়। বেদ মদ্যপান ব্যবস্থা করিয়াছে এ কথা বলিলে জিহ্বা খসিয়া পড়িবে। মানুষ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া বেদকে বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে। সৌত্রামণি যজ্ঞের পর নিজে মদ খাইবে এরূপ কথা বেদ বলেন নাই, কেবল যজ্ঞশেষের গন্ধ লইবে এই ব্যবস্থা, গলায় ঢালিবে এরূপ কথা মিথ্যা। বিষয়ভোগের এই ত্রিবিধ প্রকার-মৈথুন, মাংসাহার ও সুরা-পান। ইহাদের নিবৃত্তির নিমিত্তই বেদের নির্দ্দেশ। নিবৃত্তির নিমিত্ত যে বিধান উহাকে বিষয়াসক্তিপর ব্যাখ্যা করা বেদের তাৎপর্য্য নয়। নিজের অর্থব্যয়ে বিবাহ করিবে, যজ্ঞ করিবে, মদ্য মাংস ও মৈথুন আসক্ত হইবে ইহা বেদের নির্দ্দেশ হইতে পারে না ॥১১॥

জ্ঞানাভিমানী না কোনো ভগবৎকথা শ্রবণ করে, না কোনো পরমার্থ লাভের নিমিত্ত অর্থ বিনিয়োগ করে। কেবল বিষয়ভোগের চিন্তায় কামনা পূরণের নিমিত্তই তাহার অর্থ ব্যয় করে, এই ভাবেই সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করে। যে ধন ব্যয় করিয়া সে ধর্মার্জনের সুযোগ পাইয়াছিল তাহা সে অবোধের মত হারাইয়া ফেলে। বীজের মধ্যে বৃক্ষ ও তাহার ফল সূক্ষ্মভাবে

থাকে, চন্দনে গন্ধ লুকাইয়া থাকে, জলের মধ্যেই সকল রসের স্বাদ থাকে, দেহের মধ্যেই কর্ম-প্রেরণা, রূপের মধ্যেই নাম—তেমনি ধনের মধ্যে উত্তম উত্তম ধর্ম্ম লুকাইয়া থাকে। একাদশী ব্রত যোগে রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক নৃত্যগীত করিলে ভগবানের তুষ্টি হয়—এই মূল্যে ভক্তের সমীপে ভগবান্ আত্মবিক্রয় করেন। সেই ভাবে ধনকেও পরম ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্যয় করিলে জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানও লাভ করিতে পারে। দিনে দিনে যেমন চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি হয়, জীবনের সঙ্গে ক্রমে আসক্তি বাড়িয়া যায়। সেই প্রকার ধর্ম্মশীল মানুষের গৃহেও দিনের পর দিন উজ্জ্বল ধর্ম্মের দর্শন হয়। ধর্ম্ম আসিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান হইতে সমাধান ও সর্ব্বপ্রকার পূর্ণ শান্তি লাভ হয়। যে ধনদ্বারা এই প্রকার ফলোদয় হয় উহা বিষয় ভোগের নিমিত্ত যে ব্যয় করে তাহাকে মূর্খ ভিন্ন আর কি বলা যায়? সে দেহলোভে উন্মাদ হইয়া নিজের মৃত্যুকে ভুলিয়া গিয়াছে। যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে সেখানে কোনো জিনিষ রাখিতে যাওয়া, মরণমুখী দেহকে প্রসাধিত করা মূর্খের কার্য্য। বেদ ইহা বলিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে না। দেহের জন্ম হইতেই দিনের পর দিন দেহকে কাল গ্রাস করিতেছে—নিত্যই তাহার নতুন নতুন মৃত্যু হইতেছে। মানুষ দেহের মমতায় লোভে সেই দুরন্ত বীর্য্য মৃত্যুকে ভুলিয়া আছে। চখের সামনেই দেখা যায় কাল বাল্যকে গ্রাস করে আবার তারুণ্যদশাকেও কাল ক্ষয় করিয়া কম্পিতদেহ বার্ধক্যকে আনয়ন করে। কাল এরূপ দুর্ব্বর্ষ, ব্রহ্মাদি দেবতাগণও ইহার রহস্য জানেন না। এই কালের এক চপেটাঘাতে অমরগণেরও মৃত্যু আসিয়া পড়ে। মূর্খলোকই মাত্র নিজের জীবনকে অক্ষয় অমর বলিয়া ভাবনা করে। দেহের মূলই অনিত্য, অতএব সেই দেহের ভোগ আর শাশ্বত হইবে কিরূপে? বিষয় ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রীলোভে ভ্রান্তজীব মুগ্ধ হইয়া থাকে। জাগতিক ভোগ এইরূপ নশ্বর আবার উহার পরেও স্বর্গভোগের জন্য মানুষ যাগ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। সুখের জন্য পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষ ইহলোক ও স্বর্গসুখের আসক্তিতে অধঃপতিত হয়। স্ত্রী, মাংস ও মদ্যপান ভোগ বেদের অনুমোদিত মূর্খেরা এরূপ ধারণা করিয়া বেদবিধান হইতে বঞ্চিত হয় ।১২।

যদ্ ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া
তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥১৩॥

বেদবিহিত কর্ম্মাচরণে কখনও পতন হয় না, সেই বিধান লঙ্ঘন করিলে জ্ঞানবানেরও পতন হয়। বেদের স্তুতিবাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে সুখবিলাসের লালসায় যজ্ঞের নিমিত্ত পশুহিংসা করে। বেদের উপদেশ পশু "আলভন"—এই আলভন কথার অর্থ পশু হনন বলিয়া সকাম ব্যক্তিগণ বেদবিধান বলে, নিষ্কাম ব্যক্তিগণ আলভন কথার অর্থ পশুহনন নয়, ইহাই বলেন। পশুটিকে হত্যা না করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে তাহার অঙ্গ স্পর্শ, ইহারই নাম আলভন। এইরূপ যজ্ঞ নিষ্কাম। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞস্থলে শুনঃ-শেফ পশু প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে না দিয়াই বেদোক্তবিধানে যজ্ঞসিদ্ধি করেন। বেদোক্ত মন্ত্রভাগের তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আর শুনঃশেফও মুক্ত হইয়াছিলেন। এই কথা ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। অতএব যজ্ঞে পশুহনন করিতেই হইবে এরূপ বিধান হইতে পারে না—হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞের নিমিত্ত পশুঘাত বন্ধ হইয়াছিল ইহাই প্রমাণ। তবে মীমাংসকদের মতে দেবতার উদ্দেশ্যে যে পশুঘাত, যাহার নাম "আলভন" উহা স্বর্গফলের নিমিত্ত আবশ্যক। যাহারা কেবল মাংস খাওয়ার জন্য পশু হত্যা করে তাহারা হিংসার দোষে দোষী হয়, একথা মীমাংসকগণও বলেন। দেবতার উদ্দেশ্যে পশু হনন তাহাতে স্বর্গভোগ হয়, সেই স্বর্গভোগ ভোগে ক্ষয় হয়। যজ্ঞ কর্ম্মে হিংসা আছে। সৌত্রামণি যজ্ঞে পুরোডাশের গন্ধ নিলেই হয়, উহাতেও সুরাপানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু বেদবিধান সেরূপ নয়। এই ভাবে যাহাতে পশুহত্যা উহা পূর্ণ দোষযুক্ত কর্ম্ম। তাহা হইতেই যাজ্ঞিকগণের অধঃপতন হয়।

পাণিগ্রহণ বিধান স্বদারে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত। কিন্তু রতির নিমিত্ত অনিয়মিত স্ত্রীসম্ভোগের বিধান বেদ দেয় নাই। মদ্য মাংস ও স্ত্রী-ভোগ স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নয়—বেদ ব্যবস্থা দিয়াছেন এইগুলির ভোগে

যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥১৪॥

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্ ।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১৫॥

যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্ ।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥১৬॥

ত্যাগেরই উদ্দেশ্য। এই শুদ্ধ ধর্ম্মকে না জানিয়া যজ্ঞের ছলে কাম্যকর্ম্ম প্রবর্ত্তনে মূর্খলোক ভোগের আনন্দে মগ্ন থাকে ॥১৩॥

শুদ্ধ বেদবিধানে অজ্ঞ, অহংকারে প্রমত্ত, উদ্ধত নিজেকে পণ্ডিত মনে করিয়া অবিধি পূর্ব্বক পশু হত্যায় প্রবৃত্ত মানুষ অভিচার কর্ম্মের প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার ভোগলাভ করা সম্ভব এই বিশ্বাসে স্বেচ্ছায় পশুহত্যা করে। অবৈধ পশু-হত্যাকারী যাজ্ঞিকগণের মৃত্যুর পর সেই নিহত পশুগুলি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র লইয়া যাজ্ঞিকগণকে হত্যা করিতে অগ্রসর হয়। এই ভাবে নিহত যে সকল পশুর মাংস তাহারা ভোজন করে সেই সকল পশু সেই যাজ্ঞিকগণের মাংস ভোজন করে। বিষ খাইলে প্রাণ নাশ হয়, যাজ্ঞিকগণের অবস্থাও সেইরূপই ॥১৪॥

পরমাত্মা শ্রীহরি সর্ব্ব জীব শরীরে অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করেন। অপরকে হিংসা করিলে নিজের আত্মাকেই হিংসা করা হয়। অপরকে নিহত করিলে উহা আত্মহত্যার সমান। সপরিবার সেই ব্যক্তি রৌরব নরকে অধঃপতিত হয় ॥১৫॥

জ্ঞানবান্ নিজেই মুক্ত হয়। অজ্ঞানী জ্ঞানবানের শরণ গ্রহণ করিয়া সেই জ্ঞানীর বাক্য উপদেশে বিশ্বাসের ফলে উদ্ধার হয়! যে অজ্ঞানী বা জ্ঞানী নয়, যাহার কেবল জ্ঞানী বলিয়া অভিমান, যাহার কেবল বিষয় ভোগের লালসা, তাহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে। যে অর্থ ও কাম সিদ্ধির নিমিত্ত অভিচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই মারণ উচ্চাটনাদি কর্ম্ম তাহার নিজেরই অধঃপতনের জন্য হয়। দেহের সুখের জন্য যে অভিচার কর্ম্ম করে সে নিজেই নিজের মৃত্যু ঘটায়। যে শাখায় বসিয়া আছে সেই শাখাই যদি নিজে হাতে

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধস্ত মনোরথাঃ ॥১৭॥

হিত্বা ত্যায়াসরচিতা গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥১৮॥

কাটিয়া ফেলে তাহা হইলে অধঃপতন নিশ্চিত সেইরূপ কাম্যকর্ম্মের আসক্তিতে মানুষের অধঃপতন অনিবার্য হয় ॥১৬॥

কামুক, ক্রোধী, অদ্ভূত ক্রূরকর্ম্মা এবং অশান্ত প্রকৃতির লোক নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ করিয়া থাকে। নিজেরা অবৈধ কর্ম্ম করিয়া উহাই বিধি বলিয়া বলে এবং অজ্ঞানীর কর্ম্ম করিয়া উহা জ্ঞানীর কর্ম্ম বলিয়া বুঝাইতে চায়। তাহারা কাম্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়াছে, মহামোহে ডুবিয়াছে। অহংকার অভিমানের কালসর্প তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। গর্ব্ব মোহ কামনার জ্বর রোগাক্রান্ত রসনায় মধুর রস কটু বলিয়া অনুভূত হয়, বিষয় সুখ তাহারা অতি হর্ষে সেবন করে। এই প্রকার বিষয়ের জন্য নিজের দেহের উপর ভরসা করিয়া কত উপায়ে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় ॥১৭॥

মৃত্যুর সঙ্গে ধাক্কা খাইতে খাইতে শ্রীমানলোক সম্পদ সংগ্রহ করে। তাহারা গৃহ পরিবার পুত্র বিত্ত নানা প্রকার দ্রব্যাদি লাভ করে। অতি কষ্টে উপার্জিত এই সকল ভোগের সামগ্রী ছাড়াইবার নিমিত্ত জ্ঞানের গর্বে জ্ঞানাভিমানী অন্ধকারময় রাজ্যে গমন করে। অভিমান অন্ধ তমিস্রনামক নরকে ফেলে। অন্ধকারে যত অগ্রসর হয় অন্ধকারই দেখা যায়। মোহ রাত্রির অন্ধকার আর শেষ হয় না বরং বৃদ্ধি পায়। এই ভয়ঙ্কর অজ্ঞান অন্ধকারে আলোক প্রকাশের নিমিত্ত সূর্যও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। গাঢ় মূঢ়তা ক্রমে অতি গাঢ় মোহে পরিণত হয়। সুষুপ্তি দশায় যেমন কিছুই বোধ থাকে না, সর্ব্বাঙ্গ আলস্যে অবশ হয়, তেমনি নিন্দা ও ক্রোধ দেহে আসিয়া ঘর বাঁধিয়া থাকে। তাহাতে ভজন বিমুখ হইলে মানুষ অভিমান দ্বারে অধঃপতিত হয়। অথই জলে পাথর পড়িয়া গেলে যেমন উহা তুলিয়া আনা যায় না, সেইরূপ অধঃপতিত ব্যক্তিকে উঠানো যায় না। যে বাসুদেবে সদা বিমুখ, যাহার হরিভজনে আনন্দ নাই তাহার অধোগতি হয়,

শ্রীরাজোবাচ।

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিংবর্ণঃ কীদৃশোনৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্ ॥১৯॥

শ্রীকরভাজন উবাচ।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥২০॥

সে দুঃখই ভোগ করে। অভক্তের গতি ও স্থিতি এই প্রকার—তাহার দুর্গতির কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সরস্বতীও ভীত হন। অভক্তের গতি বলার দুর্ভাগ্য হইতে মূক হওয়া ভাল। প্রাণান্ত হইলেও কেহ তাহার দোষ বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না। হে রাজন্, আপনি প্রশ্ন করেছেন এ জন্যই অভক্তের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলাম, অন্যথা জিহ্বায় কখনও তাহাদের কথা উচ্চারণও করি না। যাহা হউক, হে রাজান্, আসুন বক্তা ও শ্রোতা আমরা সকলে শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিয়া বাণীর প্রায়শ্চিত্ত করি। অভক্তের গতি সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া রাজা অন্তরে দুঃখ অনুভব করিলেন, এজন্য তিনি হরিনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীহরির স্মরণ করিয়া যুগে যুগে ভক্তগণ কোন্ বিধানে তাঁহার ভজন করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন ॥১৮॥

যাঁহার স্মরণে কর্ম্মাকর্ম্ম মাথা উঁচু করিতে পারে না, সেই ভগবানের কথা আমার মঙ্গলের নিমিত্ত বর্ণনা করুন। সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুগযুগান্তর তাহার ভক্তগণ কোন্ নামে কোন্ রূপে কি ভাবে পূজা করেন। হে যোগিরাজ, সেই সেই কালের প্রজাগণ অধোক্ষজ শ্রীভগবানকে কি বিধি অনুসারে যজন পূজন করেন। আপনার মুখে কৃপাপূর্ণ উপদেশের সমীপে অমৃতও তুচ্ছ। আপনার বাক্য পূর্ণ পরমানন্দ, ইহাতে জন্ম মৃত্যুর মূল উচ্ছেদ হয়। তাহার মধ্যে ভগবদ্‌গুণ যুগানুবর্ত্তী শ্রীনারায়ণের ভজন পূজন বিধান কৃপা পূর্ব্বক বলুন।

রাজার এই কথা শুনিয়া সকলেরই সন্তোষ হইল। শ্রীহরিগুণের প্রশ্ন শুনিয়া কনিষ্ঠ করভাজন তাহার উত্তর দিতেছেন ॥১৯॥

ভক্তগণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে কেশবার্চ্চনায় নানা বর্ণ, নানা আকার,

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহু র্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥২১॥

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তাঃ নির্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥২২॥

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥২৩॥

নানা নাম ও নানা উপচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'ক' কারে ব্রহ্মা, 'ব' কারে বিষ্ণু, 'শ' কারে স্বয়ং ত্রিনয়ন শিব। কেশব গুণত্রয়ের অতীত তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ। কেশব কেবল অর্ধমাত্রা। ব্যক্ত কি অব্যক্ত তাহা অনির্ব্বচনীয় কেননা বাহু অভ্যন্তরে এক বলিয়া ব্যাপ্য ছাড়াই ব্যাপক। যুগানুসারে তাঁহার রূপ ও নাম এবং ভজনবিধি ক্রিয়া ধর্ম্ম। ভক্ত অনুক্রম অবধারণ করিয়া পুরুষোত্তমের আরাধনা করেন ॥২০॥

কৃত যুগে শ্বেতবর্ণ জটিল চতুর্ভুজ বল্কলাম্বর দণ্ডকমণ্ডলুধারী অজিন, ব্রহ্মসূত্র ও করে অক্ষমালা। ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ়ব্রত এই চিহ্নে চিহ্নিত মূর্ত্তিমন্ত পরমাত্মাকে ভক্তগণ পূজন করেন ॥২১॥

সে কালে সকল মানুষ সর্বদা শান্ত অহিংস নিরন্তর সমবুদ্ধি পরস্পর সুহৃদ মিত্রভাবাপন্ন। তপস্যাই তাহাদের দেবযজন। শম দম সাধনই সেই তপস্যার সম্পূর্ণ লক্ষণ। তাহারা স্বয়ং ভগবদ্‌ভজন করেন। দেবতার দশধা নামোচ্চারণ করেন, সেই সকল নাম সাবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ॥২২॥

হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই দশনাম তাহারা কীর্ত্তন করেন। সেই কালের শ্রেষ্ঠ ভক্তেরা এই নাম সদা সর্ব্বদা পাঠ কীর্ত্তন করেন। ইহাতেই তাহারা সংসার সংকটকে পরাভূত করেন। সত্যযুগের আরাধনা ক্রম সম্পূর্ণভাবে বলিলাম। এখন ত্রেতাযুগের ভজন ও মূর্ত্তির ধ্যান-বলি-শুনুন ॥২৩॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥২৪॥

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্ ।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২৫॥

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥২৬॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥২৭॥

ত্রেতায় পুরুষোত্তম যজ্ঞমূর্ত্তি রক্তবর্ণ, নির্ধূম অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, পিঙ্গলজটা, সেই দেবদেবোত্তম চতুর্ব্বাহু। তিনি যজ্ঞপুরুষ, নির্মল গুণত্রয়ের ত্রিমেখলা বেদত্রয়ীর ঐক্যমূর্ত্তি। বেদত্রয়ের মহোৎসব স্বরূপ স্রুক স্রুবা করে ধারণ করিয়া যজ্ঞোপকরণ সকলই তিনি ধারণ করেন, ইহাই বোধ করাইয়া দেন। এভাবে তাহার ভক্তগণ ত্রেতাযুগে নারায়ণরূপে জানিয়া ধ্যান করেন ।।২৪।।

সে কালে জ্ঞানীলোক তিন বেদ অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদেবস্বরূপ পূর্ণ শ্রীহরির ভজন করেন। ত্রেতার জনগণ বেদবাক্যে নিত্য আদর পরায়ণ, ভজনতৎপর, ধর্ম্মিষ্ঠ অতিশয় ধার্ম্মিক। তাহারা অষ্টপ্রকার নাম স্মরণ করেন, পাঠ করেন এবং কীর্ত্তন করেন। সেই নামগুলি শ্রবণ করুন ॥২৫॥

বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত ও উরুগায়—এই পরম অষ্টনাম তাহারা স্মরণ করেন। দ্বাপরে ভগবদ্ ধ্যান এবং সেই যুগের পূজা বিধান। ভক্ত কি ভাবে ভজন করেন, নাম স্মরণ করেন, তাহা শুনুন ॥২৬॥

দ্বাপরে ঘনশ্যামবর্ণ, অতসী পুষ্পপ্রভাসমান পীতাম্বর পরিধান এবং শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারিভুজে চারিটি আয়ুধ—এই লক্ষণে ভক্তগণ সর্ব্বদা ভগবানকে উপলক্ষিত করেন ॥২৭॥

তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥২৮॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥২৯॥

নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥৩০॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥৩১॥

শশাঙ্কশুভ্র ছত্র, মণিখচিত চামর, মহারাজার লক্ষণান্বিত রাজোপচার এই সকল দিয়া দ্বাপরের মানুষ অতি আদরে পুরুষোত্তমের পূজা করে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ বৈদিক ও তান্ত্রিক মিশ্র বিধানে অনতিবিলম্বে পরাৎপর ভগবানকে লাভ করিবার নিমিত্ত অর্চ্চনা করে। ভজনতৎপরগণের এই রীতি। কলিকালের সকল মল দহনের নিমিত্ত সেই কালে যে নামের স্মরণ করিতে হয় তাহা বলি, হে রাজন্, শুনুন ॥২৮॥

'বাসুদেব' তোমাকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম, 'সংকর্ষণ' তোমাকে নমস্কার, 'প্রদ্যুম্ন' তোমাকে প্রণাম, 'অনিরুদ্ধ' তোমাকে অভিনন্দন জানাই ॥২৯॥

'নারায়ণ' ঋষিবর, 'মহাপুরুষ' সুরেন্দ্র, 'বিশ্বরূপ' বিশ্বেশ্বর হে "মহাত্মগণ" আপনাদিগকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বভূতাত্মা পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার—দ্বাপরে এই প্রকার নামে, হে নৃপশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা ভগবানের স্মরণ এই নামে। এই নাম পাঠ করিলে ভগবানের অত্যন্ত অধিক সন্তোষ হয়। তিনি অতি দ্রুত বৈকুণ্ঠ আবাস ত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনের স্থানে অচমকা আসিয়া উপস্থিত হন ॥৩০॥

এই সকল নামে দ্বাপরের লোক স্তুতি স্তব করে। অনন্তর কলিযুগের তন্ত্রোক্ত বিধান শুনুন— ॥৩১॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৩২॥

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা। বর্ণ কৃষ্ণবর্ণের প্রভাবযুক্ত—ইন্দ্রনীলমণির তেজঃ সমূহে শোভায়মান মূর্ত্তির মত দেখায়। মূর্ত্তি সর্বাঙ্গ সুন্দর। বেণু বিষাণ প্রভৃতি উপাঙ্গ। চতুর্ভুজ তাহাতে শঙ্খ চক্রাদি চারিটি আয়ুধ বিরাজিত। পৃষ্ঠদেশে নিজ পার্ষদগণ অবস্থান করেন। নন্দ সুনন্দাদিও আয়ুধ হস্তে আছেন। কলিযুগে প্রজ্ঞাবান পুরুষ এই প্রকারে সর্বদা গোবিন্দকে চিন্তা করেন। মধুপর্কাদি অর্পণ বিধানে যে পূজা করা তাহাকে গৌণ বিবেচনা করিয়া কলিযুগে কেবল কৃষ্ণের রুচিজনক নাম কীর্ত্তনই বিধান।

হে রাজাধিরাজ, এইটি নতুন ব্যবস্থা যে কীর্ত্তনেই তাঁহার মহাপূজা হইবে, অধোক্ষজ ভগবানের নাম কীর্ত্তন এতই প্রিয়। কীর্ত্তনে সেই গরুড়-ধ্বজের সর্বদাই উল্লাস। গোবিন্দের নাম কীর্ত্তন করেন বলিয়া নারদকে অসীম সম্মান দান করেন ভগবান্। তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণকীর্ত্তি গান করেন আর নাম কীর্ত্তন করেন। নাম কীর্ত্তনেরই ফলে সংকট সময়ে প্রহ্লাদকে ভগবান রক্ষা করিলেন। কীর্ত্তনে তুষ্ট হইয়া গোবিন্দ নিজ দাসের ভববন্ধন ছেদন করেন। গজেন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া শ্রীনারায়ণকে লাভ করিলেন। তাহার সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবান্ তাহাকে নিজ ধামে লইয়া গেলেন। অধমেরও অধম অত্যন্ত পাতকী গণিকা, সেই বেশ্যার মুখেও হঠাৎ শ্রীরাম নাম উচ্চারণের ফলে শ্রীহরি তাহাকে বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্যতা দান করেন। মহাদোষের গ্লানিতে অতিশয় বিনষ্ট চরিত্র অজামিল। নামের এরূপ মহিমা যে তাহাকেও নাম নির্ম্মল করিয়া দিল। তন্ময় হইয়া দ্রৌপদী গোবিন্দ স্মরণ করে, ফলে সংকটে অনায়াসে রক্ষা পায়। নাম আধিব্যাধি দূর করিয়া দাসগণের কায়-মন-বাক্য শুদ্ধ করিয়া দেয়। অন্তর শুদ্ধির কারণ মুখ্যতঃ শ্রীহরি কীর্ত্তন ভিন্ন আর সাধন নাই। বাছুরীর নিমিত্ত গোমাতার যেরূপ প্রীতি আসক্তি, কীর্ত্তনের প্রতি শ্রীহরির সেইরূপ আকর্ষণ। মধু-মক্ষিকা যেরূপ তাহার মধুচক্র ক্ষণকালের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কীর্ত্তনকারীর নিমিত্ত ভগবানও সেরূপ উৎকণ্ঠিত। নাম স্মরণকারী ভক্ত

অচ্যুতকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়া রাখেন। দাসের অণুমাত্র দুঃখ নিজের অঙ্গদান করিয়া নিবারণ করেন। এজন্য শ্রীহরিকীর্ত্তনের মাধুর্য যাহার অনুভব হইয়াছে তাহার আর অন্য সাধনের জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি শ্রীহরি কীর্ত্তনে তাঁহার গুণানুবাদ বর্ণনায় মনে অধিকাধিক আনন্দ অনুভব করেন তাহার সম্বন্ধে সমগ্র ধরণী পবিত্র হয়। এক শ্রীরাম নাম সদা যাহার রসনায় সমুচ্চারিত হয় মহাপাপের পর্বত চূর্ণ করিয়া সে পরমানন্দে থাকে। হরি কীর্ত্তন প্রীতির সহিত করিলে হৃদয়ে শ্রীজনার্দন আবির্ভূত হন। আর কোনো শ্রেষ্ঠ সাধন তাহার থাকে না। কীর্ত্তনের সুখোল্লাসে নিষ্ঠায় যদুনাথের তুষ্টি হয়। কীর্ত্তনে অসংখ্য নির্বোধ সাধারণ লোক নিস্তার পাইয়াছে। কীর্ত্তনের মত আর কোনো প্রবল সাধন নাই। অনর্থক কোনো কোনো পামর লোক কীর্ত্তনের নিন্দা করে। নাম কীর্ত্তন বিমুখ লোক স্বপ্নেও সুখ পায় না। কীর্ত্তনের প্রতি বিদ্বেষ নানা দুঃখ ভোগ করায়। যাহাদের হৃদয়ে দ্বেষের সঞ্চার হয় তাহাদের আচারকে ধিক্। বিদ্বেষী লোক চিরদিন দুস্তর দুঃখ ভোগ করে। কলিযুগে যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা সদা সর্ব্বদা গৌরবের সহিত নাম স্মরণ পূর্ব্বক হর্ষ ভরে প্রেমপূর্ণ অন্তরে নাম কীর্ত্তনে নিরত থাকিবে। অতি গহন নানা অবতার সংবাদ। তাহার মধ্যে শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র, তাঁহাদের চরণ বন্দনা বলিতেছি—॥৩২॥

শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা—

রুক্ষতাং ব্যাবর্ত্তয়তি। ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জলম্। যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারম্। অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি। উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি। অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি। পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ। তৎসহিতং। যজ্ঞৈরর্চনৈঃ। সঙ্কীর্ত্তনং নমোচ্চারণং স্তুতিশ্চ তৎপ্রধানৈঃ। সুমেধসো বিবেকিনঃ ॥

অনুবাদ :—(কৃষ্ণবর্ণ এই কথায় মনে হইতে পারে রুক্ষ কালবর্ণ, তাহা নয়। সেই কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য অর্থাৎ সেই অবতারের বর্ণের রুক্ষতা নিবারণের জন্যই বলা হইয়াছে "কান্তিতে অকৃষ্ণ"। ইহার অর্থ

"ইন্দ্রনীল মণির ন্যায় উজ্জ্বল" বর্ণ। এই অর্থ করিয়াও তুষ্ট হইতে পারিলাম না। "কান্তিতে কৃষ্ণ" এইরূপ অকৃষ্ণ না বলিয়া যদি কৃষ্ণই বলা হয় তাহা হইলে অর্থ হইবে কৃষ্ণাবতার অর্থাৎ কলিকালে কৃষ্ণাবতারেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইতেছে। অঙ্গ কথার অর্থ হৃদয় ললাট শির শিখা প্রভৃতি। উপাঙ্গ অর্থ কৌস্তুভ বনমালা প্রভৃতি। অস্ত্র বলিতে সুদর্শন চক্র কৌমুদকী গদা প্রভৃতি। পার্ষদ নন্দ সুনন্দ চণ্ড প্রচণ্ড প্রভৃতি। ইহাদের সহিত নাম উচ্চারণ ও স্তুতি প্রভৃতি যে সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান এরূপ অর্চনায় বিবেকবান পুরুষেরা কলিযুগে উপাসনা করে।)

শ্রীজীব গোস্বামী কৃত ক্রমসন্দর্ভঃ—

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তরকলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বঞ্চাস্য আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত ইত্যত্র পারিশেষ্য প্রমাণলব্ধং। ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গতঃ ইত্যুক্তে শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতা গতত্বেন দর্শিতং। পীতস্যা-তীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমানত্বা দ্যুগাববতারত্বং তস্মিন্ সর্ব্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূ্তা ইতি তত্তৎ প্রয়োজনং তস্মিন্নেকাস্মিন্নেব সিদ্ধ্যতীত্যপেক্ষয়া। তদেবং যদ্ দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদেবকলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি। তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণ দ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র। যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্ত-মস্তীত্যর্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধব বাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়ো রুক্মিণ্যাঃ সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য সঃ। শ্রিয়ঃ সবর্ণো রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা। কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বপরমানন্দ বিলাস স্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়াচ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং। অথবা স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভা বিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ। যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ। কিম্বা সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশ

বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্। তাদৃশ শ্যামসুন্দরমেব সত্ত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। অঙ্গান্যেব পরমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি। মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি। সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্ম্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বরেন্দ্র বঙ্গোৎকলাদি দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ যদ্বা অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণ প্রভৃতয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তং। তদেবম্ভূতং কৈর্যজন্তি। যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্ম্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তন প্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যেতানি। দর্শিতশ্চৈতৎ পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেণ। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূত তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি।

অনুবাদ ঃ—

পূর্ব্ব শ্লোকে কৃষ্ণ অবতার কথা বলিয়া এই শ্লোকে কলিযুগের অবতার কথা পূর্ব্ব রীতি অনুসারে বলেন। কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি শ্লোকে। ত্বিষা কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থ গৌর, তাহাকে সুবুদ্ধিগণ যজন করেন। অ-কৃষ্ণ অর্থে গৌর বলিবার হেতু হইল পারিশেষ্য ন্যায়ে এইরূপই উপলব্ধি হয়। যুগানুসারে এই সন্তানের শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ ছিল, এখন সে কৃষ্ণতা বা বা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্লোক তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায়—এখন অর্থে দ্বাপরে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা বলা হইলে শুক্ল ও রক্তবর্ণ সত্য ও ত্রেতা যুগে, ইহাই দেখান হইল। পীতবর্ণ অতীতে কিরূপে হইল এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। অতীত কালের প্রাচীন অবতারের অপেক্ষায় উহা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণরূপে বলিবার ইচ্ছায় তাহার যুগাবতারত্ব, অতএব সকল অবতার তাহাতে অন্তর্ভূত ইহা

বুঝাইবার প্রয়োজনও সিদ্ধ হইয়াছে। এই ভাবে বুঝিতে হইবে যে, যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন সেই দ্বাপরের শেষে কলিতেই গৌরও অবতীর্ণ হন। এই তাৎপর্য্য বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই এই শ্রীগৌর তাহা প্রমাণিত হয়। ইহার অন্যথা হইতে পারে না। অতএব এই আবির্ভাবটিকে নিজেই বিশেষণ দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন। কৃষ্ণবর্ণ বলিতে "কৃ" "ষ্ণ" এই দুটি বর্ণ যাহাতে। যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নামে কৃষ্ণত্ব প্রকাশক কৃষ্ণ এই দুটি বর্ণ প্রয়োগ আছে। তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের উক্তি সমাহূতা ইত্যাদি শ্লোকে শ্রিয় "সবর্ণেন" এই অংশের টীকায় শ্রী শব্দে রুক্মিণীর সমান বর্ণ যুগল যাহার বাচক সেই ব্যক্তি "রুক্মী" এই অর্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

অথবা অন্যরূপেও অর্থ করা যায় যেমন, কৃষ্ণকে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তাদৃশ স্বপরমানন্দ বিলাস স্মরণোল্লাস বশে নিজে গান করেন এবং পরম করুণায় সকল লোককেও উহা যিনি উপদেশ করেন, তিনিই "কৃষ্ণবর্ণ"।

অথবা নিজে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরকান্তি নিজের শোভা বিশেষ দ্বারা যিনি শ্রীকৃষ্ণউপদেশ করেন। তাৎপর্য্য, যাহার দর্শনেই সকলের মনে কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি হয়। কিংবা সর্ব্বলোক দ্রষ্টা কৃষ্ণকে গৌরবর্ণ দেখিয়াও ভক্ত বিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশ বিশেষে কৃষ্ণবর্ণ প্রতীতি হয় যে সেইরূপ শ্যামসুন্দরই তো আছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-রূপেরই প্রকাশ তাহারই আবির্ভাব বিশেষ তিনি, ইহাই ভাব। তাহার ভগবত্তা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—মনোহর অঙ্গ, উপাঙ্গ ভূষণাদি, মহাপ্রভাব হেতু উহারাই অস্ত্র, সকল দেবতার একান্ত আশ্রয় বলিয়া তাহারই পার্ষদ বহু মহানুভব ব্যক্তি গৌড়দেশ বরেন্দ্রভূমি বঙ্গদেশ ও উৎকল-বাসী বহুবার সেই ভাবে গৌরকে দর্শন করেছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

অথবা অত্যন্ত প্রেমের পাত্র বলিয়া তাহারই ন্যায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান গৌর। এই প্রকার গৌরকে কোন্ পূজার সামগ্রী দ্বারা যজন করিবে?

বিশেষ করিয়া অভিধেয় বা সাধন রহস্য বলেন—সঙ্কীর্ত্তন অর্থাৎ বহুজনের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গান সুখ প্রধান ভাবে যাহাতে আছে সেই সঙ্কীর্ত্তনই তাহার প্রধানতম সাধন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্ত্তনের প্রাধান্য দর্শন করা যায় অতএব সেইটিই এখানে

অভিধেয়, ইহা স্পষ্ট হইল। অতএব বিষ্ণুসহস্রনামেও সেই গৌরাবতার সূচক নাম বলা হইয়াছে। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাস কৃচ্ছমঃ শান্ত ইত্যাদি। পরম বিদ্বান্‌গণের শিরোমণি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের অর্থ—কাল প্রভাবে ভগবদ্‌ভক্তি যাহা নষ্ট প্রায় হইয়াছিল, উহাকে পুনরায় প্রকাশের নিমিত্ত 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণপূর্ব্বক যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণপদ্মে আমার চিত্তরূপ ভ্রমর গাঢ় হইতে গাঢ়তর রূপে লীন হইয়া থাকুক।

উক্ত টীকার তাৎপর্য অনুকূল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহ কান্ত্যে হয় যেই অকৃষ্ণ বরণ।
অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥
প্রত্যক্ষ তাহার কাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান তম ততি॥
জীবের কল্মষ তম নাশিবার তরে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধি কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহা তম॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
কল্মষ নাশ করি প্রেমেতে ভাসায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেম ধন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুসন্ধেয়।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩৩॥

বৃত্তি লয় যোগ, প্রত্যগাত্মানুসন্ধান, বিবিধ দেবদেবীর ধ্যান, সগুণ নির্গুণ ধ্যেয় নিরূপণ প্রভৃতি এক শ্রীহরিচরণ স্মরণের সমীপে অতি তুচ্ছ তৃণের মত হইয়া যায়। ধ্যানীর জন্য শ্রেষ্ঠ ধ্যান শ্রীহরির চরণ। ইহাতে কল্পনার কষ্ট নাই। ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট মনোরথ ইষ্টলাভ সর্বদা পূর্ণ হয়। নিত্য শ্রীহরির চরণ ধ্যান করিলে ভক্তের দেহরোগ দুঃখভোগ প্রভৃতি দূর হয়, ইহাই বড় কথা নয়, তাহার ভবরোগও প্রশমিত হয়। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ হয় বলিলে মনে হইতে পারে যে, তাহার বিষয় বাসনা বুঝি পূর্ণ হয়, তাহা নয়, শ্রীভগবান্ নিজের চরণামৃত দান করিয়া নিজ ভক্তকে নিত্য তৃপ্ত ও পরমানন্দে রাখেন। শ্রীচরণের পবিত্রতার কথা বলিব কি—শংকর চরণামৃত প্রবাহ শিরে ধারণ করিয়াছেন, যে ধারা সকল তীর্থের জন্মভূমি। চরণধ্যানে ভক্ত পর্যন্ত পবিত্র হইয়া যান। অকস্মাৎ অজ্ঞাত ভাবে চরণ স্পর্শে পাষাণ অহল্যা পবিত্র হইয়া গেল। জানিয়া বুঝিয়া যদি সেই চরণ ধ্যান করে তাহা হইলে যে পবিত্রতা লাভ হইবে সে সম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে? যে সর্ব্বদা শত্রুতা করিয়া পত্নীকে পর্য্যন্ত চুরি করিয়া নিয়াছে তাহারই ভাই—রাবণের ভাই বিভীষণ যখন আসিয়া শরণাগত হইল, শ্রীহরি তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মদান করিলেন। হে রাজাধিরাজ, কেবল আত্মদান নয়, সোনার লঙ্কাপুরী দিয়া সেই প্রীতির দৃঢ়তা স্থাপন করিলেন, এই জন্য শরণাগতের একমাত্র শরণ্য শ্রীহরির চরণ, তাঁহার ভক্তের সমীপে ইহা হইতে আর নির্ভর স্থান নাই। ভগবান্ ভক্তের অনুমাত্র ব্যথাও সহ্য করেন না। প্রহ্লাদের অতিশয় দুঃখ নিজের অঙ্গ দিয়া তিনি দূর করিয়াছেন। বনের মধ্যে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে রাখাল বালকগণকে তিনি রক্ষা করিলেন। পাণ্ডবগণকে জতুগৃহদাহ সময়ে সুরঙ্গ পথে বাহির করিয়া লইলেন।

ভগবান্ নিত্যই নিজের অনুদ্বারা ভক্তের পীড়া দূর করেন। স্বপাজনে

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্ ।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥৩৪॥

ভক্তের প্রেমে রথের সারথ্য অঙ্গীকার করেন। তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করি। ভক্তের প্রতিপালক নিজে কোলে করিয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। এমন দয়ালু এজগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রবল ভব সমুদ্র, তাহার চরণ হইয়াছে ভেলা নৌকা, চরণানুরাগে অনন্যশরণ সকল জীবকে তিনি উদ্ধার করেন, সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ শরণাগতের একমাত্র শরণ্য। সনকাদি মুনিগণ সেই চরণ ধ্যান করেন, অভিনন্দন করেন।

শ্রীচরণের মহিমা অগাধ, বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ শুদ্ধ হইয়া যায়। ব্রহ্মা সদাশিব স্তব করিতে করিতে তটস্থ হইয়া থাকেন। শ্রীচরণ অগম্য অতর্ক্য মহিমান্বিত। ইহা জানিয়া ব্রহ্মা শংকর সাষ্টাঙ্গ অভিনন্দন পূর্বক স্তব করিতে থাকেন ॥৩৩॥

যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য নিমিত্ত দেবতাগণও লালসান্বিত মন, সেই রাজ্য সম্পদ শ্রীরাম পিতৃবাক্য রক্ষার নিমিত্ত ত্যাগ করেন। শ্রীরাম খুব নিপুণ চোখা ধর্ম্মিষ্ঠ তিনি পিতৃবচন প্রতিপালক। বিরাট রাজ্য ত্যাগ করিয়া তিনি একাকী বনবাস স্বীকার করিলেন। শ্রীরাম বনে যাওয়ার সময় সঙ্গে শ্রীসীতাকে নিয়াছিলেন, ইহাতে কেহ তাঁহাকে স্ত্রীকামী বলিয়া ভাবিতে পারে, কিন্তু আপনারা শ্রোতৃবৃন্দ তাহা মনে করিবেন না। সীতা কেবল স্ত্রীমাত্র নন, তিনি তত্ত্বত শ্রীরামের নিজভক্ত। এজন্যই সমস্ত রাজভোগ ত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থে বনে গমন করিলেন। রাজ পুরীতে অবস্থান কালে শ্রীরঘুবীরের সেবকেরা সেবা কার্য্য অধিকার অনুসারে ভাগ করিয়া লইত, বনের মধ্যে সেই সেবা আমি একান্তে একাই করিব। মনে এই ভাবনা করিয়া সেবা দ্বারা নিজে কৃতার্থ হইবেন আশায় শ্রীসীতা শ্রীরামের পদানুসরণ পূর্ব্বক বনবাসে গেলেন। শ্রীরামের সেবা কি অনির্ব্বচনীয় সুখ! পায়ে হাটিয়া যাওয়ার কোনো দুঃখ নাই। মায়ার সংসার পিতৃগৃহের কথা সকলই তিনি ভুলিয়া অত্যন্ত হর্ষে শ্রীরামের সেবায় মগ্নচিত্ত সীতা। এই প্রকার মনের

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥৩৫॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥৩৬॥

সদ্ভাব, তাই বনে আসিয়া তিনি সেবা করেন; শ্রীরামই ভক্তের ভাব জানেন। ভগবদ্‌ভজনের সুখ ভাবুক ভক্তই জানেন। ভাব ভিন্ন ভজনের সুখ প্রীতিহীন ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। পূর্ব্ব প্রীতিযুক্তা ভক্তিমতী সীতা, রঘুনাথ তাহা অবগত আছেন বলিয়াই তাহার বাক্যস্বীকার করিয়া মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হন। মায়ারচিত মৃগের স্বুবর্ণভান শ্রীরঘুনন্দন যদি পূর্ণরূপে জানিতেন তবে কি আর তিনি মৃগের অনুসরণ করিয়া ছুটিতেন! বালকের ছন্দ বুঝিয়া মাতা যেমন তদনুসারে নিজেও নাচেন, তেমনি আপন ভক্তের বাক্য রক্ষার নিমিত্ত শ্রীরাম কপট মৃগের পিছনে ধাইয়া গেলেন। পরম উপকারী সকল বানর দল মিলিত কণ্ঠে বলিয়াও যে রামের মনকে বিভীষণ বিষয়ে চঞ্চল করিতে পারে নাই, এক জানকীর বাক্যে সেই রাম মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেন! ভক্তের বাক্য কোনো মতে মিথ্যা হইতে দিবেন না এইজন্য রঘুনন্দন মৃগের অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া গেলেন। এই প্রকার ভক্ত বাক্য মাত্র যিনি পদব্রজে মৃগের অনুসরণ করেন, যাহার চরণ রেণু শংকরাদি সকল দেবতা শিরে ধারণ করিয়া বন্দনা করে, তিনি মৃগের পশ্চাদ্ধাবনের ফলে পথের পাথরও শুদ্ধ হইল, তাঁহার সেই চরণ অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ করিয়া পরম ভক্তির সহিত বন্দনা করি। এই প্রকারে সেই মহাপুরুষের অভিবন্দন করিয়া সকল দেবতা তাহার স্তব করেন। কীর্ত্তন দ্বারা কলিযুগের সমস্ত লোক পরম পবিত্র হইয়া নিত্য মুক্ত হইয়া যায় ॥৩৪॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগে পূর্ব্বোক্ত নামও রূপে শ্রীহরি অবতীর্ণ হন। সদ্‌ভাবে মানুষ তাঁহাকে পরম মঙ্গল লাভের নিমিত্ত ভজন করে। ইহার মধ্যে মুনীশ্বরগণ কলিযুগের বহু মহিমা বর্ণনা করেন, কারণ কলিতে হরি কীর্ত্তনেই চারিপ্রকার মুক্তি কীর্ত্তনকারীর সমীপে দাসী হইয়া থাকে ॥৩৫॥

হে সর্ব্বজ্ঞ রাজন্, কলিযুগ ধন্য কলিযুগের মানব সমূহ তাহাদের সকল

স্বার্থ হরি কীর্ত্তনে শ্রীহরিনাম স্মরণে লাভ করে। কলিযুগের দোষ অগণিত, একমাত্র হরিকীর্ত্তনে কি প্রকারে সকল স্বার্থ পূর্ণ হইতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেন না দোষের কথা না ভাবিয়া যে কলিযুগে হরিকীর্ত্তনে উদ্ধার হয় এই গুণের কথা স্মরণ করিয়া কীর্ত্তন করে তাহাতেই মুক্ত হইয়া যায়। হরিকীর্ত্তনে চিত্ত শুদ্ধ হয়, দোষ পরিহার পূর্ব্বক গুণ সঞ্চিত হয়, এই প্রকার সারভাগী হরিকীর্ত্তনে পরম মুক্ত। কলির গুণ জানিয়া নামে অনায়াস মুক্তিলাভ একথা বুঝিয়া যে নাম কীর্ত্তন করে সে নিশ্চিত নিত্যমুক্ত। সকল যুগের সার কলিযুগ, তাহাতে আবার সার হরিনাম নিরন্তর যে স্মরণ করিবে, যে নিত্য নাম ধ্বনি করিবে সেই ব্যক্তি মুক্ত।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যযুগে শম দমাদি সাধন, ত্রেতাযুগে বেদোক্ত যজ্ঞ, দ্বাপরে আগমোক্ত পূজন তন্ত্রবিধান বিধি অনুসারে। তিন যুগের লোকেরই সাধনা পরম সংকটময়, তাহাতে অনুমাত্রও মনের শান্তি পায় না। সেই সকল সাধনা কলির কীর্ত্তন সাধনের নিকট লজ্জিত হইল। যেহেতু এই সংকীর্ত্তনে নাচিয়া গাহিয়াও পরমাত্মাকে বশীভূত করা যায়। গ্রামের বাহিরে যমুনা তীরে দল বাধিয়া রাখাল বালকদের হৈ হুল্লোরের মধ্যে তাহাদের মুখে প্রেমের গান শুনিয়া সাধারণ মানুষের মতই পরম দেবতা আপন ভোলা হইয়া তাহাদের সঙ্গে আনন্দে নাচিতে থাকে। বালকগণ উচ্চ স্বরে কৃষ্ণ কানাই গোপাল গান করিতে থাকিলে ঘনশ্যামের সুখ হয়। সেই সুখের সন্তোষে পরমানন্দে পরমদেবতা উল্লসিত হন। এই প্রকারেই কলিযুগে কীর্ত্তন দ্বারা ভক্ত অনায়াসে উদ্ধার হইয়া যায়। কীর্ত্তন মণ্ডলে প্রবেশ করিলে পাতক সমূহ দগ্ধ হইয়া যায়। ভক্তও তখন উদ্ধার হইয়া যায়। হরি নামের মহিমা কলিযুগে এই প্রকার বিশেষত্ব, আরও যে নাম সংকীর্ত্তনে চারিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে উদ্ধার হয়। স্ত্রী অথবা শূদ্র বিচার ইহাতে নাই। বেদ অত্যন্ত কৃপণ হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের শ্রবণের বিষয় হইয়াছে। স্ত্রীশূদ্রাদি বেদ উচ্চারণ করিবে না, এই বিধি বর্ত্তমান। সেই বেদ হইতে অতি অল্প হরিনাম কীর্ত্তনেই স্ত্রী শূদ্র

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥৩৭॥

অন্ত্যজ সকলে উদ্ধার হয়। কীর্ত্তন দ্বারা স্বধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়। স্বধর্ম্ম সংশোধন হয়। কীর্ত্তনে পরব্রহ্ম লাভ হয়। কীর্ত্তনের সমীপে মুক্তির আনন্দ লজ্জা পায়। কীর্ত্তনানন্দে চতুর্বিধ মুক্তি হরিভক্তকে বরণ করে, ভক্ত তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। মুক্তি তাহার দাসীত্ব করিবার নিমিত্ত পদে শরণ গ্রহণ করে।

হে রাজন্, কলিযুগের এই পরিচিতি। কীর্ত্তনেরই পরম প্রশংসা, অন্যথা ভাব হৃদয়ে স্থান দিবেন না। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কোনো যুগেই নাম কীর্ত্তনে নিষেধ নাই কিন্তু কলি যুগে চারিপ্রকার মুক্তি নাম কীর্ত্তনের সমীপে স্বয়ং দাসী হইয়া থাকে ॥৩৬॥

যে সকল প্রাণী জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে পতিত হইয়া সর্বদা ভ্রামিত হইতেছে, কলিযুগে হরিকীর্ত্তনেই তাহারা গতি লাভ করিবে। কীর্ত্তনই কলিযুগের জীবকে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরম শান্তি সুখ ও সন্তোষের পরমানন্দ দান করে। কীর্ত্তনে এই মহান্ লাভ। ইহা অন্য যুগের সুর নর দুর্লভ। কেবল কলিযুগেই ইহা সুলভ। এই নিমিত্ত যাহাদের ভাগ্য ভাল তাহারাই কীর্ত্তনের নিমিত্ত লুব্ধ হন। কীর্ত্তন দ্বারে চারি মুক্তি ভক্তের শরণ গ্রহণ করে। কেহ মনে করিতে পারে ইহা সম্ভব নয়। তদুত্তরে হে রাজন্, তাহার যুক্তি বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া দেবতা পরম সন্তোষলাভ করেন। অতি দ্রুত তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে কীর্ত্তন মণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। কারণ তিনি নিজ নাম গুণ কীর্ত্তনে অত্যন্ত লুব্ধ। বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়ার কথা তাহার ভুল হইয়া যায়। ভক্তের ভক্তি দেখিয়া তাহাদের কাছেই তিনি স্থান করিয়া নেন। যেখানে যদুনাথ থাকেন সেখানেই বৈকুণ্ঠলোক আগমন করেন। অতএব কীর্ত্তন মণ্ডলীতে যাহারা থাকেন তাহারা সালোক্য মুক্তির আনন্দেই থাকেন। কীর্ত্তনের ধ্বনিতে আকৃষ্ট শ্রীহরি ভক্তের সমীপে ছুটিয়া যান, তাহাতেই কীর্ত্তনকারী সামীপ্য মুক্তিলাভ করেন। কীর্ত্তনে ভক্তের হাতেই ভগবান্ থাকেন। কীর্ত্তনে সন্তুষ্ট

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৩৮॥

হইয়া ভগবান্ প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন। তাঁহার শ্যামসুন্দর পীতাম্বর বনমালা ভূষিত রূপ সহজ ভাবেই মনের ধ্যানে জাগ্রত থাকে। যে রূপ ভক্ত কীর্ত্তন সময়ে ধ্যান করে সেই রূপের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে দেবতার রূপ ও লক্ষণ ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ পীতাম্বরধারী শঙ্খ চক্রাদি আয়ুধ ভগবান্ কীর্ত্তনকারী ভক্তকে বরণ করেন, ইহাই ভক্তের সারূপ্য মুক্তি। তাহাতে ভক্ত ভগবান যেন সমান সমান। সমরূপ সমচিহ্ন ভাবে বিহ্বল হরিনাম গুণ মহিমা কীর্ত্তনে ভক্ত মগ্ন হইয়া থাকে। শ্রীরমাদেবী ভক্ত ও ভগবান দুজনকেই হরিকীর্ত্তনে দর্শন করেন কিন্তু কে ভগবান্ কে ভক্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া উঠিতে পারেন না। ব্রহ্মা পর্যন্ত ঐ ভাবে দেখিয়া চমকিত হন। কে ভক্ত কে ভগবান্ ঠিক করিতে পারেন না। ভাবে মগ্ন হইয়া হরিকীর্ত্তনে ভক্ত ও ভগবান্ আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হন, তাহাদের এই মিলন ভঙ্গ হয় না। তাহাতে বাহিরে ভিতরে দেবতা প্রকট হইয়া পড়েন, চরাচর ভুবনময় দ্বিতীয় আর কিছু নজরে পড়ে না। এই ভাবে বৃত্তি স্বানন্দে নিমগ্ন হইয়া আর কোথাও ভিন্নতা বোধ থাকে না, ইহারই নাম পূর্ণ সাযুজ্য মুক্তি, যাহাতে দ্বিভাব থাকে না। এই প্রকার সাযুজ্যতা করিয়া যে হরিকথা বলে তাহা সমস্ত জীবের অতিশয় প্রিয় লাগে। অতএব হরিকীর্ত্তনের সমীপে চারি প্রকার মুক্তি দাসী হইয়া থাকেন। ভক্ত সর্ব্বদাই শ্রীহরিভজন লুব্ধ হইয়া থাকেন, অতএব সর্বথা মুক্তিকে গ্রহণ করেন না। এই প্রকারে যোগযাগ তপস্যা প্রভৃতি সাধনকে শ্রীহরি কীর্ত্তন অনাথ করিয়া দিয়াছে। কলিযুগে হরিনাম স্মরণে কীর্ত্তনে জড় জীবকেও উদ্ধার করে ॥৩৭॥

কীর্ত্তনেই চারি প্রকার মুক্তিলাভ হয়। তাছাড়া কলিযুগে এই কীর্ত্তন ভক্তি প্রধান। ইহা জানিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কলিযুগে জন্মলাভে ইচ্ছা করেন। স্বর্গ ভোগের স্থান নয় বরং বিষয় সমূহের বন্দীস্থান। ভাগ্যবান লোকেরাই কলিযুগে জন্মলাভ করিয়া হরিকীর্ত্তন করেন। দেবতারাই যখন কলিযুগে জন্মলাভের নিমিত্ত ইচ্ছা করেন তখন সত্য ত্রেতাদি যুগের শ্রেষ্ঠ লোকেরা কীর্ত্তন ধর্ম্ম ভজনের নিমিত্ত যে অবশ্যই কলিযুগে জন্মলাভের

কচিৎ কচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥৩৯॥

কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥৪০॥

ইচ্ছা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সত্যযুগাদির ভাগ্যবানেরা যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গে স্থান পাইলেও কলিযুগে জন্মলাভ ইচ্ছা করেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষই কলিযুগে জন্মের জন্য তৎপর হইয়া থাকেন। অন্য সকল যুগের লোকেরা মিলিত ভাবে পরামর্শ করেন—কলির সৃষ্টি ধন্য, তাহার অধিক মহিমা, কীর্ত্তনের মণ্ডলেই চারি পুরুষার্থ লাভ হয়। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন সে-ই কলিতে জন্মলাভ করে। সুরনর-নাগলোক সকলেরই কলিতে জন্মের জন্য উৎকণ্ঠা। দীনজনের উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীনারায়ণ নিজ নামে সকলের ভববন্ধন ছেদন করিয়া সকলকে নিস্তার করেন। এইজন্য কলিতে হরি কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা থাকিলে মানুষ অনায়াসে নিস্তার পায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলিতে বহুপ্রকার লোক নারায়ণের উপাসনা করে। স্ত্রী ও শূদ্রগণ ভক্তির মহিমা বাড়াইয়া দিয়াছেন ॥৩৮॥

বিশেষ করিয়া দ্রাবিড় দেশে ভক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেখানে বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ। সেই সকল স্থানে খুব ভক্তি-ব্যবহার। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তীরে অগাধ ভক্তির প্রচার। কৃতমালা নদীর তীরে তীরে হরিভক্তি পরম উৎসাহে উল্লসিত। নির্ম্মল-সলিল নদী, তাহার জল পান করিলেও হরি-ভক্তির বৃত্তি পুষ্ট হয়। শ্রীহরিচরণে ভগবদ্‌ভজনে দৃঢ় বুদ্ধি হয়। কাবেরী মহাপুণ্যা নদী, দর্শনে পাপ বিনষ্ট হয়। কাবেরী তীরে শ্রীরঙ্গনাথ অবস্থান করেন। সেখানে ভক্তির প্রবাহ দু-দিকে প্রবাহিত। প্রতীচী নদীতে ডুবিয়া মরিলেও চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভজন করিলে তো কথাই নাই, ভক্তি ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত গতি হয়।

হে রাজন, শুনুন। এই পাঁচ নদীর তীর্থে স্নান করিলে অথবা তাহাদের জলপান করিলে ভগবদ্‌ভজনে বুদ্ধি স্থির হইয়া লাগে। এই সকল তীর্থ

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥৪১॥

দর্শন করিলে কলিমল প্রক্ষালন হয়। স্নান করিলে, জল পান করিলে ভগবদ্‌ভজনে উল্লাস হয়। দর্শন স্পর্শন স্নান করিলে তীর্থের মহিমায় ভগবান্ বাসুদেবে নির্ম্মল ভজনানুরাগ নিত্য নতুন হইয়া বৃদ্ধি পায়। যে ভগবদ্ ভক্ত সে দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। দেবতা মানুষ বা পিতৃগণের ভাবনায় হরিভক্ত কখনো পঙ্গু হইয়া থাকেন না ॥৩৯। ৪০ ॥

শরণাগতের একমাত্র শরণ্য শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণ। সদ্‌ভাবে শরণ গ্রহণ করিলে জন্মমৃত্যু করতলগত হইয়া যায়। জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত ভক্তের অধীন হইয়া গেলে দেবতা ঋষি আচার্য্য বা পিতৃগণের ঋণের দায় আর থাকে না। ভগবদ্‌ভজনে উহা হইতে উত্তীর্ণ হয় ভক্ত। যে হরি চরণে নিবেদিত সে আর কাহারও সমীপে ঋণী নয়। স্পর্শমণির সঙ্গ পাইলে লৌহ চিরদিনের নিমিত্ত তাহার মলিনতা হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। গঙ্গস্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেইরূপ একান্ত ভাবে শ্রীহরি চরণে আত্মনিবেদনে ভক্ত ত্রিবিধ ঋণ মুক্ত। ভাবের সহিত হরিভক্তিতে পিতৃগণের উদ্ধার হয়, ঋণের তৃপ্তি হয়। নিজানন্দে ভক্তির অনুশীলনে সর্ব্বজীবের সুখ হয়। পুত্র ভক্তি করিলে পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজন সকলে উদ্ধার হয়। সকল দেবতার পরম দেবতাকে অতি উল্লাসের সহিত ভজন করিলে ভক্ত দেবতার ঋণে আবদ্ধ হন না। অনন্য ভজন হইলে কর্ম্ম কখনো বাধক হয় না, কেননা ভক্ত যে শ্রীহরির শরণাগত, কর্ম্ম যে তাঁহারই অধীন। অনন্য শরণ শ্রীহরিভক্ত কর্ম্মের অধীন হয় না বা দেবতাগণের চাকর হয় না। প্রাকৃত লোকের সমীপেও সে প্রার্থী হয় না। শ্রীহরির শরণাগতের কোনো দাগ লাগে না। সকল কর্ম্মে অলিপ্ত থাকিয়া ঋণত্রয় হইতে নির্ম্মুক্ত থাকেন হরিভক্ত। তিনি সর্বভূতে বাসুদেবকে দর্শন করেন। এই প্রতীতির দৃঢ়তায় হরিভক্ত সকল কর্ম্ম বন্ধন মুক্ত হইয়া দেবঋষি পিতৃ ঋণ হইতেও মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৪১॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥৪২॥

দেহাভিমান ও দেবতান্তর-ভজন ত্যাগ করিয়া যিনি অনন্য শরণ গ্রহণ করেন শ্রীহরি তাহাকে কর্ম্মবন্ধন ছাড়াইয়া দেন। একান্ত শরণাগত ভক্ত সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম করে, অতএব হরির প্রিয় ভক্তকে স্বপ্নেও কর্ম্মবন্ধন স্পর্শ করিতে পারে না। হে রাজন্, ভগবদ্ ভক্ত নিত্য নির্মুক্ত বিহিত কর্মী। সে যদি কখনো কোনো বিকর্ম্ম আচরণ করেও, তবু তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সিংহের শাবককে মত্ত হস্তীও বন্ধন করিতে পারে না। সেই শ্রীহরির ভক্ত অকর্ম্ম করিলেও তাহাকে যম বন্ধন করিতে পারে না। শ্রীহরির একটি নাম স্মরণ করিলেই মহাপাতকীকে যম যাইয়া বন্দনা করে। তখন যে ভক্ত সর্ব্বদা প্রেমের সহিত শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করে তাহাকে কোনো অকর্ম্ম করার জন্য যম আর কি দণ্ড বিধান করিবে?

শংকা করা যায়, বেদাজ্ঞাতো সাক্ষাৎ শ্রীহরিরই আজ্ঞা। দেবতাগণ কোন্‌টা ধর্ম্ম কোন্‌টা নয়, তাহাও তো বলিয়া দিয়াছেন। তবে ভক্ত যদি অধর্ম্ম অকর্ম্ম করে তাহা হইলে বেদ বিধানে তাহার বন্ধন না হইবে কেন? ইহার সমাধান—রাজার বিশ্বস্ত সেবক বা আত্মীয়কে কখনো বাধা দেয় না, সেখানে নাম উচ্চারণকারী পুত্রকে কে বাধা দিবে? হরিনাম যাঁহার স্মরণে বেদ তাহার চরণ বন্দনা করে। আর যে স্পষ্টভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করে তাহাকে বেদবিধান কখনো বাধা দিতে পারে না। ভক্তের সমীপে বিকর্ম্ম কল্পান্তে স্থান পায় না। অকস্মাৎ দৈবগতিতে কিছু ঘটিলে অচ্যুত স্মরণে উহা হইতে নির্ম্মুক্তি হয়।

কর্ম্মাকর্ম্ম বাঁধিতে পারে না এরূপ ভাগবত ধর্ম্ম কিরূপ, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্তগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেহাভিমানাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বভূতে গাঢ় হরিভক্তি বহন করেন

শ্রীনারদ উবাচ

ধর্ম্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপধ্যায়ো হ্যপুজয়ৎ ॥৪৩॥

কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার তাহার পদতলে বিদলিত হয়, মুক্তি নিজ কেশপাশ দ্বারা তাহার চরণের ধূলা ঝাড়ে। তিনি যাহার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করেন তাহার ভবভয় দূর হইয়া যায়। তিনি যেখানে বলেন সেখানেই মুক্তিসুখ গমন করে। তাঁহার অনুগ্রহে অতি দীনহীনের অন্তরে দেবতার প্রকাশ হয়। তাহার কর্ম্মাকর্ম্মের নিরসন স্বয়ং শ্রীহরিই করিয়া থাকেন। সূর্য্য প্রকাশিত হইলে অন্ধকার পলাইয়া যায়, তেমনি শ্রীরাম হৃদয় ভুবনে প্রকাশ হইলে কর্ম্মাকর্ম্ম সহজেই দূর হইয়া যায়। ভগবানের নাম কীর্ত্তনে যাহার পরম ভক্তি, হে, রাজন্, তাহার সেই ভক্তির দাসীত্ব করিবার নিমিত্ত চারিপ্রকার মুক্তি অবস্থান করে।

ভক্তির পূর্ণ বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাজা রোমাঞ্চিত হইলেন। তাহার নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। সুখের উল্লাসে তাহার দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিদেহ রাজের অবস্থা দেখিয়া শ্রীনারদ হৃদয়ের উল্লাসে শেষ অংশ বলিতে লাগিলেন ॥৪২॥

দেবর্ষি নারদ ইতিহাস বলিলেন। আনন্দে তাহার অঙ্গ কম্পিত। ভক্তি মন্থন করিয়া তাহার সার নবনীত স্বরূপ কথা তিনি বসুদেবের প্রতি আনন্দ সহকারে বলেন।

এই প্রকারে জয়ন্তী পুত্রগণ জনকরাজার প্রতি পরম প্রীতিভরে স্বানুভবানন্দ পূর্ণভগবানের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ করেন। তাহাদের ভাষণ শ্রবণে রাজাজনকের মন আনন্দে পূর্ণ হইল। অত্যন্ত প্রেমের সহিত রাজা জয়ন্তী পুত্রগণকে পূজা করিলেন। শ্রবণের পরম শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম লাভ করিয়া শ্রবণ গুরুগণের পূজায় তাহার অত্যন্ত প্রেম প্রকাশ পাইল। রাজা জনক পরমানন্দস্থিতি লাভ করিয়া উল্লাসে তাহাদের পূজা করেন। জনকের উপাধ্যায় অহল্যার পুত্র শতানন্দ আদরে পূজা করাইলেন এবং নিজেও করিলেন ॥৪৩॥

ততোহন্তর্দ্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিম্ ॥৪৪॥

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্ ॥৪৫॥

যুবয়োঃ খলু দম্পত্যোর্যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রতামগমদ্ যদ্বাং ভগবানীশ্বরো হরিঃ ॥৪৬॥

ইহার পর পরমপূজনীয় ভাগবতশ্রেষ্ঠ সেই নবযোগেন্দ্র সকলকার সামনেই ঊর্দ্ধদিকে গমন পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেই ভাগবত স্থিতিতে ভগবদ্‌ভক্তির অনুষ্ঠানে রাজা পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণরূপে পরম গতি লাভ করেন। ভাবে ভগবদ্ ভক্তি করিয়া দেহে অবস্থান করিলেও তিনি দেহাতীত বিদেহ অবস্থায় পরম বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন ॥৪৪॥

সকল প্রকার সৌভাগ্য শ্রেণী যেখানে নিজেরাই আসিয়া বিশ্রাম লাভ করে—এরূপ পরম সৌভাগ্য, হে বসুদেব, তোমার গৃহে খেলা করিতেছেন। তোমার নামমূলে তোমার পুত্র বাসুদেব নাম ধারণ করিয়াছেন। এই বাসুদেব নাম প্রভাবে সকল জনগণের দোষাবলী নিরসন হয়। হে বসুদেব, এই প্রকার সৌভাগ্যের নিধি একমাত্র তুমিই হইয়াছ। তুমি ভাগবত ধর্ম্মের বিধি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে। শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরমাত্মস্বরূপের শ্রবণানন্তর মনন করিয়া তাহার ধারণা কর। এই ভাবে তুমি সকল সঙ্গাসক্তি বন্ধনমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে গমন করিবে। সেই ভগবদ্ধামে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। সেখানে পরম পদে অবস্থান করিয়া আত্মার সুখস্বরূপ দর্শনে সুখস্বরূপই হইয়া যাইবে ॥৪৫॥

তোমাদের দাম্পত্যের কীর্ত্তি যশ ঐশ্বর্য ত্রিজগতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। সকল পৃথিবী পরমানন্দে পূর্ণ হইল। যাঁর জন্য যাগ যজ্ঞ, দান ধর্ম্ম, তপস্যা, যোগসাধন করা হয়, যাহার বর্ণনায় বেদ, এমন কি, শেষ অনন্ত নাগও অসমর্থ, সনকাদি মুনিগণের দুর্লভ, সেই কৃষ্ণ তোমার পুত্ররূপে কোলে খেলা করে। কলিকালের যিনি শাস্তা, ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিয়ন্তা সংহারকর্ত্তা যমেরও যিনি যম, দেবতাগণের পালন কর্ত্তা, সকল ভাগ্যের যিনি পরম ভূষণ, যিনি

দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ শয়নাসনভোজনৈঃ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ ॥৪৭॥

সকল শোভার সৌন্দর্য্য বিধায়ক, ষড়্‌গুণের যিনি অধিষ্ঠান, সেই, শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে তোমার সকল দেহে চঞ্চল হইয়া লালিত হয় ॥৪৬॥

পরব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাকে সাদরে অবলোকনে দৃষ্টি পবিত্র হয়। দ্রষ্টার পূর্ণ সুখাববোধ। শ্রীকৃষ্ণ-মুখের বাণী শ্রবণে প্রবেশ করিলে কর্ণকুহর পবিত্র হয়! কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পুত্রকে ডাকিলে সন্তপ্ত জন গঙ্গাজল পান করিলে যেরূপ শান্ত ও পবিত্র হয়, কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিলেও বাণী সেইরূপ শান্ত ও পবিত্র হইয়া যায়। যাঁহার উদ্দেশে বহু যাগ যজ্ঞ করিলেও সেই যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করেন না, সেই শ্রীকৃষ্ণ 'আর নয়' 'আর নয়' বলিয়া দুই হাত দিয়া খাইতে পারিবেন না বলিয়া নিষেধ করিলেও তুমি জোড় করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে থাক। যোগ যাগে দুর্ল্লভ সেই কৃষ্ণ যথা সময়ে তোমার ঘরে ভোজনে বসে, আবার বাল্যলীলাবেশে নিজে খাইয়া মুখের উচ্ছিষ্ট শেষ গ্রাস তোমার মুখে তুলিয়া দেয়। সকল সন্তাপহারী সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখে গ্রাস তুলিয়া দেয়। ত্রিলোকে তোমার মত এরূপ ভাগ্য আর কেহ লাভ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শেষামৃতে যাহাদের রসনা রসান্বিত হইয়াছে অমৃতও তাহাদের বিস্বাদু, ইতর রসতো মোটেই তাহাদের মিষ্ট বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের রসশেষে অনায়াসে অন্তর শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধি নানা তপস্যায় বা প্রযত্নে কখনো লাভ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ চুম্বন দিলে তাঁহার ওষ্ঠ অধরের গন্ধে মনেন্দ্রিয় পবিত্র হইয়া যায়! তাঁহাকে চুম্বন দিলে মন আত্মানন্দে পরম উল্লাসে মগ্ন হইয়া যায়। তোমাকে আসনে বসিতে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ সবেগে ধাইয়া আসে—তোমার কোলের উপর বসিয়া কৃষ্ণ তোমার অঙ্গে নিজের অঙ্গ লাগাইয়া থাকে। সে সময় শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে সকল ইন্দ্রিয়গণের অন্ত কামনা দুর হয়। তাহাতে অনায়াসে সকল কর্ম্ম নিষ্কর্ম্ম হইয়া যায়। স্বপ্রেমে সংলগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন প্রদান করিলে ভক্তের দেহভাব স্ফুরণ হয় না। সুষুপ্তির দশায় যেমন মানুষ নিদ্রায় অভিভুত হইয়া বাহিরের কোন বিষয় অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ অপর সকল বস্তু বিস্মরণ হওয়ার ফলে এক সৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকেন।

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল পৌণ্ড্র—
শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্তঃ আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥৪৮॥

যোগী ভাবনা করিয়া কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। তিনি উহা অঙ্গীকার করিলেন কিনা বুঝিবার উপায় থাকে না। কিন্তু তোমার কর্ম্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন। অর্পণ না করিলেও তিনিই ভক্তের কর্ম্মফলের নিত্য-ভোক্তা। পুত্র স্নেহের লালসায় তোমার সকল কর্ম্ম পরম উল্লাসে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অঙ্গীকার করেন। তোমার পবিত্রতার কথা আর কি বলিব, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পালন করিয়া যদুবংশকে পবিত্র করিয়াছ। তুমি জগৎ উদ্ধারের কীর্ত্তি রাখিলে। বসুদেবপুত্র অথবা দেবকীনন্দন এই নাম গ্রহণ করিলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়, এরূপ পবিত্র তোমার নাম। তোমরা যে উদ্ধার হইয়া গেলে ইহাতো আর নতুন কিছু নয়, কিন্তু যাহারা কৃষ্ণ বিদ্বেষী তাহারাও বিরোধিতার মাধ্যমেও উদ্ধার হইয়া যায়, ইহাই অভিনব ব্যাপার ॥৪৭॥

শিশুপাল, দন্তবক্র, পৌণ্ড্রক, শাল্ব প্রভৃতি মহাবীর পুরুষগণ কৃষ্ণের সহিত বৈরভাব পোষণ করিয়া মাৎসর্য্যপূর্ণ বিদ্বেষে কৃষ্ণ ধ্যান করে। পীতাম্বরধারী ঘনশ্যাম বিচিত্র অলংকারে সুশোভন নটবর, গদাদি আয়ুধ ধারণে সুসজ্জিত, রণ-ভূমিতে যেন শত্রুর অভিমুখী হইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, ক্রোধবশে তাহাদের এইরূপ উৎকট ধ্যান। তাহারা বিদ্বেষবশে শ্রেষ্ঠ বৈর ভাবে স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপতা লাভ করিল। কংস পরম ভয়ে অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণধ্যানে অন্ন পান শয়ন আসন সর্বত্র সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ দর্শন করে। কংসাসুর ভয়ের আবেশে, শিশুপাল প্রভৃতি বিষম বিদ্বেষে অনায়াসে সাযুজ্য মুক্তি পাইল; শ্রদ্ধালু ব্যক্তি কেমন করিয়া মোক্ষ না পায়? তুমিতো প্রেমের সহিত তোমার চিত্ত বিত্ত আত্মশক্তি জীবন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ, এই জন্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি তোমার পদতলে লগ্ন হইয়া আছে। তোমার প্রাপ্তি পরিপূর্ণ কিন্তু তুমি উহা ভাবনাও কর না। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বালক পুত্র বলিয়াই জান, অতএব নিজ লাভে তুমি মুগ্ধ হইয়া আছ ॥৪৮॥

মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্যে পরেঽব্যয়ে ॥৪৯॥

ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাম্।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে ॥৫০॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য পুত্রভাবে দেখিও না। ইনি পরিপূর্ণ পরমাত্মা গুণাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে অবতীর্ণ। তাহাকে শুধু নিজের শিশুপুত্র ভাবিও না। ইনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, যোগিগণের মধ্যে যোগীন্দ্র। তিনি অবিকারী অবিনশ্বর পরাৎপর পরমহংস, ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা হৃষীকেশ, জগন্নিবাস জগতের আত্মা। মায়া মানুষবেষাকৃতি বলিয়াই তিনি লোকচক্ষে পরিদৃশ্যমান। তিনি মহামূর্ত্তি, তাহার ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত। তিনি গুণাতীত ত্রিজগতের পরিব্যাপক ॥৪৯॥

কালযবনাদি অসুর এবং জরাসন্ধাদি মহাবীর অথবা অধার্মিক রাজন্যবর্গ, যাহাদের সৈন্যসমূহ এই পৃথিবীর ভারস্বরূপ, সেই ভার অপনোদনের নিমিত্ত এবং নির্ব্বিকার নির্ম্মল ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য, সন্তসংরক্ষণের নিমিত্ত শার্ঙ্গধর পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ। নিজ ভক্তগণকে প্রতিপালনের নিমিত্ত, সাধুগণের সুখের জন্য যদুবংশে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ। তিনি অসুর-গজের বধের নিমিত্ত পঞ্চানন. সজ্জনবনের আনন্দ-ঘন তোমার সমীপে সর্ব্বাংশে পূর্ণরূপে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ত্রিজগতের উদ্ধারের জন্য উদারলীলা বিস্তার করিয়াছেন। এই সকল লীলা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও কীর্ত্তন করেন। সুরনর মুনীশ্বরগণ অতি দুস্তর ভব সাগর পার হওয়ার জন্য সর্ব্বদা পরমাদরে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রগুণ কীর্ত্তি গান করেন। ভক্ত তাঁহার নাম স্মরণ করিলে কলিকাল মোহ প্রাপ্ত হয়। সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অবতার তোমার গৃহে প্রকাশ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্মৈক নিধি। তাহাকে বালক বুদ্ধি করিয়াই তোমরা সংসার-সমুদ্র হইতে নিস্তার পাইয়াছ। এই প্রকার কৃষ্ণাবতার-কথা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের সমীপে বলেন।

শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলেন—ইহা শুনিয়া সকলেরই খুব বিস্ময় হইল ॥৫০॥

শ্রীশুক উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ ॥৫১॥

ইতিহাসমিমং পুণ্যং ধারয়েদ্ যঃ সমাহিতঃ।
স বিধুয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়সিক্যামেকাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

দেবর্ষি নারদ রাজা নিমি ও নব যোগেন্দ্রের পুরাতনী কথা বর্ণনা করেন। শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা পরব্রহ্ম ইহা হর্ষের সহিত তিনি নিরূপণ করেন। শ্রীশুক পরীক্ষিৎকে বলেন—নারদের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বসুদেব দেবকীর চিত্তে অতিশয় বিস্ময়ের উদয় হইল। নারদ বলেন, কৃষ্ণ পরমাত্মা পরব্রহ্ম দেবকী ও বসুদেব নিজের মনে সেই কথা বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করেন। শ্রীকৃষ্ণে পুত্রস্নেহ না করিয়া তাহারা তখন কৃষ্ণ পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করেন। আহা, তাহাদের ভাগ্যের কথা কি বলিব? শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মভাবনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সকল স্নেহ ও মোহ দূর হইয়া গেল ॥৫১॥

এই নিমি জায়ন্তেয় সংবাদ দেবর্ষি নারদ বসুদেবকে বলিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত পবিত্র, জীব শিব ভেদবুদ্ধি ইহাতে ছেদন হয়। যে শ্রোতা সাবধান হইয়া পরতত্ত্বে মগ্নচিত্ত হইয়া পরমাদরে শ্রবণ করে সে সর্বপ্রকার পুণ্যলাভ করে। নিশিদিন ইহার শ্রবণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়। ইহার প্রতিটি পদ তাৎপর্য্যযুক্ত। শ্রবণে চিত্ত শুদ্ধ হইলেই আত্মজ্ঞান পরমানন্দ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি।

একাদশ স্কন্ধের নব যোগেন্দ্র সংবাদের পাঁচটি অধ্যায়কে পঞ্চাধ্যায়ী বলা হয়। চন্দ্রচূড় শংকরের পঞ্চ বক্ত্র এই পঞ্চাধ্যায়ী। নিগূঢ় জ্ঞানের কথা-মন্দিরকে দূর হইতে দেখাইবার নিমিত্ত পঞ্চাধ্যায়ী ধ্বজা আরোপণ। একাদশ স্কন্ধের পঞ্চপ্রাণ এই পাঁচটি অধ্যায়। ইহাতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপদেশের নিমিত্ত ভক্তগণকে ভগবৎসম্মুখে আনয়নের একান্ত প্রয়াস। শ্রীশুক দেবাচার্য

কোকিল, আর তাঁহার কণ্ঠের পঞ্চম স্বরের সঙ্গীত আলাপ এই পঞ্চাধ্যায়ী, অথবা একাদশ স্কন্ধ বসন্ত ঋতুর ভক্ত অলিকুলের মধুরালাপ। জ্ঞানগম্ভীর নিজ ভক্তগণের চাখিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই পঞ্চকোণ মধুময় শর্করা সন্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অথবা ইহাদ্বারা পঞ্চগন্ধ ও অক্ষতই ভক্তগণের আমন্ত্রণে ভগবৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। নিজ ভক্তের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু ভগবান্ জ্ঞানগর্ভ অংশ শ্রবণের নিমিত্ত পরম কৌতুকে পাল্কী পাঠাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা। অর্দ্ধোদয় মহাযোগে মহাযাত্রায় যাওয়ার নিমিত্ত ভক্তগণের প্রতি আহ্বান এই পঞ্চাধ্যায়ী।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের মিলন মেলা। ব্রহ্মানন্দের শোভা বর্ণনার যোগ্যসখী এই পঞ্চাধ্যায়ী। অহংকার বুদ্ধি হয় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভু নিজের অভয় হস্তে আত্মানন্দ তীর্থে অবগাহনের নিমিত্ত দ্বার খুলিয়া দিলেন। সেই মুক্তি তীর্থে কামনা পূর্ণ করিবার উপদেশ করেন পঞ্চাধ্যায়ী সহচরী। সংসার চক্রে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত জীবগণ ছুটিয়া আসিয়া এখানে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবের মিলন-প্রসঙ্গ মধুময় নির্ব্বিকল্প কপিলাষষ্ঠীর মহা মহোৎসব। ভবসাগর পদ-পরিক্রমায় পার হইবার উপায় শ্রীভগবান উদ্ধবকে ভাগবত উপদেশের ভঙ্গীতে বলিয়াছেন। সাঁতার দিয়া পার হওয়ার ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পায়ে হাটিয়া ভাগবত ধর্ম্মের পথে সংসার সমুদ্র পারে যাওয়া অতীব সহজ। সেই পথে শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণকেও পঞ্চাধ্যায়ী ডাকিয়াছে।

সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে উত্তরোত্তর মাধুর্য বৃদ্ধির ফলে শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতরস মাধুরী আস্বাদন পূর্ব্বক পঞ্চাধ্যায়ী বলিলাম। কৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ পরব্রহ্ম বিচারে অন্নছত্র। সাধক মুমুক্ষু দলে দলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিপ্রকার শুদ্ধি ও আত্মানন্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত ধাবিত হউক। নিরবয়ব পরব্রহ্ম সাবয়ব শ্রীকৃষ্ণ। স্বরূপসুন্দর অফুরন্ত জ্ঞানগৌরব মনোহর রূপবৈভব—স্বর্গের দেবতাগণ দর্শনে যান। সেই দেবতাগণের স্তুতিবাদ। উদ্ধবের নির্ব্বেদ। কৃষ্ণ উদ্ধবের জ্ঞানগর্ভিত ভাষণে পরমানন্দ উচ্ছলিত। সেই রসময় কথায় অধ্যায় পূর্ণ হয়। সেই কথা শ্রোতৃগণ শ্রবণ করেন পরমাবিষ্টতায়।

দেখা যায় মানুষ নিজে ইচ্ছা করিয়াই 'বাবড়ী' দীর্ঘ কেশ রাখিয়া আনন্দিত

হয়, আবার নিজের ইচ্ছায়ই উহা মুণ্ডন করিয়াও সুখী হয়। সেইরূপ গুরুদেবই কবিতা রচনায় নিজে বক্তা হইয়াও আমাকে রচয়িতা করিলেন, আবার শ্রোতা হইয়া শ্রবণে সন্তোষ লাভ করেন। তাই একত্ব বিনাও একনাথ একা। আবার দ্বৈত ভাব না থাকিলেও একনাথের গুরু জনার্দ্দন সখা। তিনিই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়াছেন। দ্বৈত ভাবনা পরিত্যাগ করিয়াই একনাথ জনার্দ্দন গুরুর শরণাগত। শ্রোতৃগণের চরণ ধরিয়া পূর্ণরূপে কথানক বর্ণনা করিয়াছি, একনাথ ও জনার্দ্দন নামে দুই স্বরূপে এক। এই অত্যাবশ্যক রহস্য পরিজ্ঞাত হইলে স্বয়ং পরম সুখ লাভ করিবে। শরণাগত একনাথের পঞ্চাধ্যায়ীর সিদ্ধান্ত বর্ণন গুরু কৃপার পরিপূর্ণ নিদর্শন। ইহাতে জনার্দ্দনের সম্পূর্ণ কৃপার দর্শন হইল ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে বসুদেব-নারদ সংবাদে একাকার টীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু।

—একনাথের প্রাণের কথা—

সাধক নিত্যানন্দ ধাম প্রার্থনা করে, কিন্তু সাধনার আগ্রহ নেই। মৃত্যু যে কাছেই বসে আছে সে কথা ভেবে সে একবারও অনুতাপ করে না। দেহের সুখটাকেই সে বড় বলে ভাবল, আত্মার কথা ভাবল না। লৌকিক সুখেই লুব্ধ হল, পরমার্থ তার নাগালের বাইরেই রইল।

অনুতাপ হলে বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। সিদ্ধ যোগেশ্বরদের মতে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভেদে বৈরাগ্য তিন প্রকার। বেদবিধান বা আচার বিহীন শুদ্ধ সৎকর্ম্মরহিত ভ্রষ্টাচারের তথাকথিত বৈরাগ্য তামস বলা যায়। ধর্ম্মকর্ম শূন্য বৈরাগ্য ভান মাত্র।

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য সৎসঙ্গ ত্যাগ করে যে লোকের কাছে পূজা গ্রহণ করে, আর শিষ্যের মমতায় বৈরাগ্যের অনুকরণ করে তার ঐ ভাব রাজস বৈরাগ্য।

রাজস ও তামস বৈরাগ্যে মৃত্যু ভয় দূর হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরকেও পাওয়া যায় না। এই বঞ্চনামূলক বৈরাগ্য অনর্থের মূল।

যদুনাথ শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল জগতের বন্দনীয় বলে যিনি জানেন, তার বৈরাগ্য শুদ্ধ সাত্ত্বিক। ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করে যিনি সাবধানতার সহিত জীবন যাপন করেন ক্রমে তার দেহের আবেশ দূর হয়ে যায়।

লৌকিক রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বিষয়পঞ্চক পুর্ব্বোক্ত সাধককে পরাভূত করতে পারে না। তার প্রীতি শ্রীভগবানে। বিষয়ান্তরে উদাস। শুদ্ধ পরমার্থ বিষয়ে তার আদর। সম্মান

পূজা অনর্থ বলে মনে করেন তিনি। মানুষ উদাস প্রকৃতির হলেই সাধারণ লোকের আকর্ষণ হয়। বৈষয়িক স্বার্থেরও বৃদ্ধি হয়। স্তব-স্তুতি সম্মান আর পূজা দিনের পর দিন বেড়েই যায়। সত্যকার বৈরাগ্যবান পুরুষ এগুলোকে কণ্টকের মত অনুভব করেন। জনগণের প্রশংসা তার বিরক্তির কারণ হয়। সাধারণ লোক বলে ইনি মহাপুরুষ, ভগবানের অবতার, আমাদের উদ্ধারের জন্য এসেছেন—এই সব কথা তার কানে আসে। যার বৈরাগ্য কোমল প্রকৃতির তাকে পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের প্রথমটি, অর্থাৎ শব্দ মুগ্ধ করে—আক্রমণ করে। কথাগুলো সাধকের ভাল লাগে, কাজেই সাধক সমর্থন করে যায়।

স্পর্শ বিষয়তো অনায়াসেই সাধককে অভিভূত করে। ভাল আসন, ভাল শয্যা, অগণিত নরনারীর সেবা শুশ্রূষা স্পর্শ সুখের উপাদান যোগায়।

রূপের বিষয় আর কি বলব? শ্রেষ্ঠ বসন ভূষণ অলঙ্কার লাভ করে সাধক নিজের দেহকে সৌন্দর্য্যের আশ্রয় করে তোলেন।

অনুগত জনগণের উপহার নানারসে পরিপূর্ণ রসনা-সুখ-দায়ক বিবিধ আহার্য্য সাধকের রস বিষয়ে আসক্তি সৃষ্টি করে।

সুন্দর ফুল, সুগন্ধি চন্দন কর্পূর কেশর গন্ধ দ্রব্যে দিনের পর দিন গন্ধে আমোদিত হয়ে সাধক ভোগে ডুবে থাকেন। এই ভাবে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, পাঁচটি বিষয়ই সাধককে পরাজিত করে। ফলে যারা তার সম্মান করত, পূজা করত, বন্দনা গীতি গাইত তারাই নিন্দা করতে থাকে। তবুও সাধকের অনুতাপ হয় না। হায়, লাভ পূজায় এত আসক্তি। যথার্থ বিবেকী পুরুষ বলেন, যারা সম্মানের তাগিদে পরমেশ্বর বিস্মৃত হন, তারা মূর্খ। প্রারব্ধের ফলে সম্মান প্রাপ্তি হয়, তার জন্য সন্ধান না করে সাধক সর্ব বিষয়ে উদাসী থাকেন।

সাধকের চিত্ত সহসা সর্বপ্রকার সম্মানের লোভ ত্যাগ করতে পারে না বটে, তবে ভগবানের কৃপা তাকে নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিরক্ত করতে পারে।

বৈরাগ্যবান্ পুরুষ সম্মান লাভের গন্ধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, নিশ্চলভাবে সৎ সঙ্গেই পড়ে থাকে।

তিনি কর্ম্মফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করেন।

অহংকারের ত্যাগের ফলেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যও আর আকৃষ্ট হন না। মন রাখা মধুর কথাও বলেন না। প্রপঞ্চী লোকের সঙ্গ করেন না। লৌকিক কথায় কর্ণপাত করেন না।

যোগ্যতার বড়াই তার নেই। সুখাদ্য পাওয়ার লোভ তিনি ত্যাগ করেন। কিন্তু লৌকিক দুরবস্থা তিনি চান না। ছিন্ন মলিন বস্ত্র ধারণ করে সাধুতা প্রদর্শনে তার আগ্রহ নেই। মধুর হলেও অপরের গৃহে ভোজন তার অভিলষিত নয়। বহু দ্রব্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তার নেই। অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন তিনি।

গৃহস্থ সাধক স্ত্রী পরিত্যাগ করেন না বটে, কিন্তু সর্ব্বদা সাবধানে থাকেন। নর নারীর সেবায় ভক্তি ও মমতার উদয় হয়। শুদ্ধ পরমার্থপ্রার্থী কিন্তু দুঃসঙ্গ থেকে দূরে থাকবেন। অসঙ্গ জীবনই ভগবৎ প্রাপ্তির পরম সহায়। নিঃসঙ্গ নিরভিমান সাধক ভগবদনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। একনাথ বলেন— মানুষের জন্যই বৈরাগ্য সাধনার নির্দেশ। সাধনায় জীবন সার্থক হয়।

(একনাথ কৃত চিরঞ্জীব পদ হইতে)